KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ সুনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য স্ট্রিট, কল-১৬
Collection KLMLGK	Publisher নীহার ঘোষাল
Title ছড়াঘর	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৫০/১ ৫০/২ ৫০/৩ ৫০/৪	Year of Publication : বৈশাখ ১৩৯৬ // May 1989 জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬ // Jun 1989 আষাঢ় ১৩৯৬ // July 1989 শ্রাবণ ১৩৯৬ // Aug 1989
	Condition : Brittle Good
Editor আবদুল হক	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৫০ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা জুন ১৯৮৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ভাষা-সংস্কৃতিগত গোষ্ঠীস্বকীয়তা সোচ্চার করার আন্দোলন অবহেলিত ভাষা-সংস্কৃতির বিকাশে কিভাবে গতি সঞ্চার করে, আলোচনার প্রচলিত ছকের বাইরে গিয়ে তা বিশ্লেষণ করেছেন সজল বসু।

বিজ্ঞানের বিকাশে যাঁরা অতিক্রম করেন পুরনো তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা, কালক্রমে তাঁরাই কেন বাধা দেন নতুনতর দিগন্ত-সন্ধানী তরুণদের, এই রহস্যের উৎস সন্ধান করেছেন বিজ্ঞানী দেবব্রত ঘোষ।

বিদ্যুৎসংকটের মতো নিত্য আলোচনার বিষয়টির আগাপাশতলা তলিয়ে বোঝার সুবিধার জন্য বাঙলার বিদ্যুৎব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন অমিতাভ রায়।

বাংলাদেশের শক্তিমান লেখক হাসান আজিজুল হকের প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করেছেন বয়োবৃদ্ধ মনীষী গোপাল হালদার।

একদা বিশ্বভারতীর আচার্য, মাত্র কয়েক মাস আগে প্রয়াত গুজরাতি কবি উমাশঙ্কর যোশীর সাহিত্যকর্ম নিয়ে অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের নিবন্ধ।

সদ্যপ্রয়াত দেবীপদ ভট্টাচার্য প্রসঙ্গে লিখেছেন অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য।

সি. এম. টি. সি. আন্দোলনের শ্লোগান হল, "মানুষ মারতে টাকা নয়, বাঁচার জন্য" এই অভিনব আন্দোলনের পরিচয় দিয়েছেন মহাশ্বেতা চৌধুরী।

চতুরঙ্গ

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক প্রশ্ন,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

শ্রীমা

বর্ষ ৫০। সংখ্যা ২
জুন ১৯৮৯
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬

আঞ্চলিক আন্দোলনে ভাষা সজল বসু ৯৩
বিজ্ঞানবিরোধীর ভূমিকায় বিজ্ঞানী : উৎস-সন্ধান দেবব্রত ঘোষ ১১১
বাঙলায় বিদ্যুৎ-ব্যবস্থার বিবর্তন অমিতাভ রায় ১২৮
বড়দা ও আমার তরুণকালের স্মৃতি সুধীর সেন ১৩৬
ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন বিনয় চৌধুরী ১৪৫
বিষয় : ব্রহ্মদেশ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ১৫২
আমাকে ফিরিয়ে আনে সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ১০৭
গাভী মতি মুখোপাধ্যায় ১০৮
গাঢ়নীল শব্দবিষ সন্তোষকুমার মাঝী ১০৯
নিরুদ্দেশ সুদীপ চক্রবর্তী ১১০
কাঁহা হয় মনজিল আহমদ-উজ-জামান ১১৯
স্মরণে ১৫৫
দেবীপদ ভট্টাচার্য জগদীশ ভট্টাচার্য
গ্রন্থসমালোচনা ১৫৭
গোপাল হালদার, সৌমেন সেন, পরিমল চক্রবর্তী, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত
বিতর্ক ১৭১
গোরবাচেভ কি আদৌ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতা? মিহির মিশ্র
প্রতিবেশী সাহিত্য ১৮১
গুজরাতি কবি উমাশঙ্কর জোশী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ১৮৬
সি. এম. টি. সি—একটি অভিনব আইন-অমান্য আন্দোলন মহাশ্বেতা চৌধুরী
মতামত ১৯২
কমলেন্দু ধর

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

কে পি বাগচীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

Confrontation of Cultures
by Bimal Krishna Matilal — Rs. 20.00

An Indian Historiography
by Ranajit Guha — Rs. 30.00

Three Mauryas Revisited
by Romila Thapar — Rs. 25.00

The Views of Europe from Nineteenth Century Bengal
by Tapan Raychaudhuri — Rs. 15.00

The Indian Nation in 1942
edited by Gyanendra Pandey — Rs. 130.00

West Bengal Landscapes : A Travel Diary
by Arun Ghosh — Rs. 200.00

Sharecropping and Sharecroppers' Struggles in Bengal : 1930-1950
by Adrienne Cooper — Rs. 225.00

Dissent and Consensus : Social Protest in Pre-Industrial Societies
edited by Basudeb Chattopadhyay, Hari S. Vasudevan, Rajat Kanta Ray — Rs. 180.00

Bengal Land Tenure : The Origin and Growth of Intermediate Interests in the 19th Century
by Sirajul Islam — Rs. 80.00

আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ
—বিপান চন্দ্র — Rs. 70.00

ইতিহাস অনুসন্ধান, খণ্ড ১, ২, ৩
—পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ — Rs. 40.00, Rs. 60.00, Rs. 110.00

অক্টোবর বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য
—মলয় বসু — Rs. 50.00

বাংলার আর্থিক ইতিহাস : অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী
—সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় Rs. 30.00, Rs. 40.00

দেশ কাল সমাজ
—অমলকুমার মুখোপাধ্যায় — Rs. 25.00

ইতিহাস চর্চা : জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা
—গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত — Rs. 30.00

উনিশ শতক : ভাব-সংঘাত ও সমন্বয়
—রাখালচন্দ্র নাথ — Rs. 36.00

মধ্যযুগের ভারত
—অনিরুদ্ধ রায় সম্পাদিত
লেখক : সৈয়দ সুরুল হাসান, গৌতম ভদ্র, অনিরুদ্ধ রায়, অশীন দাশগুপ্ত — Rs. 15.00

ভারতের সামন্ততন্ত্র (চতুর্থ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী)
—রামশরণ শর্মা — Rs. 36.00

মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি
—সতীশ চন্দ্র — Rs. 60.00

মুঘল ভারতে কৃষিব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭)
—ইরফান হবিব — Rs. 75.00

K P Bagchi & Company
286 B. B. GANGULI STREET, CALCUTTA 700 012
1/1698 CHITTARANJAN PARK, NEW DELHI 110 019

আঞ্চলিক আন্দোলনে ভাষা

সজল বসু

বাঙ্গাল বলে তুই ছোটো
বিহার বলে দূর হাঠো,
... ...
সাঁওতালডি বিদ্যুৎ কারখানা
যত রেফুজির আনাগোনা
মেঘের ওপর তার টানা
টাটা কলকাতায় পাখা চলে
পুরুলিয়া কি ঝাঁপ দিবেক জলে।

সুনীল মাহাতর এই কবিতা ছাড়াও বহু কবিতা, টুসুগান সম্প্রতি ঝাড়খণ্ড এলাকার মানুষের বঞ্চনা আর দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করছে। 'আমাদের পুরুলিয়া জিল্লা সবাই করে অবহেলা, ভোটের তরে কত ভুলাইলি রে' অথবা 'চল মিনি আসাম যাব, দেশে বড় দুখ রে···সরদার বলে কাম-কাম, বাবু বলে ধরি আন, সাহেব বলে লিব পিঠের চাম'—এমনতরো বহু গান এলাকার মানুষের মুখে-মুখে ফেরে। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সূত্রে ওই অঞ্চলের মানুষের অনেক অব্যক্ত বেদনা সৃষ্টির মুখ দেখেছে, ভাষা পেয়েছে। সব আন্দোলনেই ভাষা আর সাহিত্য সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষদের মধ্যে আবেগ সৃষ্টি ক'রে আন্দোলনে নতুন গতি দেয়। ভাষাকে কেন্দ্র করে, বা ভাষার দাবিতে, আন্দোলন যেমন হয়, আন্দোলনের সূত্রেও নতুন ভাষা সৃষ্টি হয়। আবার ভাষাভিত্তিক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন বা বহিরাগতবিরোধী ভূমিপুত্র আন্দোলন ভাষা-জাতিগত সংকীর্ণতাবাদের জনক হতে পারে। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বা সরকারি কাজে বিশেষ ভাষা প্রচলনে বাড়াবাড়ি থেকে উদ্ভূত হতে পারে পালটা বিজাতীয়বাদ, যেমনটি হয়েছে তামিলনাড়ুতে বা আসামে। ১৯৬০ আর ১৯৭২-এর 'বঙ্গলখেদা' আন্দোলন এবং ১৯৮০-৮৪-তে বিদেশী বিতাড়নের দাবিতে আন্দোলন এমন এক বিজাতীয় মানসিকতার সৃষ্টি করেছে, যেখানে অসমিয়ারা বুঝেই উঠতে পারেন না অন-অসমিয়া, বিশেষ করে বরাক উপত্যকার লোকেরা কেন আসাম রাজ্যের কোনো দাবির সমর্থনে শরিক হন না। (সতীশ কাকতি, ১৯৮৮)।

জনপ্রিয় আন্দোলনের সূত্রে নতুন ভাষা সৃষ্টি হতে পারে, বা মরে-যাওয়া ভাষা নতুন জীবন পেতে পারে। নব কলেবরে সৃষ্টি হতে পারে লিপি, সাহিত্য, লোকশিল্প। এর সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত কুর্মালি, সাঁওতালি আর গোর্খালি ভাষা। ঝাড়খণ্ড আর গোর্খাল্যানড আন্দোলনের সূত্রেই ওইসব ভাষা নতুন জীবন-

রূপ পেয়েছে। কুর্মালি ভাষা প্রাচীন হলেও কথ্য ভাষা হিসাবেই ছিল, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রবাহে তার সাহিত্য, ব্যাকরণ সৃষ্টি হচ্ছে। সাঁওতালি ভাষার লিপি অলচিকি জনপ্রিয় হচ্ছে ওই আন্দোলনের সূত্রেই। নেপালি 'খস কুরা' ভাষা গোর্খাল্যানডের দাবির সূত্রে গোর্খালি ভাষায় রূপ পেয়েছে। আন্দোলনের নেতা ঘিসিং প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছেন—সংবিধানের অষ্টম তপশিলে নেপালি ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব না হলে গোর্খালি ভাষা অন্তর্ভুক্ত হোক (জি. এন. এল এফ., ১৯৮৭)। অথচ গোর্খালি নেপালি ভাষারই আর-এক নাম, আন্দোলনের সূত্রে ওই নাম পেয়েছে। ভাষা নিয়ে রাজনীতিকরণের প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করছি।

প্রতীক ও মুখোশের নাটক

স্বদেশী চেতনা স্ফুরণের কালে আর বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের (১৯০৫-১৯১১) সময়েও বাঙলায় সাহিত্য আর সংস্কৃতির স্তরে নতুন সৃজনী গতিশীলতা এসেছিল, সৃষ্টি হয়েছিল স্বদেশীর আদর্শরঞ্জিত কবিতা, সংগীত, জনপ্রিয় শিল্প। ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দুমেলার (১৮৬৭) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রেনেসাঁস যুগের ভাবতরঙ্গের অন্যতম উপাদান হিসাবেও স্বাজাত্যবোধ আর আত্মপরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা তীব্র ছিল। ছাত্রবয়সে রবীন্দ্রনাথের "স্বাদেশিকতা" প্রবন্ধ পড়ার সুযোগ যাঁদের হয়েছে, তাদের কাছে মেলার পটভূমি তথা রোমানটিক স্বাজাত্যচেতনার প্রভাব ব্যাখ্যা করার অবকাশ রাখে না। স্বাদেশিকতাবোধ, জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ সম্পর্কিত ইতিহাস অধ্যয়নে নতুন প্রজন্মের কাছেও ওই রচনার সমান প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গসিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় তথা প্রতিরোধে বাঙলা ভাষা আর সংস্কৃতিই মুখ্য প্রতীকরূপে সাধারণ মানুষের সমর্থন আর আবেগ সংঘবদ্ধ করেছিল। পরবর্তী কালে বৈপ্লবিক আন্দোলনে সক্রিয় সংস্থা এবং কর্মীদের মধ্যেও স্বদেশী সংগীত এবং সাহিত্যিকদের রচনা যেমন প্রেরণাদানকারী শক্তিস্বরূপ ছিল, সাথে - সাথে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে আদর্শগত বিভ্রান্তি, দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয়েছিল সাহিত্যিকদের রচনায়। রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়", "গোরা", শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" এই ইতিহাসচেতনার সাক্ষ্য বহন করে।

সাম্প্রতিক আঞ্চলিক আন্দোলনে ভাষার ভূমিকা পর্যালোচনার আগে ওপার-বাঙলার ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের চেতনা সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। গত দশকেই পূর্ব-পাকিস্তানে প্রত্যক্ষ করা গেছে এক বিরল ঘটনা—শুধু ভাষা আর সংস্কৃতির দাবি-আন্দোলনের সূত্রে গড়ে উঠেছে এক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র। যেসব মানুষ কিছু কাল আগেই ধর্মীয় বিশ্বাস-আনুগত্যের জন্য ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের শরিক হয়েছিল সচেতনভাবে, তারাই ভাষা-সংস্কৃতির আবেগে উদ্দীপিত হয়ে ধর্মীয় আনুগত্যকে গৌণ প্রতিপন্ন করল! ওপার-বাঙলার মানুষ ভাষার জন্য শহীদ হয়েছে অনেক আগে পঞ্চাশের দশকের শুরুতে, একথা ঠিক। কিন্তু প্রাক-বিভক্ত ভারতে বাঙলার মুসলমানরা অন্য রাজ্যের মুসলমানদের স্বার্থে স্বকীয় কুলগত, ভাষা ও সংস্কৃতির পার্থক্য ইচ্ছা করেই অস্বীকার করেছিল। এটা বোধহয় তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বার্থের পক্ষে সুবিধাজনক মনে হয়েছিল। এ এক বিচিত্র মুখোশের খেলা! জাতিগত পার্থক্য চাপা দিতে ধর্মকে মুখোশ হিসাবে কাজে লাগানো হয়েছিল। এবং 'এটা মনে করলে ভুল হবে যে বাঙলার মুসলমানরা স্বেচ্ছায় এই মুখোশের নাটকের খেলাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। প্রাত্যহিক ঘটনাপ্রবাহের সাথে তাদের যোগ এত গভীর ছিল যে সত্তা ও প্রতীকের মধ্যে পৃথক সীমারেখা টানা সম্ভব ছিল না। মুখোশটা অবয়বের সাথে সহজেই মিশে গিয়েছিল।' (টি. এন. মদন, সঃ, বসু, ১৯৭৯, ১৫৮)।

জাতিগত ও ভাষা-সংস্কৃতির পার্থক্য অতিক্রম

করে শুধু ধর্ম জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির মুখ্য উপাদান হতে পারে না। বরং ধর্মকে অতিক্রম করে জাতিগত ভাষা-সংস্কৃতির ঐক্যের সূত্রে জাতীয়তার আবেগ সৃষ্টি সম্ভব। প্রতীক উপাদান হিসাবেও এগুলি ধর্মের চেয়ে কার্যকর। সাম্প্রদায়িকতা, ভেদাভেদ সৃষ্টিতে ধর্মের কার্যকারিতা অসীম, কিন্তু জাতিগঠন, জাতীয়তার ইতিবাচক উপাদান হিসাবে ধর্মের অবদান কম। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ধর্মকে মানবতাবোধে সম্পৃক্ত করে ধর্মনিরপেক্ষ/সাম্প্রদায়িকতামুক্ত করে তোলায় গান্ধীর ব্যর্থ প্রয়াস। গান্ধীর অনুরাগী হয়েও এই ক্ষেত্রে গান্ধীর প্রয়াসকে নিষ্ফল বলা ছাড়া উপায় থাকে না (গোপালকৃষ্ণ, ১৯৮৯)। খিলাফত থেকে গীতার নবভাষ্য, দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালিতে পদযাত্রা, ও কলকাতায় অনশন—দেশবিভাগ পর্যায়ে এই বিরাট পুরুষের চিন্তাকর্ম এক অখণ্ড ভারতীয় জাতিসত্তার জনক হতে পারে নি।

গোষ্ঠীজীবনে ভাষা এক অবিভাজ্য মৌলিক সত্তা-স্বরূপ, সহজেই গোষ্ঠী-সমাজমনকে আবেগে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। ভাষাকে অতিক্রম করে যুগ্মজাতিসত্তার রাজ্য গঠনের প্রয়াস করেছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের আন্দোলনের বিকল্পে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বাঙলা-বিহার সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব (১৯৫৬) প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, মার্কসবাদী-উদারতন্ত্রী-নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক দল তার প্রতিরোধে আন্দোলন করেছিল। এমনকী বিধানচন্দ্রের নিজের দলের সাংসদরাই বিধানসভায় কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছিলেন। জনমতের চাপে সেই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন ডাক্তার রায়।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পানজাব-আসাম-পশ্চিমবঙ্গ-বোম্বাইতে যেসব আন্দোলন গড়ে ওঠে, তার মূল উপাদান ছিল ভাষা—জাতিসত্তা তথা স্বকীয়তার প্রতীক হিসাবে। ১৯৫১ সালে পানজাবের হিন্দুরা হিন্দিকে নিজেদের মাতৃভাষা হিসাবে ঘোষণা করে হিন্দি ভাষার প্রতি প্রেমে নয়, শিখদের ভয়ে। তারা বুঝেছিল, কেশধারী-শিখ-প্রভাবিত পানজাবে তাদের প্রাণসম্পত্তি সুরক্ষিত থাকবে না (রায়চৌধুরী, ১৯৮৭)। ভাষাকে হিন্দু পানজাবিরা ওই স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। আসামে বঙ্গালখেদা ও বিদেশী বিতাড়নের দাবিতে আন্দোলনও ভাষাগত ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাজনিত বলে অভিহিত। কিন্তু সম্প্রতি বাঙলা-মাধ্যম বিদ্যালয়ে অসমিয়া ভাষা প্রচলনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পর বহু অসমিয়া মনে করছেন—বরাক উপত্যকা পৃথক হয়ে যাওয়াই কাম্য। চিরকাল বৈরিভাবাপন্ন হয়ে বাস করার চেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হিসাবে থাকাই কাম্য মনে করেছেন তাঁরা (কাকতি, ১৯৮৬)। বিজাতীয়বাদের মুখোশ হিসাবে ভাষাকে ব্যবহার করার পরিণতি আসামের নিরবচ্ছিন্ন বিভাগ। বোড়োল্যানডকে স্বীকৃতি দিয়েও এই প্রক্রিয়ার শেষ করা যাবে কিনা সন্দেহ।

ভাষার রাজনীতিকরণ

জাতি নিয়ে বজ্জাতির মতো ভাষাকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী-জাতির মধ্যে আবেগ-উত্তেজনা সৃষ্টি নতুন কোনো ঘটনা নয়। সব দেশে, নানা রঙের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভাষার দাবিতে আন্দোলন-সন্ত্রাস হয়েছে, হচ্ছে। আধুনিক অর্থে জাতি-রাষ্ট্রগড়ে ওঠার পরই এই প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জাতি-উপ-জাতিগত আবেগের ব্যবহার। তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা ক্ষমতাকেন্দ্রে স্বকীয় প্রভাব আর স্থিতি জোরদার করার জন্য ভাষার মতো শক্তিশালী মাধ্যম কমই আছে। স্বাধীনতা-আন্দোলনকালে আর স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে এর ব্যবহার হয়েছে নানা আঙ্গিকে। গড়ে উঠেছে আন্দোলন, তার মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় হিংসা, পালটা হিংসা, সন্ত্রাসবাদ, চুক্তি, নতুন রাজ্য। ধর্মাবেগ গৌণ করে ভাষা-সংস্কৃতির আবেগ সৃষ্টি করছে নতুন ইতিহাস—সর্বভারতীয় স্তরে, রাজ্যে এবং রাজ্যভুক্ত অঞ্চলে।

আন্দোলন, দাঙ্গা, রাজ্যভাগ, নতুন রাজ্য গঠন,

বহু ভাঙাগড়ার সূত্রে ভাষা আর সংস্কৃতির মৌলিক অধিকার আর আবেগের বিষয়টি খুব স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। এ ধরনের কোনো আন্দোলনের প্রশ্ন উঠলেই সাধারণ মনে একটা বিরুদ্ধভাব দেখা দেয়। রাষ্ট্রনেতা আর শাসকদলের তো কথাই নেই, সাথে-সাথে কিছু বিশেষণ যোগ করে আন্দোলন তথা আন্দোলনকারীদের দেশদ্রোহীর পর্যায়ে ফেলে দেন। ভাষা-সংস্কৃতির আন্দোলনের যে ইতিবাচক দিক আছে—সে সম্পর্কে কেউ ভাবতে চান না, বুঝতেও চান না। তবু ভাষা-সংস্কৃতির আবেগ তথা এর জন্য গোষ্ঠীগত আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র যে অনেক সময়ে অনিচ্ছায় ভাষা-সংস্কৃতি-ভিত্তিক রাজ্য, এলাকার দাবি মানতে বাধ্য হন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও নেতৃবর্গ। স্বভাবতই, কোনো দল বা নেতাই এ ব্যাপারে সুসমঞ্জস নীতি মেনে চলতে পারেন না। এককালে যাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী, দেশদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, তাদের সঙ্গে করমর্দন-চুক্তি করতে বাধ্য হন। শুধু সরকারি শাসক দলের নেতাদের ক্ষেত্রেই যে একথা প্রযোজ্য তা নয়, আন্দোলনকারী নেতারাও পুরানো জিগির আর বক্তব্য ভুলে একেবারে বিপরীত কথা বলে বসেন। তার দৃষ্টান্ত পরে দিচ্ছি।

আসলে, ভাষার প্রশ্নে আমাদের জাতীয় নেতৃবর্গ ও রাজনৈতিক দলগুলির ধ্যান-ধারণায় গলদ ছিল। বিভিন্ন সময়ে রাতারাতি 'বদলে গেল মতটা' করে তাঁরা পরিস্থিতি জটিল করেছেন, ভাষা-সংস্কৃতির আবেগ তীব্র করতে ইন্ধন যুগিয়েছেন। দেশভাগ, দাঙ্গা-মারণযজ্ঞের স্মৃতিভার এবং পশ্চিমী ভাবধারণার প্রভাবে তাঁরা ভাষা-সংস্কৃতি এবং গোষ্ঠীগত আবেগকে জাতীয় ঐক্যের ক্ষতিকারক বলে গণ্য করেছেন। পঞ্চাশের দশকে কিছু পশ্চিমী তত্ত্ববিদ তৃতীয় বিশ্বে আধুনিকীকরণের ভাবধারা তুলে ধরে বলেন, আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সুবাদে সাবেক সামাজিক সংস্থাগুলি ধসে পড়বে। গোষ্ঠীর আবেগ-আনুগত্যকে সংকীর্ণ আখ্যা দিয়ে তাঁদের বক্তব্য—আধুনিক ব্যবস্থায় ওইসব সংকীর্ণ আবেগ নাগরিক আনুগত্য তথা বৃহত্তর স্তরে দায়িত্ব সম্পাদনের প্রতিকূল। এই সূত্রেই শিক্ষিত এলিট শ্রেণী এবং সর্বোচ্চ স্তরের নেতাদের বদ্ধমূল ধারণা হল—এইসব সংকীর্ণ আবেগকে একবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দিলে পরে তা জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করবে। পণ্ডিত নেহরু ছিলেন এই চিন্তাধারার অগ্রদূত।

কিন্তু ভারতের মতো বহুমুখী সমাজে এই চিন্তাধারা অপ্রাসঙ্গিক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। বরং ভাষা-সংস্কৃতি, জাতিসত্তা পরিগণিত হয়েছে রাজনৈতিক সংস্থাকরণের মাধ্যম তথা প্রতীক। ভাষাকে মাধ্যম করে বিভিন্ন গোষ্ঠী বৃহত্তর সংস্থায় সহযোগিতা তথা অংশগ্রহণ করতে পেরেছে। 'Forms are often deceptive in the realm of politics. What looks like primordial groups may actually be mobilisational agencies seeking a transitional source in apparently irrational symbol' (দাশগুপ্ত, ১৯৭০ : ২৬৪)। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা গেল, সামাজিক ভাগ-বিভেদ রাজনীতির স্তরে প্রতিফলিত হয় না। পশ্চিমের পণ্ডিতরা জাতব্যবস্থাকে মধ্যমণি করে ভারতীয় রাজনীতির যাবতীয় বিন্যাসব্যবস্থা বিশ্লেষণ করতে প্রয়াস করেছিলেন। ভাষা-সংস্কৃতির দাবি সেই সূত্রেই সংকীর্ণ, ঐক্যক্ষুণ্ণকারী বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার আগে-পরে ভাষার প্রশ্নে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট সব দল আর নেতাই এই সূত্রে পরস্পরবিরোধী নীতি অনুসরণ করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই তা বোঝা যাবে :

১ : ১৯২০ সালে নাগপুর অধিবেশনের পর থেকেই কংগ্রেসের সংগঠন ভাষাভিত্তিক অঞ্চল কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ বিভিন্ন ভাষার এলাকা ধরেই কংগ্রেসের শাখা গঠিত হয়।

১৯২৮ সালে মোতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে এক সর্বদলীয় সম্মেলন হয়। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, শিখ লীগ, হিন্দু মহাসভা তাতে যোগ দেয়। সম্মেলনে প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবি করা হয়। স্বাধীন ভারতের জন্য এক সংবিধান কমিটিও নিযুক্ত হয়। ওই কমিটির সুপারিশ, প্রদেশ পুনর্গঠনের ভিত্তি হবে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক, তবে মূল বিচার্য হওয়া দরকার এলাকার ভাষাগত ঐক্য।

২ : কংগ্রেসসহ সব রাজনৈতিক দলই সাইমন কমিশন (১৯২৮-২৯) বয়কট করে। কিন্তু উড়িষ্যার কংগ্রেস নেতারা—গোপবন্ধু দাস, গোদাবরীশ মিশ্র, শরৎ দাস প্রমুখ কংগ্রেসের নীতি উপেক্ষা করে কটক, বারিপদাসহ উড়িষ্যার সর্বত্র কমিশনকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। কমিশন বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্য গঠনকল্পে ও'ড্যাগেল কমিটি নিয়োগ করে। উড়িষ্যা গঠিত হয় ১৯৩৫ সালে।

৩ : কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (১৯৩৭) ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়, অন্ধ্র, কর্ণাটক রাজ্য গঠনের সুপারিশ করা হয়। ১৯৩৮ সালে ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় কেরল, অনধ্র, কর্ণাটক প্রদেশ গঠনের দাবি-সংবলিত স্মারকলিপি পেশ করে বিভিন্ন সংস্থা। বৈঠকে ঘোষণা করা হয়, ক্ষমতায় এসে কংগ্রেস ওই-সব প্রদেশ গঠনের বিষয় বিবেচনা করবে (মাহাত, ১৯৮৫ : ৯)।

৪ : কংগ্রেস নির্বাচনী ইস্তাহারে (১৯৪৫-৪৬) ঘোষণা করা হয়, প্রদেশের সীমানা নির্ধারিত হবে মূলত ভাষা-সংস্কৃতির ভিত্তিতে।

১৯৪৮ সালে দার কমিশন গঠিত হয় সংবিধান পরিষদকে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য। কমিশন ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের বিরুদ্ধে সুপারিশ করে বলেন, এতে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। বহিরাক্রমণে রাজ্যগুলির সংহতির সমস্যাও রয়েছে।

৫ : পর বছর জয়পুর অধিবেশনে এই বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য জে. ভি. পি. কমিটি গঠন করা হয়। জওহরলাল, বল্লভভাই, পট্টভি সীতারামাইয়া কমিটি রায় দেন, জনমত চাইলে গণতন্ত্রী হিসাবে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের বিষয়টি মেনে নেওয়া উচিত। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে (১৯৫২) কংগ্রেস এই নীতিই পুনরায় ঘোষণা করে।

৬ : সংবিধান পরিষদে একমাত্র কমিউনিস্ট সদস্য সোমনাথ লাহিড়ী কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেন, কংগ্রেস কোনোদিনই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভাষাগত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মেনে নেয় নি। নির্বাচনী বক্তব্যে (১৯৪৫-৪৬) পার্টির নেতা পি. সি. যোশী বলেন, সার্বজনীন ভোটাধিকার, জাতিগত এলাকার জন্য সার্বভৌম সংবিধান পরিষদ গঠন করতে হবে (বনডুরান্ট, ১৯৫৮ : ২১-২২)।

পাঠকদের কাছে ভাষার রাজনীতির স্বরূপ তুলে ধরতে এখন আমি ইচ্ছা করেই কালানুক্রম অনুসরণ না করে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের এবং সাম্প্রতিক কিছু সংসদীয় বিতর্ক, রাজনৈতিক বিবৃতি তুলে ধরছি :

'গণ-পরিষদে ভাষা সম্পর্কে আলোচনায় অবাঞ্ছিত আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। শঙ্কররাও দেও বক্তৃতা করিতে উঠিলে সদস্যগণ উত্তেজিত হইয়া পড়েন এবং চিৎকার পালটা চিৎকার চলিতে থাকে।' শঙ্কররাওয়ের উক্তি কী ছিল, যার জন্য এত চিৎকার! 'ভাষাগত ঐক্য এবং সংস্কৃতি ও ধর্মগত ঐক্য এক নহে···আমি একজন ভারতীয়। আমি হিন্দি জানি, ইংরেজি জানি, মারাঠি জানি। তবুও যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন যে আমার ভাষা কী, তাহা হইলে আমি বলিব 'মারাঠি', হিন্দি নয়।' ("যুগান্তর", ১৯৪৯)।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতির বিষয় বিহার বিধানসভার বিতর্ক, প্রসঙ্গ সীমানা পুনর্বিন্যাস। বক্তা তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ড. শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। মানভূম জেলার কিয়দংশ, সাঁওতাল পরগনা ও অন্যান্য অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির দাবি এবং ওই মর্মে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গৃহীত প্রস্তাব সম্বন্ধে ড. সিংহের উক্তি : 'এইরূপ দাবি করা হইয়াছে যে পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলি যেসব স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা যেসব স্থানের উপর দিয়া

বহিয়া গিয়াছে, নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য সেইগুলি ওই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কাশ্মীর সম্পর্কে অবৈধ দাবির সমর্থনে পাকিস্তান যেসব যুক্তি উত্থাপন করিয়াছিল, উপরোক্ত যুক্তিগুলি তাহারই অনুরূপ।' ("আনন্দবাজার", ১৯৫৩)।

তৃতীয় উদ্‌ধৃতি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর, প্রসঙ্গ ঝাড়খণ্ডী ভাষাসমূহের স্বীকৃতি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকলিপিতে (৩১. ১. ৮৯) ঝাড়খণ্ড সহায়ক সমিতি দাবি করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি, মুণ্ডারি, হো, কুর্মালি প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার বিভাগ খুলতে হবে; এবং যেসব অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষী মানুষ জনসংখ্যার ১০%-এর বেশি, সেখানকার স্কুল-কলেজে সংশ্লিষ্ট ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। এক প্রেস বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ করে বলেন, 'মেডিকেল ও ইনজিনিয়ারিং কোর্স অলচিকিতে পড়ানো সম্ভব? আর মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় তো ওদের সংখ্যা মাত্র ৪%, ৮%, ১৭%। সুতরাং ঝাড়খণ্ডের দাবি অযৌক্তিক' ("স্টেটসম্যান", ১৯৮৯)। এর সমালোচনায় ঐ পত্রিকার চিঠিপত্র কলমে জে. সি. সি. নেতা সন্তোষ রাণা যথার্থভাবেই বলেছেন, অলচিকি একটা লিপি, ভাষা নয়। মুখ্যমন্ত্রীর অজ্ঞতাই প্রমাণ করে আদিবাসী এলাকার প্রতি অবহেলা কত গভীর। শ্রীরাণা এই অঞ্চলের ৭০ লক্ষ কুর্মালি-খোট্টা-ভাষী মানুষের সংখ্যা দিয়েছেন। এইসব সংখ্যার বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই। মূল প্রশ্নে অর্থাৎ ভাষার রাজনীতিতে ফিরে আসা যাক।

পরবর্তী ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এইসব উদ্‌ধৃতি-সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সংশ্লিষ্ট নেতাদের উক্তি কত অযৌক্তিক এবং সংকীর্ণ-রাজনৈতিক-স্বার্থ-দুষ্ট। সরকারি ভাষানীতি এবং হিন্দি সমর্থকদের বাড়াবাড়ি অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলিকে কীভাবে হিন্দি-বিরোধী তথা উত্তরভারতবিরোধী করে তুলেছে, তা আমরা দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গের দাবি সম্বন্ধে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে কথা বলেছেন, তার উত্তর রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনই দিয়ে দিয়েছেন। মানভূমির অংশ পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তরিত করার সুপারিশ করার সময় কমিশন ওই অঞ্চলে বাঙলা ভাষা আর সংস্কৃতির প্রাধান্য, এবং নদী উপত্যকা-পরিকল্পনার স্বার্থের কথা বলেছিলেন। সাঁওতাল পরগনায় হিন্দি-ভাষী ৪৩%, সাঁওতালিভাষী ৪১%—এই যুক্তিতে বিহার পশ্চিমবঙ্গের দাবি নস্যাৎ করেছিল। পরে দেখা গেল, ভাষা-সংস্কৃতির দাবিতেই সাঁওতাল পরগনা ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের মূল ঘাঁটিতে পরিণত।

ভাষার প্রশ্নে কংগ্রেস নেতৃত্ব বরাবরই বিভ্রান্ত এবং বিভক্ত। উদ্ধৃত ঘটনাবলী, সিদ্ধান্ত এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে কংগ্রেস নীতি পর্যালোচনা করলেই তা বোঝা যায়। কংগ্রেসের মধ্যে রক্ষণশীল গোষ্ঠী বরাবরই হিন্দির প্রাধান্য এবং ভূমিপুত্রদের জন্য চাকরি সংরক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন। বিহার সম্পর্কে রাজেন্দ্রপ্রসাদ কমিটি (১৯৩৮) রিপোর্টই তার প্রমাণ। এই রিপোর্টে বিহারে সরকারি চাকরি বিহারীদের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়। নেহরু আর তাঁর অনুগত গোষ্ঠী ভাষাভিত্তিক রাজ্য তথা জাতিসত্তার দাবির বিরোধিতা করেছিলেন জাতীয় অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায়। সেজন্য স্বাধীনতার পরই বিশাল অন্ধ্র আন্দোলনের ব্যাপারে অনমনীয় নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু যেসব কারণে হিংসা, দাঙ্গা, সংহতি বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় এই নীতি, পরিণামে তার চেয়ে খারাপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ৫৩ দিন অনশনের পর শ্রীরামালুর মৃত্যু, তজ্জনিত জনরোষ ও বিক্ষোভের পর নেহরু সরকার অন্ধ্র রাজ্য গঠনের দাবির কাছে নতিস্বীকার করে। পৃথক মহারাষ্ট্রের জন্য আন্দোলনের (১৯৬০) ক্ষেত্রেও একই অনমনীয় নীতি অনুসৃত হয়। ১৯৬৬ সালে পানজাব ভাগ হয়; তারপর আসামের অবিরাম বিভাগ চলতে থাকে। মেঘালয়, অরুণাচল, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ডেই তা শেষ নয়। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার—কংগ্রেসের রাজ্য স্তরের নেতা আর কর্মীরা এইসব আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। দিল্লীর নেতৃত্ব আর রাজ্য স্তরের নেতৃত্বের মানসিকতার বিভেদ উড়িষ্যার সাইমন কমিশনকে স্বাগত জানানোর সময় থেকেই প্রকট ছিল, পঞ্চাশের দশকে তা আরও গভীর হয়। এত সব সত্ত্বেও কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব ভাষা-সংস্কৃতির প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণে উৎসাহী হয় নি। পরবর্তী কালে আসামে ভাষা-দাঙ্গায়, পানজাবি সুবার দাবিতে, ঝাড়খণ্ডের প্রশ্নে কংগ্রেস সুবিধাবাদী পরস্পরবিরোধী নীতি অনুসরণ করছে। সম্প্রতিকালে, গোর্খাল্যানড, বড়োল্যানড, ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে,—কেন্দ্রীয় সরকার তথা কংগ্রেস নেতৃত্ব কিছু ক্ষেত্রে আন্দোলনকারীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে, কিছু ক্ষেত্রে বিরোধিতা করছে। বিহার রাজ্যে আবার পার্টির আভ্যন্তরীণ দলাদলি এবং গোষ্ঠীচাপের রাজনীতির স্বার্থে ঝাড়খণ্ডের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সাথে সমঝোতা করে চলেছে। এই সম্পর্কের সূত্রে আবার ঝাড়খণ্ড গোষ্ঠী ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চাও ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেছে।

ভাষা নিয়ে রাজনীতিতে কংগ্রেস ছাড়াও অন্য দলগুলি—কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট, জনসংঘী সবাই অগ্রণী। এ দেশের মার্কসবাদীরা ভাষার প্রশ্নে লেনিন আর স্তালিনের তত্ত্ব অনুসারে রাজ্য, অঞ্চল ও গোষ্ঠী-গত স্বাধিকারের দাবি তুলে এসেছেন। লেনিনের মতে, প্রলেতারিয়েতের দায়িত্ব হচ্ছে উপনিবেশের আর স্বদেশের শোষিত জাতির স্বাধিকারের জন্য লড়াই করা। স্তালিনের মতে, জাতিসম্প্রদায়গঠনে ভাষাগত ঐক্য আবশ্যিক—এই সূত্র অনুসারেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি, শিখস্থানের, গোর্খাস্থানের দাবি সমর্থন করে এসেছে। ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের আন্দোলনে, বঙ্গ-বিহার-সংযুক্তিবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছে যুক্তিসঙ্গত-ভাবেই। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিরোধী নেতা থাকার সময় বিধানসভায় (ডিসেমবর, ১৯৫৫) বলে বসেন, 'ন্যায়বিচারের কথা বললে দার্জিলিঙের নেপালি-দের স্বাধিকার দেওয়া উচিত। তারা নেপালি ভাষায় প্রশাসন চালাক, এতে তাদের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে' (উদ্ধৃত, সরকার)। ১৯৭৭ সালেও পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার প্রস্তাবে নেপালি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিল অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু ঝাড়খণ্ডীদের ভাষাকে রাজ্যস্তরে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে জ্যোতি বসু তথা মার্কসবাদী পার্টির এত বিরোধিতা কেন? ক্ষমতার সমীকরণ ও সহজাত প্রবণতায় জাতিসত্তার স্বাধিকারের প্রশ্নে 'রাতারাতি পালটে গেল মতটা' হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতির দাবিকে বিচ্ছিন্নতা-বাদী আখ্যা দেওয়ার পক্ষে যুক্তি কী? অথবা দেওয়াল লিখন—'ওরা চায় ঝাড়খণ্ড, আমরা চাই ঐক্যবদ্ধ ভারত', 'রক্ত দেব, বাংলাকে ভাগ হতে দেব না' ইত্যাদি!

নতুন ভাষা!

লেখার সূচনায়ই বলা হয়েছে, ভাষা নিয়ে রাজনীতি তথা ভাষা-সংস্কৃতির রাজনীতিকরণ হয় ঠিকই, আবার ওই সূত্রে ভাষাও গড়ে ওঠে, নতুন রূপ পায়। ভাষা-সংস্কৃতির আবেগকে ভিত্তি করে গোষ্ঠীস্বকীয়তা, আত্মপরিচিতি নতুন তাৎপর্য পায়, যেমন হয়েছে গোর্খাল্যানড আর ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে। খালিস্তান আন্দোলনের পেছনেও ভাষার প্রশ্ন রয়েছে পট-ভূমিকায়, একথা আগেই উল্লেখ করেছি। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে ভাষার ব্যবধান আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করেছে দীর্ঘকাল। সম্প্রতিকালে ভাষা-সংস্কৃতির ঐক্য প্রচেষ্টার সূত্রে মরে-যাওয়া ভাষা প্রাণ পেতে পারে—এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ভাষাগোষ্ঠীর বিচারে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে তিনটি ভাষাগোষ্ঠীর বসবাস। অঞ্চল বলতে প্রস্তাবিত ২১টি জেলা: পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুরসহ বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার পরস্পরসংলগ্ন জেলা-সমূহ। তিন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে: (১) অস্ট্রিক

সাঁওতালি, মুণ্ডারি, হো, বীরহোড়, মাহালি, খেড়িয়া ভাষা; (২) দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী—ওরাওঁ, মালপাহাড়ি, কুরুপ, মাল্টো; (৩) কুর্মালি ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে কুর্মালি, কুরুখ, খোট্টা, আচপরগনিয়া। এ ছাড়া চতুর্থ আছে বাজারি ভাষা—সদরি, নাগপুরিয়া নামে পরিচিত। ব্যবহারিক লেনদেনের সূত্রে এই মিশ্র কথ্য ভাষা গড়ে উঠেছে। কুর্মালির মতো এই ভাষারও নিজস্ব লিপি নেই, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লিপিতেই কাজ চলে। হো, বীরহোড়, মুণ্ডারা নিজেদের ভাষা ছাড়াও সদরি আর বাসভূমের ভাষা—অর্থাৎ বিহারে হিন্দি, পশ্চিমবঙ্গে বাঙলা ব্যবহার করে। হো, বীরহোড় ভাষা সাঁওতালির কাছাকাছি। সাহালি ভাষা আবার হিন্দু প্রভাবে পড়ে নতুন রূপ পেয়েছে; সুনীতিকুমার একে মানভূমি বাঙলা অ্যাখ্যা দিয়েছেন। 'এক লকের দুটা বেটা ছিল, অদের ভিতরে ছুটু বেটা বাপকে বৈললেক', ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এই উপভাষা, আর কুর্মালি ভাষার আগে পার্থক্য খুবই নগণ্য। অবশ্য অঞ্চলবিশেষে কুর্মালি সংশ্লিষ্ট এলাকার ভাষার দ্বারা প্রভাবিত।

পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সাঁওতালি ভাষায় অলচিকি লিপি প্রবর্তন করার পর পশ্চিমবঙ্গে রোমান বনাম অলচিকির ঝগড়া ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করে, লিপির ঝগড়া ধর্মের স্তরে গিয়ে খ্রীশ্চান-অখ্রীশ্চান বিরোধে রূপ নেয়। সম্প্রতি আন্দোলনের নেতৃবর্গের প্রয়াসে প্রস্তাব উঠেছে, অলচিক প্রবর্তন করে অস্ট্রিক সব কটি ভাষাকে ঐক্যবদ্ধ করা হোক (স্টিয়ারিং কমিটি, ১৯৮২)। ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং সংখ্যাগুরুর ভাষা কুর্মালি আর সদরি প্রায় ১ কোটি ও ৫০ লক্ষ লোকের কথ্য ভাষা। কুর্মালি হচ্ছে কুর্মীদের ভাষা, দেশান্তর আর নতুন বাসভূমের প্রভাবে এই ভাষা ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েছে, পেয়েছে মিশ্র ভাষার রূপ। আদি চরিত্র খুঁজে পাবার জো নেই। ডালটন সাহেবের মতে, এই ভাষা বিহারের ইন্দো-আর্য গোষ্ঠীর কুর্মীদের সমগোত্রীয়। রিজলে কিন্তু বিহারের কুর্মীদের সাথে নৈকট্যের যুক্তি মানেন নি, তাঁর মতে এই ভাষা দ্রাবিড়গোষ্ঠীজাত। ড. গ্রীয়ারসন একে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর বলেছেন, তবে মৌলিক ভাষাও হতে পারে বলে তাঁর মত। সাংস্কৃতিক দিক থেকে সাঁওতাল, ভূমিজ ও কুর্মীরা খুব কাছাকাছি।

ভাষাতত্ত্বের বিচারে যাওয়ার অবকাশ নেই, সেই যোগ্যতাও লেখকের নেই। আন্দোলনের সূত্রে ভাষাবিকাশের দিকটাই বিচার্য। ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" গ্রন্থ আবিষ্কারের (১৯০৭) সূত্র ধরে ঝাড়খণ্ড বুদ্ধিজীবীরা কুর্মালি ভাষার মৌলিকত্ব আর প্রাচীনত্ব বিষয়ে সোচ্চার হয়েছেন। কীর্তনগানের বই, এই গ্রন্থের টীকা সংস্কৃত ভাষায়, কিন্তু মূল গ্রন্থের ভাষা অনাবিষ্কৃত। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, চর্যাপদের ভাষা দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর বৃহত্তর গৌড়ের ভাষা। চর্যাপদে যে ভূখণ্ডের ছবি পাওয়া যায় তা নিম্ন ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পার থেকে আরম্ভ করে উড়িষ্যার কিয়দংশ, বিহারের অংশ ও কামরূপ অঞ্চল। অর্থাৎ এর একাংশ ছোটোনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল যা ঝাড়খণ্ড নামে পরিচিত। 'চর্যাপদগুলিতে যে পরিবেশ ও নায়কনায়িকার বর্ণনা রয়েছে তার অধিকাংশের সঙ্গে ছোটোনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলের নদী, পাহাড়, জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশের সাদৃশ্য রয়েছে' (পূজারী, ১৯৮৫ : ৪-৬)। চর্যাপদের ভাষায়ও ছোটোনাগপুরী আদিম অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব রয়েছে। চর্যাপদে কুর্মালি সর্বনাম, ক্রিয়ার রূপ ছাড়াও বহু শব্দ কুর্মালি ভাষায় এখনো রয়েছে।

ভাষা নিয়ে এই ধরনের চর্চা এবং উৎস-অন্বেষণ সম্ভব হয়েছে আন্দোলনের প্রভাবে। চল্লিশ দশকের শেষদিকে 'কুর্মালি ভাষা বাঁচাও' আন্দোলন শুরু করেন বসন্ত মেহেতা, ১৯৫৩ সালে প্রথম কুর্মালি গ্রন্থ "কপিলামঙ্গল" প্রকাশিত হয়, লেখক রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এর পর বহু পত্রপত্রিকা, গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকার মধ্যে "শিলালিপি", "আখড়া", "শালপত্র", "সারছল", "মানভূমেক কথা", "ফুরুঙ", "ঝাড়খণ্ড",

"গৌরিক পতাকা" উল্লেখ্য। এবং এই সূত্রে ঝাড়খণ্ডী সত্তার অন্বেষণ চলতে থাকে কুর্মি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর নব্যশিক্ষিত প্রজন্মের মধ্যে। আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রয়াসে প্রস্তাব উঠেছে কুর্মালি গোষ্ঠীর সবকটি ভাষা—সদরি, কুর্মালি, কুরুখ, নাগপুরিয়া, পরগনিয়াকে দেবনাগরী লিপিতে এনে ঐক্যবদ্ধ করা হোক। ঐক্যবদ্ধ ভাষা গড়ে তোলার এই প্রয়াস কার্যকর হলে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সহজাত বিভেদপ্রবণতা কমবে। ব্যাকরণ, ভাষার ব্যবহারিক প্রয়োগরূপ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনে একটি ভাষা কমিশন বসানোর প্রস্তাবও রয়েছে।

প্রসঙ্গত গোর্খালি ভাষার কথাও উল্লেখ্য। এই নামে আদৌ কোনো ভাষা নেই। গোর্খাল্যানডের আন্দোলনের সূত্রে এই ভাষার উদ্ভব। নেপালের ৭০ মাইল দূরে এক জেলার নাম গোর্খা, সেখানকার চালু ভাষা মগর কুরা, গুরুঙ কুরা। ভারতে বসবাসকারী নেপালিরা অনেকেই গোর্খা-আগত, সেই সূত্রে গোর্খালি ভাষার দাবি। আদতে নেপালি খস কুরা ও গোর্খালি একই। আন্দোলনের খাতিরে এখন আত্মপরিচিতি তথা স্বকীয়তার প্রতীক হিসাবে গোর্খা ব্যবহৃত হচ্ছে। ওই স্থাননামের সাথে জাতিসত্তা একাত্ম হয়ে উঠেছে, সেই অনুযায়ী পুরানো ভাষার নতুন নামকরণ। হয়তো ভারতীয় ইংরেজির মতো গোর্খালিও ভারতীয় নেপালি রূপে আপন বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে।

ভদ্রলোক প্রভাব

ভাষা আর সংস্কৃতির দাবিতে আঞ্চলিক আন্দোলনমাত্রেই সংখ্যার একটা ব্যাপার থাকে। সংকীর্ণ গোষ্ঠীবাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে সেনসাসে মাতৃভাষা বদলের ঘটনাও সুবিদিত। পানজাবে হিন্দু এবং আসামে বাংলাদেশী শরণার্থীদের দৃষ্টান্ত রয়েছে। হিন্দুরা রাতারাতি হিন্দিভাষী, বাংলাদেশীরা অসমিয়াভাষী হয়ে যান। গোষ্ঠী হিসাবে নিরাপত্তাহীনতার বোধ থেকে এই প্রবণতা। পানজাবে আর আসামে সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতালাভের জন্যই আঞ্চলিক আন্দোলন জঙ্গি রূপ নিয়েছে—এমন ধারণা বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে দেখা গেছে, ভাষা ওজুহাতমাত্র। সংকীর্ণ গোষ্ঠীবাদ বা বিজাতীয় মানসিকতা বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শিকড় বিস্তার করলে তা ক্রমাগত জ্ঞাতিশত্রু খুঁজে বেড়ায়। হাতিয়ার হিসাবে বেছে নেয় কখনো ভাষা, কোনো সময়ে উন্নয়নের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় বা তৈলশোধনাগার স্থাপন, ক্ষেত্রবিশেষে বিদেশী অনুপ্রবেশের ওজুহাত। এই প্রক্রিয়া আসামে বহু বছর ধরে সক্রিয়। পশ্চিমবঙ্গে নয়। কেন?

ভাষা-সংস্কৃতির আবেগ পশ্চিমবঙ্গে অনুপস্থিত, এমন নয়। পুরুলিয়ার অন্তর্ভুক্তির দাবিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন, বিহারের সাথে সংযুক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন ও জনমত তার সাক্ষ্য বহন করছে। স্বদেশী ও বৈপ্লবিক আন্দোলনেও বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট—একথা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। আসামে যেসব কারণে আঞ্চলিকতার প্রসার ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে বা অন্য অনেক রাজ্যেই অনুরূপ কারণ রয়েছে। কিছু বিদেশী পণ্ডিত অসমিয়া আঞ্চলিকতাবাদের কারণস্বরূপ অসমিয়াদের ন্যূনতম গতিশীলতা তথা অন্য রাজ্যে কম সংখ্যায় বসবাস স্থাপনের কথা বলেছেন (ওয়াইনার, ১৯৮৬)। গতিশীলতার ব্যাপারে অসমিয়ারা সবচেয়ে নীচে, বাঙালিরা সর্বোচ্চ। কিন্তু তাহলে পানজাবে আঞ্চলিকতাবাদ দীর্ঘকাল ধরে জোরদার কেন? পানজাবিরাও গতিশীলতার ব্যাপারে অগ্রণী তো! চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালি-প্রাধান্যের জন্যই নবোদ্ভূত অসমিয়াদের ক্ষোভ—এই যুক্তিও রয়েছে। অনুরূপ অবস্থা তো বাঙলায় দীর্ঘকাল বজায় আছে। ১৮৮৬ সালে সমস্ত চটকল-শ্রমিক ছিল বাঙালি, ১৯০৬ সালে দুই-তৃতীয়াংশ অবাঙালি হয়ে যায়। ১৯১৮ সালে ভারতীয় শিল্প কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ৯০% অবাঙালি।

কয়লাখনি, চা-বাগান, বড়ো শিল্পে ভিন্নপ্রদেশবাসীর সংখ্যা অনেক বেশি (রায়, ১৯৩২ : ৪৫৩)। বড়ো শিল্পগুলিতে মোট নিযুক্ত শ্রমিকদের দুই-তৃতীয়াংশ বাইরের লোক—এই হিসাব ১৯৫২ সালের (বর্মন, ১৯৫৪ : ৪৮)। পরবর্তী কালে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় নি, কলকাতার বড়ো ব্যবসা আর শিল্পের মালিক কারা, তা সবাই জানেন। এর বিরুদ্ধে "জাগো বাঙালী" ধরনের বক্তব্য, বা "আমরা বাঙালী" জিগিরে বাঙলার মানুষ সাড়া দেয় নি। বর্তমান কলকাতা পুর এলাকায় ভিন্নপ্রদেশবাসীর সংখ্যা ৪৮%, তবু কিন্তু গত ত্রিশ বছরে কোনো জাতিবিরোধী দাঙ্গা হয় নি।

মাইরন ওয়াইনার, জন ক্রমফিল্ড, মার্কস ফ্রাঙ্কা প্রমুখ মার্কিন গবেষকরা পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে তাঁদের বিশ্লেষণে ভিন্নপ্রদেশবাসীর প্রতি বাঙালিদের তাচ্ছিল্য, অবমাননাকর উক্তির—উড়ে, মেড়ো, খোট্টা ইত্যাদি—দৃষ্টান্ত দিয়ে বাঙালির জাত্যভিমান তথা সাম্প্রদায়িকতার ভিন্ন রূপের কথা বলেছেন। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে ওই জাতিগোষ্ঠীর শোষণ, এবং উড়িষ্যা-বিহারে বাঙালি-বিরোধী দাঙ্গা, চাকরিতে স্থানীয়দের অগ্রাধিকারের আইন সত্ত্বেও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জাতি-বিরোধী কোনো আন্দোলন হয় নি। এই দিকটি তাঁরা উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। বাঙালির রসবোধ, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের অভিমান হয়তো একটু বেশিই। সেই সূত্রে তারা পূর্ববঙ্গের মানুষদেরও বাঙাল, জার্মান ইত্যাদি বলে আখ্যা দেন। বাঙাল-ঘটির ঝগড়া তো পুরানো ব্যাপার। এ-জাতীয় আঞ্চলিক অভিমান বিশ্বের সব দেশে আছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উচ্চবর্ণের নেতাদের প্রাধান্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিদেশী সমাজ-বিজ্ঞানী, এবং উত্তরভারতের কিছু বুদ্ধিজীবী বাঙলায় সূক্ষ্ম আকারে জাতপ্রথার প্রভাবের কথা বলেন। বাঙলার সমাজে, রাজনীতিতে ভদ্রলোকদের প্রাধান্য নিশ্চয়ই আছে। সমাজ-মর্যাদা সিঁড়িতে মুক্ত ব্যবস্থা হিসাবেই ভদ্রলোকবাদকে গণ্য করা হয়। কিছু সমাজবিজ্ঞানী উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা ও পরবর্তী কালে রাজনীতিতে বর্ণভিত্তিক গোষ্ঠী-নিগড়ের কথা বলেছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় বহু-বর্ণবিশিষ্ট দলের অস্তিত্ব ছিল, সমাজসংস্কারে এই দলাদলি বা দলভিত্তিক গোষ্ঠীর সমাজনীতি ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিল। বহু আমূলপরিবর্তনকারী সংস্কার এই দল বা গোষ্ঠীর কার্যকারিতার জন্যই সম্ভব হয়েছে (বসু, ১৯৮৭)। ঝাড়খণ্ড ও গোর্খাল্যানড উত্তরবঙ্গের কামতাপুরী আন্দোলনের মুখপাত্ররাও কলকাতার ভদ্রবাবুদের শোষণ ও নব্য উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

কৌলীন্য, শিক্ষা, কর্মযোগ্যতা, সংস্কৃতিস্মন্যতা—এইসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিকশিত ভদ্রলোক-ব্যবস্থায় জাতি-বর্ণবাদের প্রত্যক্ষ নিগড় খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বাঙলার রাজনীতিতে নিম্নবর্ণ বা মধ্যবর্গের মানুষদের থেকে নেতৃত্ব উঠে আসে নি, একথা ঠিক। দু-একটি জেলায় মাহিষ্যশ্রেণীর কিছু সংঘবদ্ধ পকেট আছে, যার নজির দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বর্ণ-রাজনীতির অস্তিত্বের কথা প্রমাণের প্রয়াস করেন অনেকে। কিন্তু এই মাহিষ্যগোষ্ঠীর রাজনীতিকরণে মূল ভূমিকায় ছিলেন ভদ্রলোকেরাই, মেদিনীপুরে যেমন স্বামী প্রজ্ঞানন্দের কথা উল্লেখ করা যায়। বিশেষবর্ণভুক্ত হওয়ার জন্য নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পান নি, এমন ঘটনা বিরল। বরং যেসব রাজ্যে বিশেষ-বর্ণ-জাতিভুক্ত হওয়ার সুবাদে নেতা গড়ে ওঠে, সেসব অঞ্চলে জাতপাত ও জাতি-সংঘাত-হিংসা বেশি প্রকট। ভদ্রলোক-নেতৃত্বাধীন সমাজসংস্কার, বিপ্লবী আন্দোলন ও রাজনীতির সুবাদেই পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক স্তরে জাতিবাদের দাপট নেই, ভাষাসংকীর্ণতা বা বিজাতীয় মানসিকতাও অন্য প্রদেশের তুলনায় নগণ্য। ১৯৫০-৭১ কালপরিধিতে পশ্চিমবঙ্গে ২৪টি মূল আন্দোলন হয়েছে, একমাত্র বাগমারির শিখ-বিরোধী দাঙ্গা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে ভাষাজাতির কারণে সংঘাত হয় নি (ডি. ডি. ১৯৭৪)। ১৯৭২

সালে কলকাতার একটি ইংরাজি দৈনিকের মন্তব্যর প্রতিক্রিয়ায় উড়িষ্যায় বাঙালি-বিরোধী দাঙ্গা হয়। কলকাতায় উড়িষ্যাবাসীদের বহু পাড়া আছে, সেইসব পাড়ায় কিন্তু কোনো ঘটনা হয় নি। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার প্রতিক্রিয়ায় সারা দেশে শিখবিরোধী দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে শান্তির পরিবেশ ভদ্রলোককেন্দ্রিক রাজনীতির ইতিবাচক অবদানের পরিচয় বহন করে।

স্বীকৃতি বনাম উন্নয়ন

ভাষা আর সংস্কৃতির সরকারি স্বীকৃতির দাবিতে আঞ্চলিক আন্দোলন সহজেই জনপ্রিয় আবেগ উদ্বুদ্ধ করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে যেমন ঝাড়খণ্ড ও গোর্খা-ল্যানডের দাবিতে ভাষার স্বীকৃতির প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ, আবার ওইসব আন্দোলনে অর্থনৈতিক বঞ্চনাবোধ ও উন্নয়নের প্রশ্নও মৌলিক উপাদান। কিন্তু অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে ১০৫টি আদিবাসী-উপজাতি ভাষার দাবি আসতে পারে। ঝাড়খণ্ডের বক্তব্যেই প্রকাশ, একটা শিশুকে ইংরাজি রোমান অক্ষরে, বাঙলা বাঙলা অক্ষরে, হিন্দি দেবনাগরী অক্ষরে শিখতে হবে। জানতে হবে তিনটি ভাষা, যার একটাও তার মাতৃভাষা নয় (সহায়ক সমিতি, ১৯৮৮ : ২৩)। আবার একই সাথে অঞ্চলের অনগ্রসরতার সংখ্যাতত্ত্ব রয়েছে, স্বভাবত শোষণেরও। কিন্তু ওই অঞ্চলের আদিবাসী শিশুকে মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার দেওয়া হলেও তাকে বসবাসকারী রাজ্যের ভাষা আর ইংরাজি শিখতে হবে। নতুবা আধুনিক যুগের প্রতিযোগিতায় সে শিশু উন্নয়নের সিঁড়ি ধরবে কীভাবে? কটাক্ষমূলক হলেও জ্যোতি বসুর মন্তব্য তো যুক্তিপূর্ণ, প্রযুক্তিবিজ্ঞানে শিক্ষাদান কি আঞ্চলিক ভাষায় সম্ভব? আর ঝাড়খণ্ডীরা বা গোর্খারা কি শুধু নিজেদের ভাষায়ই সব কাজ চালাবে! এইভাবে সব অঞ্চলে স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা ও প্রশাসন চললে রাজ্য-স্তরে তাদের বিচ্ছিন্ন অবস্থা এসে যাবে না! ভাষা-সংস্কৃতির স্বীকৃতির দাবি ন্যায্য, তবে এর সাথে যুক্ত রাজনীতির অশুভ প্রভাবের বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার।

প্রসঙ্গত দার্জিলিঙে নেপালি ভাষা প্রচলনের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে ঘিসিং অভিযোগ করেছেন, পার্বত্য মহকুমাগুলিতে নেপালি ভাষা চালু করা দূর অস্ত রয়ে গেছে রাজ্য সরকারের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য (জি. এন. এল. এফ, ১৯৮৭)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৪৯ সালে দার্জিলিঙের বিদ্যায়তনগুলিতে নেপালি ভাষা প্রবর্তনের জন্য সার্কুলার দেয়। এতকাল বাদেও দার্জিলিঙ জেলায় ৫০% মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে মাধ্যম হিসাবে নেপালি চালু হয় নি। দীর্ঘযুগ পশ্চিমী সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হওয়ার জন্য দার্জিলিঙ শহরেই ইংরাজি ভাষার দাপট যায় নি (সেন, ১৯৮৮ : ৯০)। কাজেই, আবেগ সৃষ্টির জন্য আন্দোলনের নেতারা ভাষার প্রশ্নে যতই জঙ্গি হোন না কেন, ব্যবহারিক জীবনে উপযোগিতার বিচারে মানুষ সিদ্ধান্ত নেয়। তবে আন্দোলনের সূত্রে নেপালি ভাষা ভারতীয় নেপালি-দের বিভিন্ন গোষ্ঠী—গুরুং, মগর, কিরাত, ক্ষেত্রী, নেওয়ার—সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। ভাষাই স্বকীয়তা তথা আত্মপরিচিতির প্রতীক হয়ে উঠেছে।

ধনতন্ত্রের অসম বিকাশের সূত্রেই ভাষাভিত্তিক রাজ্য তথা ভাষা-আন্দোলনের উদ্ভব, এই কেতাবি মার্কসবাদী ধারণা বিভিন্ন রাজ্য এবং রাজ্য-অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে প্রাসঙ্গিক বোধ হয় না। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন নাকি শ্রেণীসংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছে। কারণ, ধনতন্ত্রের অসম বিকাশ ও বিভিন্ন রাজ্যের বিশিষ্ট পরিস্থিতি (প্রকাশ, ১৯৭৩ : ৭২)। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বক্তব্যে দেখা যাচ্ছে অন্য কথা—ভারতে জাতি-ভাষার দাবির ভিত্তিতে আরও বেশি রাজ্য হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু এর শেষ কোথায় (রায়, ১৯৮৭)! ক্ষমতায় এসে মার্কসবাদী সরকারি বক্তব্যেও একই কথা, এভাবে রাজ্য গড়তে হলে ২৫০০ রাজ্য করতে

হয়। তাতেও সমস্যা মিটবে না, কারণ তখনও কিছু সংখ্যালঘু একই দাবি নিয়ে সেসব রাজ্যে থাকবে (পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬)!

তাহলে ভাষাগত ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জাতি বা স্তালিনের ভাষায় জাতীয় সম্প্রদায় এবং তার স্বাধিকারের প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে কোথায়! বাঙলার রাজনীতির অভিজ্ঞতাই বলছে, শোষিত বঞ্চিত জাতিগোষ্ঠী তাদের ক্ষোভের প্রকাশ ঘটাতে শ্রেণীগত অর্থনৈতিক মাধ্যমের চেয়ে জাতি-গোষ্ঠীগত মাধ্যমই বেছে নেয়। ১৯৩০-৪০ দশকের বাঙলায় মুসলিম জনতা তাই করেছিল,—মুসলিম লীগের পেছনে দাঁড়িয়েছিল; হিন্দু নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল অর্থনৈতিক দাবিভিত্তিক আন্দোলনে যোগ দেয় নি। এর মার্কসবাদী ব্যাখ্যা কী? খালিস্তান, গোর্খাল্যানড, ঝাড়খণ্ড আন্দোলন সংশ্লিষ্ট জাতি-ভাষাগোষ্ঠী বিকাশের, উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। দার্জিলিঙ আর পুরুলিয়ার স্থিতি এক নয়, একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একই রাজনৈতিক ব্যবস্থাধীন এলাকায় এই দুই আন্দোলনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া মুশকিল। কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘকাল নেপালি ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে সোচ্চার, সেই সুবাদে ওই অঞ্চলে পার্টির ভিত্তিও গড়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও গোর্খা জাতিগোষ্ঠী বাঙালি উপনিবেশবাদের অভিযোগ তোলে কেন? নেপালি ভাষার ক্ষেত্রে এক নীতি, ঝাড়খণ্ডী ভাষাসমূহের ক্ষেত্রে ভিন্ন নীতিই বা কেন? সি. পি. আই বিহারের ঝাড়খণ্ডের সমর্থক, পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী! নির্দল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এ. কে. রায় ১৯৮১ সালে শোষণমুক্ত ঝাড়খণ্ড রাজ্য গড়ার আন্দোলনে জীবনপণ করলেন, ১৯৮৭ সালে বদলে গেল মতটা, কেন? আবার সি. পি. আই (এম.-এল) সন্তোষ রাণা-গোষ্ঠী ঝাড়খণ্ড, খালিস্তান থেকে শুরু করে খোমেইনির সালমান রুশদির খতমের পক্ষে সোচ্চার কেন? ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ভাগ হয়ে শিবুসোরেন গোষ্ঠী বিহারে কংগ্রেসের সাথে, বিনোদ মাহাতো গোষ্ঠী ঝাড়খণ্ড সহায়ক সমিতির শরিক! এতসব ধারা শোষিত জাতিগোষ্ঠীর স্বাধিকারের নীতি থেকে উদ্ভূত হতে পারে?

আসলে, ভাষা-সংস্কৃতির স্বীকৃতির দাবিতে জাতিগোষ্ঠীর আন্দোলন এক নতুন মাত্রায় পরিব্যাপ্ত হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, নানা রঙের রাষ্ট্রব্যবস্থায়। আগের ধরাবাঁধা তাত্ত্বিক আধারে ওইসব আন্দোলনের ব্যাখ্যা করা মুশকিল। এতকাল তো চারস্তম্ভবিশিষ্ট সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মডেলই আদর্শস্থানীয় বলে মনে করা হত। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের বহুজাতিবর্ণবিশিষ্ট দেশগুলিতে ওই মডেলের প্রাসঙ্গিকতা সবচেয়ে বেশি বলে দাবি করা হত। কিন্তু আর্মেনিয়া প্রজাতন্ত্রে নাগারনো-খারবাকের ঘটনাবলী, যুগোশ্লাভিয়ায় কসভো প্রদেশে সারবীয় জাতিবাদের উদ্ভব, উক্রেন, বেলোরুশিয়ায় ভাষার দাবিতে বিক্ষোভ এই মডেলের কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভাষার দাবি, সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যভুক্ত এলাকার আঞ্চলিক আন্দোলনে ভাষা-সংস্কৃতির দাবি বঞ্চনাবোধজনিত ক্ষোভের সাথে যুক্ত হয়ে এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। শুধু ভাষার দাবিতে রাজ্য গঠনের আন্দোলন, আর অর্থনৈতিক বঞ্চনাজনিত ক্ষোভ, উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলনের সাথে যুক্ত ভাষা-সংস্কৃতি আন্দোলন গুণগতভাবে ভিন্ন। অর্থনীতিযুক্ত এই ভাষার আন্দোলনেও আবার পার্থক্য আছে—আসামে অসমিয়া ভাষার সূত্রে বাঙালিবিরোধ আর ঝাড়খণ্ডে গোর্খাল্যানডে দিকু-বিরোধী, কলকাতার বাবুবিরোধী আন্দোলন। আসামের ক্ষমতাবিন্যাসে বাঙালিদের ক্ষমতা কম, সেখানে এই বিরোধিতা এক সাংস্কৃতিক বিজাতীয় মানসিকতা থেকে সৃষ্ট। ঝাড়খণ্ড-গোর্খাল্যানডে সংশ্লিষ্ট নেতৃত্ব তথা নবোদ্ভূত এলিট রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশ পেতে ভাষা-সংস্কৃতি তথা জাতিসত্তার আবেগকে ব্যবহার করছেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রশাসন, শিক্ষার স্তরে স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীর অংশ পাওয়ার সুযোগ সীমিত, তজ্জনিত ক্ষোভের এই বহিঃপ্রকাশ। এর সাথে যুক্ত হয়েছে অনগ্রসরতা এবং উন্নয়নপ্রকল্প কার্যকর হওয়ার পরিণতিতে স্বভূমি ও বনসম্পদ থেকে নির্বাসনজনিত ক্ষোভ। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের বয়স ৫০ বছরের বেশি, কখনো ঢিমেতালে, কখনো জঙ্গি রূপ নিয়ে চলছে। গোর্খাল্যানড আন্দোলন মাত্র চার বছরের মধ্যে চরম আকার নিয়ে দাবি আদায়ে সফল। অন্যদিকে আগেই কামতাপুরী আন্দোলন কোনোভাবেই দানা বাঁধছে না। কেন? ধনতন্ত্রের অসম বিকাশ, বা উন্নয়নপ্রক্রিয়ার সহজাত পরিণতি বিচারে এই বিভিন্ন রূপ, প্রতিক্রিয়া আর আবেগ-সংহতির ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

আঞ্চলিক আন্দোলন সংগঠিত হওয়া, সফল হওয়া বা না-হওয়ার পিছনে কিছু পরিস্থিতিগত ঘটনাপরম্পরার ভূমিকা রয়ে যায়। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বললে বুঝতে সুবিধা হবে। গত ৩১ জানুয়ারি ১৯৮৯ কলকাতায় ঝাড়খণ্ড সহায়ক সমিতির সমাবেশে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে নেতাদের বক্তৃতা শুনছিলাম। এক নেতা এন. ই. হোরো ধুতিপরা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সম্বন্ধে একটা অশালীন উক্তি করলে সভার একাংশে হাসির রোল পড়ে যায়। পাশের এক ঝাড়খণ্ড সমর্থককে মন্তব্যের অর্থ জিজ্ঞাসা করলাম। কিছু দ্বিধার পর তিনি বললেন, মর্মার্থ বোঝেন নি। অর্থাৎ ভাষার একটা ব্যবধান রয়েছে। তার ওপর আছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিধা আর বিরোধ। এর জন্যই এই আন্দোলন কিছুতেই দানা বাঁধছে না, অন্তত পশ্চিম বাঙলার প্রান্তে। পাশাপাশি গোর্খাল্যানডের আন্দোলনের চিত্র আলাদা। ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের বঞ্চনা ও শোষণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যপূর্ণ অভিযোগ রয়েছে, যার যথার্থতা প্রশ্নাতীত। গোর্খাল্যানডে অর্থনৈতিক দাবি তথা বঞ্চনার অভিযোগগুলির মধ্যে বেশির ভাগ ভাসাভাসা, সাধারণ অভিযোগ। মাত্র কয়েকটি প্রতীকের মাধ্যমে অন্ধ জাতি-আবেগ সংগঠিত করতে পারার জন্য এই আন্দোলন সফল। অবশ্য সরকারি বা প্রতিপক্ষ সামাজিক শক্তির অযৌক্তিক প্রতিক্রিয়ার দরুনও গোর্খা আবেগ আরও সুদৃঢ়ভাবে সংগঠিত হতে পেরেছে। সব ধরনের আন্দোলন, বিদ্রোহে এই প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রেও একটা ঘটনা উল্লেখ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে অধ্যাপক এক বন্ধু তাঁর গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য দার্জিলিং গিয়েছিলেন। বন্ধুটিও ফ্রন্ট-সমর্থক, এক বামপন্থী দলের প্রাক্তন কর্মী। শিলিগুড়িতে মার্কসবাদী দলের দপ্তরে কর্মীদের সাথে কথাবার্তার সূত্রে তিনি জানতে চাইছিলেন গোর্খাল্যানডের নেতারা, ঘিসিং, প্রধান এদের কোথায় পাওয়া যাবে। কর্মীরা বলছিলেন এরকম প্রয়াস বৃথা, কারণ ওরা সব আণ্ডারগ্রাউনডে। অধ্যাপক যখন বললেন, 'আমার অসুবিধা হবে না। ওরা সব আমার প্রাক্তন ছাত্র।' তার প্রতিক্রিয়ায় মার্কসবাদী এক কর্মীর চিৎকার 'ওরে তোরা সব দেখবি আয়, গোর্খাল্যানডের নেতারা এই ভদ্রলোকের ছাত্র, বন্ধু!' এই উক্তি থেকেই মানসিকতার পরিচয় মেলে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই আন্দোলনকারীদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, সরকারি দমননীতি ও আলোচনায় না যাওয়ার প্রবণতা, পালটা হিংসা দিয়ে প্রতিরোধ গোর্খা আবেগকে দৃঢ়বদ্ধ করতে সহায়ক হয়েছে। তৃতীয় দৃষ্টান্ত কামতাপুরী আন্দোলন; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় এর উদ্‌গাতা। তাদেরও একই কথা, দক্ষিণবঙ্গ তথা কলকাতা কর্তৃক শোষণ, অবহেলা। তার জন্য চাই কামতাপুরী রাজ্য। আসু ও সর্বভারতীয় কিছু নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে এরা আন্দোলন সংগঠিত করতে প্রয়াস পায়। এদের দাবি সম্বন্ধে আমার বিস্তারিত জ্ঞান নেই। বোধহয় ভাষার কোনো দাবি বা স্বীকৃতির ব্যাপার নেই। এদের দাবি, বক্তব্য জানার জন্য সংশিষ্ট পক্ষের কাছে আর্জি করেও কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি। কাজেই আন্দোলন যে অঙ্কুরেই নাশ হবে, তা বলাই বাহুল্য।

উৎসপঞ্জী

সতীশ কাকতি, Balkans in Assam, স্টেটসম্যান, জুন ১৮, ১৯৮৬ ; Valley against Valley, স্টেটসম্যান, অক্টোবর ২৯, ১৯৮৮।

জি. এন. এল. এফ., Memorandum to the Prime Minister, জুলাই ২২, ১৯৮৭।

টি. এন. মদন, ১৯৪৯ ইসলাম, বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, স. সজল বসু, ভারতের সমাজভাবনা, ১ম খণ্ড।

আর. এন. রায়চৌধুরী, ১৯৮৭, Why Punjabi Hindus Gave up Punjabi, স্টেটসম্যান, মে ১২।

জ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত, ১৯৭০, Language Conflict and National Development, Oxford.

পশুপতি মাহাত, ১৯৮৫, সেদিন স্বাধীন ঝাড়খণ্ড রাজ্য করা হল না কেন, মেদিনীপুর।

জন বনডুরান্ট্, ১৯৫৮, Regionalism versus Provincialism : A Study in Problems of Indian Unity, Berkeley.

যুগান্তর, ১৯৪৯, সেপটেমবর ১৬।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৫৩, মে ১৬।

স্টেটসম্যান, ১৯৮৯, ফেবরুয়ারি ৩।

সাধন সরকার, Gorkhland Puzzles Revisionists, CPI (ML)

Steering Committe on Alchiki, ১৯৮২, প্রস্তাব, রাঁচি।

পুজারী, ১৯৮৫, চর্যাচর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থের ভাষায় কুর্মালি ভাষার প্রভাব, সারহুল, ফেবরুয়ারি সংখ্যা।

পি. সি. রায়, ১৯৩২ Life and Experience of a Bengali Chemist, ১ম খণ্ড, Kegan Paul, London.

দেবজ্যোতি বর্মণ, ১৯৫৪, বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী, জাগো বাঙ্গালী, কলকাতা।

সজল বসু, ১৯৮৭, বাঙ্গালী জীবনে দলাদলি, কলকাতা।

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, ১৯৭৪, কলকাতা পুলিস।

ঝাড়খণ্ড সহায়ক সমিতি, ১৯৮৮, ঝাড়খণ্ড আন্দোলন কি ও কেন? কলকাতা।

জহর সেন, ১৯৮৮, Darjeeling : A Favoured Retreat, দিল্লি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬, Gorkhaland Agitation : An Information Document, কলকাতা।

প্রকাশ কারাত, ১৯৭৩, Language and Nationality Politics in India, ওরিয়েন্ট লঙম্যান।

এ. কে. রায়, ১৯৮৭ Identity and Integration, স্টেটসম্যান, জুন ৩০।

গোপালকৃষ্ণ, ১৯৮৯, Gandhi and Communalism, Seminar, Indian Institute of Advanced Study, এপ্রিল ১৩।

আমাকে ফিরিয়ে আনে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বাঁ হাতে আঙুরলতা ডান হাতে আপেল,
আমি ইউজিন ক্যামপাসের অভিভাবক পাহাড়ে উঠে
এমন সুলভ স্বাস্থ্যরস ছুঁয়ে ভাবি কাকে আমি ছিঁড়বো প্রথম!
মেষপালকের বাণী আমেরিকার এই যৎসামান্য প্রবাসে
গ্রন্থের মুদ্রিত সুখে রোজই এনে রাখা হয় শিয়রে আমার,
আমি পড়েও দেখি না, তার বদলে দেখি এই ঈশ্বরপাহাড়ে
কে যেন আচ্ছন্ন ছবি তুঙ্গনাথ মেঘ করে ভাসিয়ে রেখেছে!
আমি বেদাঙ্গ হবার ভয়ে ঐ স্পষ্ট সাদা থেকে চোখ ফিরিয়ে এনেছি,
পাহাড়ে পাথর আছে, পাথরে রয়েছে কিছু অবলীল ঝরনার প্রক্রিয়া
তারা শব্দ পাঠাবে দূর মালভূমির শেষ অকবিকে···

আমি শব্দকে আঙুর করি, না হলে তো মদ
তেমন তুমুল হয়ে শিরা ঝলসাবে না, আপেলও থাকুক
ইভের পাপের জন্য, কবিতা না বুঝলেও
সে হয়তো চেনে সাপ, চিনেছে নিজের ক্ষিপ্রউরু উৎসঙ্গবিলাস!
শুধু পুরুষের জন্য বাঁচে প্রাচীন শূন্যতা
তাই সে নতুন উপমা খোঁজে, বুঝতে চায়
ফুল কার? বৃক্ষটি কে? উদ্ভিদসমাজে
আঙুর আপেল কতটুকু স্বাস্থ্য ফেরাতে পারে মানুষের মূলে!

আমার সামান্য ক্ষুধা ভাতের কাছেই আনে বারবার আমাকে ফিরিয়ে।

গাভী

মতি মুখোপাধ্যায়

নিবিষ্টতা চেয়েছিলে অর্জুনের তীরের ফলায়
প্রকৃত কি লক্ষ্য ছিল কিছু
মেঘ-ডিঙা দুই চোখ ভাসমান আকাশের নীলে
যার কোনো শিকড় ছিল না।

ও নয়ন সারল্যের নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি
নিখিলের মায়াহ্রদে সে-ই
প্রতিবিম্বে পেয়ে গেছে জাগতিক অনন্ত মাধুরী
বস্তুতে যা আবদ্ধ থাকে না।

দোহনে অমৃত দাও, তবু কেন বিষাদ-প্রতিম
ওই আঁখি কার অপেক্ষায়
আগামী সন্তান সে কি, নাকি হিমাঙ্ক আঁধারে তাকে
একদিন যেতে হবে বলে?

গাঢ়নীল শব্দবিষ

সন্তোষকুমার মাজী

টিলার উপরে ঐ জেগে আছে স্বপ্নময় চাঁদ

রাতের শরীর জুড়ে কুয়াশার গাঢ় আস্তরণ, ভাতঘুম
মাঠময় রৌদ্রকরোজ্জ্বল স্মৃতি বিছিয়ে রয়েছে
খড়ে ও নাড়ায় জড়িয়ে আছে কমণ্ডলু-ছেটানো শিশির

শরবন পেরিয়ে নীচুজমি, হেতালের বন
দূরে ঝাউবন, শনশন আর্তনাদ, তছনছ বাতাস
আত্মপ্রতিকৃতি যেন দুমড়ে-মুচড়ে যায়

অন্ধতা রয়েছে ঘিরে সংসারের মতো
অবিশ্বাসে ছিঁড়ে ফেলি সমস্ত কবচ
নদীতীরে জেগে আছে সহমরণের চিতা

বহুদিন কথাও বলি নি, তবু প্রতি রোমকূপে
গাঢ় নীল শব্দবিষ অলৌকিক শিহর ছড়ায়

নিরুদ্দেশ

সুদীপ চক্রবর্তী

ঘুম থেমে উঠলে খিদে পায়
হিম হাওয়া দিচ্ছে
এই সময় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির দরকার ছিল
শোনো, তোমাদের জামার বুকপকেটে
এক টুকরো মেঘ আছে ?

ঘুম থেকে উঠলে দেখি তোমার হলুদ মুখ
অনর্গল গাছের পাতা খসছে
এই সময় এক কাপ গরম চা, টাটকা জলখাবার
আহ্ স্বপ্নের ভিতর তোমাকে ছুঁতে ত্রিশ মাইল !

ঘুম থেকে উঠলে খিদে··· হলুদ মুখ
আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেয়

এক ব্যাগ ঠাণ্ডা গরম সুখ দুঃখ নিয়ে রাস্তায় নেমেছি।

বিজ্ঞানবিরোধীর ভূমিকায় বিজ্ঞানী : উৎস-সন্ধান

দেবব্রত ঘোষ

প্লাঙ্ক এবং একটি ধারা

ব্যক্তিগত জীবনে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ম্যাক্স প্লাঙ্কের ধারণা ছিল যে, একটি নতুন বৈজ্ঞানিক সত্য বিরোধীদের স্বীকৃতি আদায় করে উঠে আসে না। বরং সে উঠে আসে কেননা কালক্রমে বিরোধীরা মারা যায় এবং ইতিমধ্যে বেড়ে-ওঠা নতুন প্রজন্ম সত্যটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে। (A new scientific truth does not triumph by convincing the opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die, and a new generation grows up that is familiar with it)। দুর্ভাগ্যজনক যে এই বিরুদ্ধচারীরাও আসলে বিজ্ঞান-অনুশীলিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী! প্লাঙ্কের নিজের অভিজ্ঞতায়, থার্মোডাইনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্রের উপর তাঁর গবেষণা আর নতুন ধারণার সারবত্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা বুঝে উঠতে পারলেন না; স্বীকৃতি দূরের কথা, তিনি কোনো রকমের আগ্রহই দেখতে পেলেন না সেইসব ভৌত-বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা বিষয়টি সম্যক জানেন। খুব সম্ভবত হেল্মহোলৎজ বিষয়টি পড়েই দেখেন নি। অনেক প্রথিতযশা বিজ্ঞানী সরাসরি অস্বীকৃতি জানালেন, কেউবা নিরুত্তর থেকেই গেলেন। মজার ব্যাপার হল, হেল্মহোলৎজ নিজেও প্রথম জীবনে তীব্র বাধার মুখোমুখি হয়েছিলেন। প্লাঙ্ক বা হেল্মহোলৎজ এক-একটি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নন—এমন নজির বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রচুর। খুঁজে দেখতে গেলে দেখা যাবে, সাধারণভাবে এই ঘটনা বিজ্ঞানের গবেষণা, অগ্রগতি এবং আবিষ্কারের প্রতিটি স্তরে নানা রকমফেরে ঘটে এসেছে। তবু, এমন একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়ার বস্তুমুখী বিশ্লেষণ খুব সুলভ নয়, যদিও এ-কথা সত্যি যে সমাজ-অর্থনীতি, ধর্মীয়-ভাবগত ধ্যান-ধারণা, প্রযুক্তিবিদ্যা বিভিন্ন স্তরে কেমন করে সমসাময়িক বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেছে তার

বহু বিশ্লেষণ এবং আলোচনা হয়ে গেছে। ফলে যে প্রশ্নটি আমাদের গভীরভাবে ভাবায় তা হল—বিজ্ঞান-জগতের অন্তর্বর্তী এই বিজ্ঞানবিরোধের সামাজিক প্রক্রিয়াটি কী?

সলতে পাকাবার গোড়াতেই যে পালটা প্রশ্নটা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে তা হল : আজকের দিনে এ আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু? সাম্প্রতিক একটি অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বলা যাক।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার বেশ কিছু প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনার জন্য একটি ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির মিটিঙ। উদ্দেশ্য—প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন প্রজেক্টের মূল্যায়ন করা। কমিটিতে নির্বাচিত সদস্যরা বেশ নামজাদা বা জাঁদরেল ভারতীয় বিজ্ঞানী। সেইসব প্রৌঢ় এবং বিগত-যৌবন বিজ্ঞানীদের প্রায়ই দেখা গেল—নতুন ধারণায়, রোমান্টিক উচ্ছ্বাসে ভরা তরুণ বিজ্ঞানীদের বক্তব্যকে বা নতুনতর কোনো ধারণাকে 'কিছুই না' এমন একটা ভাবে নগণ্য করতে। এও কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—এমনই ধারাবাহিকতা! হয়তো দেখা যাবে, আজকের তরুণ বিজ্ঞানীদের অনেককেই দুই দশক পরে এই ধারাতেই মজ্জমান হতে। কেননা—শুধুমাত্র ব্যক্তিমুখী তিক্ত অভিজ্ঞতা বা অতিরঞ্জিত নাটকীয় বিবৃতি বাস্তবিক কোনো সত্যশিক্ষা দেয় না; তার জন্য দরকার হয় বস্তুমুখী অভিনিবেশের এবং একটি মানবিক দায়িত্ববোধের।

মুক্তমন ও বিজ্ঞানী

বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে চালু পরিচয় হল—একটা খোলা এবং সতর্ক মন, এক ধরনের গভীর মতবাদিক সহনশীলতা, সত্যনিষ্ঠা হল যার মূল্যবোধ। কার্যত, বিজ্ঞানীদের কোনো নিজস্ব স্বতন্ত্র মূল্যবোধসংজ্ঞার্থ এ নয়। এ হল চূড়ান্ত অর্থে মানুষের মূল্যবোধ, যে মানুষ বিজ্ঞানী-শিল্পী-শ্রমিক-নির্মাতা এবং স্রষ্টা। তার চেয়েও বড়ো কথা, এককভাবে এই মূল্যবোধ মানুষের সমস্ত আচার-আচরণের এবং ব্যবহারের পর্যাপ্ত জমি দিতে পারে না, তা যে যত জোরদারই হোক। তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে জুড়ে যায় নানান সামাজিক-অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক মূল উপাদান ও মূলকের প্রভাবসমূহ। ফলে, ঈপ্সিত মূল্যবোধ আরও প্রাণ পায়, নতুবা সীমায়িত হয় দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে। তাই বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান-বিরোধাত্মক আচরণের একটা সাধারণ অজুহাত হল—'আমরাও তো মানুষ।' এ শুধু ভাসাভাসা অবৈজ্ঞানিক সরলীকরণই নয়, তারও বেশি বিপজ্জনক। রামকৃষ্ণদেবের সেই গল্প—বাগান বানিয়েছি আমি আর গো-হত্যা হয়েছে ভগবানের ইচ্ছেয়। After all, scientists are also human beings—ভাবখানা, ভুল করবার বেলাই তাঁরা শুধু মানুষ। 'প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার অভাব' বা 'সাধারণ মানবপ্রবৃত্তি'—এই-জাতীয় তত্ত্বের ফলেই বিভিন্ন সময়ের বাধাপ্রাপ্ত অধিকাংশ বিজ্ঞানীই শুধুমাত্র তিক্ত-বর্ণনায়, বা নাটকীয় বিবৃতিতে নীতিবাগীশের মতো নিজেদের আবদ্ধ রেখেছেন। যথাযথ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বস্তু-সত্যে পৌঁছাবার চেষ্টা করেন নি।

মুক্তমন কথাটা জরুরি। এ কথা নিশ্চিতভাবে সত্যি—যে-কোনো সৃজনশীল প্রচেষ্টার পক্ষে 'খোলা-মন' একটা জরুরি আবহাওয়া। সম্ভবত প্রথম জরুরি শর্ত (the first necessity for philosophical investigation is a bold, free mind)। কিন্তু, শুধু free mind নয়, চাই bold, free mind; প্রয়োজনীয় কথা। 'মতবাদিক সহনশীলতা', 'মুক্তমন' ইত্যাকার ধারণা থেকে একটি প্রতিক্রিয়ার জন্ম হতে পারে, যদি না বিশ্লেষক, নির্ভীক মনটা ক্রিয়াশীল থাকে। তা হল এই যে, দুটো বিপরীতমুখী তত্ত্বকে একই সঙ্গে সঠিক বলে চালানোর চেষ্টা। দুটি তত্ত্বের মধ্যে আপাত-বিরোধ থাকতেই পারে যদি মধ্যেকার বাস্তব যোগসূত্রটা জানা না থাকে। কিন্তু, দুটি বিপরীত তত্ত্ব একই সঙ্গে কখনই ঠিক হতে পারে না। ব্যাপারটা উদাহরণ দিয়ে বোঝা যেতে পারে। বলা হল—যদুবাবু যুগপৎ বেঁচে আছেন এবং মরে আছেন। ব্যাপারটা একই সঙ্গে একই যদুবাবু সম্পর্কে সত্যি হতে পারে না, যদি না কোনো বিশেষ দর্শন বা রূপক অর্থ প্রয়োগ করা হয়। আরেকভাবে এই প্রকল্পটিকে চিন্তা করা যায়। জীবনের প্রতি ক্ষণে প্রাণের উন্মেষ ঘটছে, এবং কিছু প্রাণশক্তির বিলয় হচ্ছে, এবং সেটা প্রাণরাসায়নিক ও শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া-বিক্রিয়া দিয়ে ব্যাখ্যাও করা যায়। কিন্তু, সমস্যা অন্যত্র। সমস্ত বিপাকীয় ক্রিয়া নিয়েই, ফলত প্রতি মুহূর্তের বিলয় এবং আত্তীকরণ নিয়েই যে প্রক্রিয়া, তাই সামগ্রিক-ভাবে প্রাণ : বেঁচে থাকা। অর্থাৎ, এই বেঁচে-থাকার জৈব প্রক্রিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সমন্বয় আছে; আপাতবিরোধী প্রক্রিয়াগুলি পাশাপাশি শুধু সহাবস্থানই করছে না, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আছে। এবং, এই সমস্ত নিয়েই যে প্রয়াস, যে সংগ্রাম—তা-ই প্রাণ-নামক এককটি। ফলে, যদুবাবুর প্রসঙ্গে দুটি বিপরীতমুখী প্রস্তাব একই সঙ্গে সত্যি হতে পারে না। মনে রাখা দরকার, যাবতীয় আপেক্ষিকতা সত্ত্বেও একটি বিশেষ বস্তুপ্রশ্নে একটিই চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য। কেউ অবশ্য আত্যন্তিক উদারতা বা গভীর মুক্তমনে ভাবতেই পারেন—উপরের বিপরীতমুখী আজগুবি প্রকল্পও সত্যি। এহেন উদারতম মুক্তমন কার্যত বিজ্ঞানবিরোধের ধারাকেই জল-বাতাসা দিয়েছে।

বাধার চরিত্র — পেশাগত

মূল প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। বিজ্ঞান গবেষণা, অগ্রগতিতে বিজ্ঞানীদের নেতিবাচক ভূমিকার কারণ মূলত দুটি উৎসজাত। একটি সামাজিক, অপরটি সাংস্কৃতিক। অবশ্য এমন প্রায়ই হয় যেখানে দুটি কারণই এমনভাবে মিশে যায় যে তাদের আলাদা করে বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। সবচেয়ে সুলভ এবং কঠিন সামাজিক বাধাটি হল—পেশাগত। সহজবোধ্য একটি পেশাগত কারণ হল—বিশেষ-বিষয়গত বিশেষজ্ঞতা (specialization)। এই-জাতীয় বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা সবাই মানেন। কিন্তু, এর মধ্যেই নিহিত আছে এক ধরনের প্রতিক্রিয়ার বীজ। তা হল, আমরাই হলাম এই বিষয়টির বিশেষজ্ঞ : ফলে যা বলার বা বোঝার, আমরাই সবচেয়ে ভালো বুঝব। অন্যান্যরা সব বহিরাগত (outsider)। যদিও, তত্ত্বগতভাবে সবাই জানেন যে specialization একটা মনগড়া, আপেক্ষিক ধারণা; জ্ঞানের চরিত্র আদিগন্ত, এর বিচ্ছিন্ন কোনো খণ্ডজমিতে দেওয়াল তুলে আলাদা করা যায় না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দীর্ঘ ইতিহাসে বারে-বারে নতুন আবিষ্কারের স্বীকৃতির মুখে যে বাধাটা ব্যাপকভাবে কাজ করেছে তা হল, এই বহিরাগতবোধ। লুই পাস্তুরের জীবাণুতত্ত্বকে চিকিৎসকরা গোড়ায় তীব্র বাধা দিয়েছিলেন। কেননা পাস্তুর খাতায়-কলমে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, ওঁর পরিচয় ছিল—রসায়নবিদ। কে একজন রসায়নবিদ চিকিৎসাবিজ্ঞানের জমিদারিতে নাক গলাচ্ছে, এইমাত্র; চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞরা এর ফলে পাস্তুরের কাজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই দেখতে পেলেন না।

বিষয়গত-বিশেষজ্ঞতার আরেকটি উপজাত হল কর্তৃত্ব (authority)—আর তার থেকেই গড়ে ওঠা একটা নেতিবাচক অহংবোধ। বিশেষজ্ঞতা থেকে এই যে কর্তৃত্ব—তা এনে দেয় পরিচিতি, সমীহ, একটি উচ্চস্থান (পেশাগত), আর অনেকখানি ক্ষমতা! ফলে পেশাগত অবস্থানে নীচে যাঁরা, তাঁদের আবিষ্কার বা নতুন ধারণাকে স্বীকৃতি দিতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ-স্থানীয় স্বীকৃত কর্তাদের বিলক্ষণ আটকায়; দখলদারি হারাবার ভয়ে সেইসব কর্তাব্যক্তি এমনকী ক্ষমতার অযথাযথ ব্যবহার করতেও পিছপা হন না। এর ফলে যা সাময়িক হলেও পিছিয়ে পড়ে তা হল নতুন বিজ্ঞান-অন্বেষণের ধারা। কর্কশ হলেও এ সত্যি। এই কারণেই উনিশ শতকের গোড়াতে একটি ধ্রুপদী গাণিতিক সমস্যার উপর আবেলের আবিষ্কার তাঁর দেশে বা বিদেশে কোনো স্বীকৃতি পায় নি। আন্তর্জাতিক স্তরে সমসাময়িক কালে সুস্বীকৃত বিজ্ঞানী গাউস তা

নেড়েচেড়ে দেখারও প্রয়োজন মনে করেন নি। চতুর্থ ব্যারন র‍্যালে তাঁর পিতার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন কেমন করে লর্ড র‍্যালেকে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছিল এবং ···'In spite of all that had been written by the apostles of free discussion, authority could prevail when argument had failed! এই হল কর্তৃত্বের সমস্যা। সোনায় সোহাগা হয় যদি তার সঙ্গে জুড়ে যায় কোনো একটি বিশেষ মতবাদিক ধারার উদ্‌গাতা বা তার ধ্বজাধারী কেউ হন। কোনো বিষয়ের উপর দুটি বা ততোধিক মতবাদিক শিবির (schools) পরস্পরের বিরুদ্ধে যে ভঙ্গিতে সমালোচনা করেন, তা প্রায়শই বিজ্ঞানবিরোধী। বিশেষজ্ঞতা, কর্তৃত্ব এবং তার সঙ্গে মতবাদিক অন্ধত্ব (dogma) মিলেমিশে এক ধরনের উন্নাসিকতা আরোপ করতে পারে, যার নজির বিজ্ঞানের ইতিহাসে অপ্রতুল নয়। গ্যালিলেও ও তাঁর টেলিস্কোপ সম্পর্কে বারলান লিখেছেন যে, কিছু কট্টর অ্যারিস্টটলবাদী টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে দেখতেও অস্বীকার করেছিলেন, কেননা তাঁরা দৃঢ় নিশ্চিত ছিলেন যে যুক্তি-প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁরা সবেঁব জানেন যে আকাশে কী আছে। হাক্সলে বলেছেন যে, authority, disciples, schools—এরা সব বিজ্ঞানের পক্ষে অভিশাপ, যা বিজ্ঞানগবেষণার আসল প্রাণস্ফূর্তিকেই খর্ব করে দেয়।

সাংস্কৃতিক অন্ধত্ব ও ধারণার মূর্তিপূজা

ফ্রান্সিস বেকনের তত্ত্ব: মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়া তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয় পূর্বলালিত বিশেষ এবং সাধারণ নানান মূর্ত ধারণার দ্বারা, বিশেষত সে যখন কোনো নতুনতর ধারণার মুখোমুখি হয়। সমাজবদ্ধতা এবং সামাজিক ক্রিয়াশীলতার কারণে মানুষের কিছু-কিছু সামাজিক ধ্যানধারণা থাকতে বাধ্য, সেই idea system থেকেই গড়ে ওঠে সামাজিক সংস্কার আর সংস্কৃতি। তার প্রয়োজনীয়তা সামগ্রিকভাবে অনস্বীকার্য। সমস্যা হল, এ-জাতীয় লালিত সংস্কার এক ধরনের অন্ধত্ব আরোপ করে, যদি-না কোনো সংস্কৃতি নিয়ত বিকশিত হতে থাকে। দীর্ঘ চর্চা ও স্থায়িত্ব সংস্কারকে মূর্ত করে তোলে, নতুনতর ধারণা বা বক্তব্য তার তুলনায় মনে হয় বিমূর্ত, তাই গ্রহণীয় নয়। সাংস্কৃতিক অন্ধত্ব যে-কোনো নতুন ধারণা, বক্তব্য বা চেতনার ঐতিহাসিক বাধা।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ধারণার মূর্তিপূজা বা সাংস্কৃতিক অন্ধত্ব একটা গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক কারণ হিসাবে কাজ করেছে বারে-বারে। বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে সেটা আরও বিপজ্জনক বস্তু, কেননা তা আসে তত্ত্বগত এবং প্রয়োগপদ্ধতির প্রতি স্তরে বস্তুমুখী নির্ভুলতায় (material precision) সংলগ্ন থাকার সচেতন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও। বিজ্ঞানীর চেতনায় বিজ্ঞান-উপজাত দু ধরনের সংস্কার কাজ করতে পারে। এক: তত্ত্বগত আর ধারণাজাত (substantive) সংস্কার, দুই: পদ্ধতি-প্রক্রিয়াগত (methodological) সংস্কার। কোপারনিকাস থেকে শুরু করে এই সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসে ধারাবাহিক বাধার কারণ হিসেবে ধারণার মূর্তিপূজার নজির প্রচুর। এবং, তা বিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রেই। লর্ড কেলভিন তাঁর দীর্ঘ, ঘটনাবহুল জীবনের শেষ অবধি বিশ্বাস করতেন যে, পরমাণু অবিভাজ্য হলেও হতে পারে, যখন বিজ্ঞান হাজির হচ্ছে পরমাণুর নয়া তত্ত্ব নিয়ে, যাতে পরমাণু বিভাজ্য। নিউটনের আলোকের কণাতত্ত্বের দাপটে হার্টগেনের তরঙ্গবাদের অস্বীকৃতির ইতিহাস দীর্ঘ। প্রায় একশ বছর। উনিশ শতকে ইংরাজ বিজ্ঞানী টমাস ইয়ুং আর ফরাসি বিজ্ঞানী ফ্রেসনেল, হার্টগেনের তরঙ্গবাদকেই সমর্থন এবং স্বীকৃতির জায়গাটি করে দেন। শুধুই নিউটনের প্রশ্নাতীত বিশেষজ্ঞতার উপর আস্থা নয়, তার সঙ্গে অত্যন্ত জোরদারভাবে মিশে ছিল কণাতত্ত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের সংস্কার।

এমন ঘটনাও বিরল নয় যেখানে এমনধারা পূর্ব-লালিত সংস্কারের ফলে একজন বিজ্ঞানী তাঁর নিজের আবিষ্কারকেই দেখতে পান নি বহুদিন পর্যন্ত, অথচ সে তাঁর চোখের সামনেই ছিল। ড. টমাস এবং ড. কেলনার—আলাদাভাবে দুজনেই দেখেছিলেন যে প্যাপেইন (Papaine) এনজাইম রক্তনালীর মধ্যে দিলে পরে ব্যতিক্রমহীনভাবে খরগোসের কান ঝুলে পড়ে। কিন্তু কেন? দীর্ঘদিন কানের নানা আণু-বীক্ষণিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও তাঁরা কোনো কারণ খুঁজে পান নি। পরে টমাস আণুবীক্ষণিক পরীক্ষাতে দেখতে পেলেন যে, ওই এনজাইম প্রয়োগের ফলে খরগোসের কানের তরুণাস্থি (cartilage) পালটে যায়। এমনই একটি সহজ কারণ দীর্ঘদিন চোখে না পড়ার কারণ—ড. টমাসের ভাষায়—'তরুণাস্থির কথা আমার মাথাতেই আসে নি। আসার কথাও নয়, ওটাকে চমকপ্রদ বলে মনে করা হয় না।' প্রায় একই কথা স্বীকার করেছেন কেলনারও। কেলনার বলেছেন—'আমার নজর ছিল প্রস্থচ্ছেদের পেশীতে, কল্পনাও করতে পারি নি তরুণাস্থির কথা।' এমনি করেই বহু বিজ্ঞানী-সমর্থিত সাধারণ ধারণা বা তত্ত্বের জাড্য বিজ্ঞানীর বস্তুমুখী দর্শনকে আচ্ছন্ন করে, ফলে নতুন পর্যবেক্ষণ তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় বার-বার। এই ঘটনা থেকে আরেকটি সাধারণ বিষয় লক্ষ করার মতন। যেটি, মূলত পেশাগত। টমাস আর কেলনার দুজনেই এই 'খরগোসের কান-রহস্য' নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণায় নিযুক্ত থাকতে পারেন নি, অপেক্ষাকৃত 'বেশি জরুরি আর আকর্ষক' অন্য গবেষণার কারণে।

ধর্ম-বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান-ধর্মের বাদে-প্রতিবাদে আলোচনা আজও চলছে মতবাদিক বিতর্কে। এ আলোচনায় সে বিষয় নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। তবু যে কথাটা বলার থেকেই যায় তা হল এই যে, বিজ্ঞানী-দের ব্যক্তিগত ধর্মীয় ভাবনার ঝোঁক বিজ্ঞানের ইতি-হাসে নানা সময়ে প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করেছে। এমন একটা সময় ছিল যখন বিজ্ঞান-আলোচনায় ঈশ্বর আর ঐশ্বরিকতার ব্যাখ্যা থাকাটা অত্যন্ত জরুরি ছিল, এমনকী বিজ্ঞানীদের কাছেও। বহু রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তার চরিত্র আমূল পালটে গেলেও, এখনও অনেকের কাছেই যে-কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মধ্যে কোনো বিশেষ দর্শনের সূত্রসমর্থন মেলে কিনা, সেটা একটা মস্ত নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। এই সাংস্কৃতিক অন্ধত্ব এক প্রবল পিছুটান—যা গড়ে ওঠে ভাবগত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চেতনার টানা-পোড়েনে বিজ্ঞানীরই অন্দরমহলে।

একটি রত্নগর্ভ উদাহরণ পাওয়া যাবে বের্টোল্ট ব্রেখটের "গ্যালিলেও গ্যালিলে"-তে:

গ্যালিলেও। হ্যাঁ ঠিক তাই। আরো বলতে চাই, এই বিশাল মহাবিশ্ব পৃথিবীর মতো ক্ষুদ্র একটা বস্তুর চারপাশে পাক খেতে পারে না। এটা সকলের বোঝা উচিত।

সাগ্রেডো। তাহলে এই মহাবিশ্বে শুধুই তারা,—ঈশ্বর তাহলে কোথায়?

গ্যালিলেও। কী বলতে চাস?

সাগ্রেডো। ঈশ্বর! ঈশ্বর কোথায়?

গ্যালিলেও। মহাকাশে নেই। তেমনি তাঁকে এই পৃথিবীতেও পাওয়া যাবে না।

রবার্ট চেম্বার্সের Vestiges of Creation, অথবা ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্বকে কেন্দ্র করে সম-সাময়িক এবং পরেও বহু খ্যাত-অখ্যাত বিজ্ঞানীর যে প্রতিবাদী বা বিরোধাত্মক মতামত—তার অনেক-টাই ছিল তাঁদের ব্যাহত, কেন্দ্রচ্যুত ধর্মীয় চেতনার নিরাপত্তাহীনতার অসহায়তাজাত। দার্শনিক গটফ্রিড লিবনিৎজ একই কারণে নিউটনের বিরোধী, কেননা নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণসূত্রে তিনি খুঁজে পান নি Providential Destiny!

সামগ্রিকভাবে, বিজ্ঞানীদের ধারণা এবং চেতনার জাড্য এবং সংস্কার কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ বহুলাংশে নির্ধারিত হয় জড়িয়ে-থাকা বিশেষ স্থান-কালের সমাজ-অর্থনীতি, এবং ধর্মীয়-দার্শনিক ও ভাবগত মূল্যবোধের সামগ্রিক ধাঁচটির এবং এসবের

মধ্যে বিশেষ বিজ্ঞানীটির পরিস্থিতিগত অবস্থান এবং তাঁর চেতনার স্তরের দ্বারা।

প্র ক্রি য়া-প দ্ধ তি এ বং যা ন্ত্রি ক তা

বিজ্ঞান-অনুশীলনের প্রাণবায়ু হল বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতি বা মেথডলজি। যে-কোনো একটি বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছাতে কিছু কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন হয়; অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে সুনির্ধারিত কিছু বিশেষ ও যথাযথ প্রক্রিয়া-পদ্ধতিকেন্দ্রিক চেষ্টার মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। এ যেমন সাধারণভাবে মানুষের বাস্তব ক্রিয়াশীলতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমনি। সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, methodology is a set of established rules based on experience or scientific knowledge; it makes certain demands on the researcher which can be expressed in a system of definite methods, rules and laws। এ থেকে একটা যান্ত্রিক সংস্কার জন্ম নিতে পারে। যে, বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রশ্নে নির্ধারিত পদ্ধতিই মাত্র প্রযোজ্য; একথা সত্যি যে, একটি প্রতিশ্রুতিময় পদ্ধতির সম্ভাবনা অনেক। ফলে, তার আয়ু এবং অবদান আপেক্ষিক অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ হয়। তবু বিজ্ঞানী-মাত্রেই উপলব্ধি করেন, প্রকরণগত পদ্ধতির কোনো-রকমের চূড়ান্ত platonic রূপ বাস্তবে অসম্ভব। বিজ্ঞানীর জ্ঞান-লক্ষ্য ও চাহিদা ক্রমবর্ধমান, তেমনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহও বিবর্তনমুখী।

যেহেতু, পদ্ধতির তুলনায় বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য-চাহিদা-অন্বেষণ, এমনকী আহৃত জ্ঞানের পরিবর্তন-শীলতার হার সাধারণত বেশি, পদ্ধতি-প্রক্রিয়াকেন্দ্রিক স্থিতাবস্থায় প্রায়ই বিজ্ঞানীরা আটকা পড়ে যান। বিশেষত নতুন আবিষ্কারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ভুলে যান—বিজ্ঞান-অন্বীক্ষায় জ্ঞান, লক্ষ্য এবং পদ্ধতির মধ্যেকার সংঘাত-সমন্বয়ের অকৃত্রিম, মহার্ঘ আত্মীয়তা-টুকু অনিবার্যতা!

ইয়ুং এবং ফ্রেসনেলের কাজের ভিত্তিতে হার্টগেনের আলোকের তরঙ্গচরিত্র (১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে) পুনর্জীবিত হবার প্রায় সত্তর বছর পর ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল সূত্র দিলেন তড়িৎচৌম্বক তত্ত্বের। প্রথিতযশা বিজ্ঞানী কেলভিন তা মেনে নিতে পারেন নি। পেশাগত পিছুটান নয়, ধারণার অন্ধত্বের জন্যও নয়, পরিষ্কার পদ্ধতি-প্রক্রিয়াগত প্রশ্নে। একটি দুঃখবহ ইতিহাসের সাক্ষী ইংরাজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী—অ্যাডাম্‌স্। তিনি এবং ফরাসি বিজ্ঞানী লেভরিয়ে গাণিতিক পদ্ধতিতে নেপচুনের অস্তিত্ব একই সময়ে দেখানো সত্ত্বেও, প্রথম আবিষ্কারের মর্যাদা পেলেন—ফরাসি বিজ্ঞানী। কারণ, তাঁর প্রবন্ধটিই ফরাসিতে প্রথম ছাপা হয়। অ্যাডামসের প্রবন্ধটি পরে ছাপা হয়, কেননা সেই সময়ে ইংরাজ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গাণিতিক সমাধানের বিরোধী ছিলেন। আর ফরাসিরা তার বিপরীত। ঘটনাটি দেড়শ বছরেরও কম আগেকার।

ট্র্যা জে ডি র নাম মে ন ডেল—প র্যা প্ত উ দা হ ণ

এই আলোচনায় মূল যে বাধাগুলির কথা বলা হয়েছে, তার সবকটিই খুঁজে পাওয়া যায় মেনডেলের বৈজ্ঞানিক জীবনে। মেনডেলের তত্ত্ব ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এসেছে এবং পরে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে একই সময়ে আলাদা ভাবে তিনজন বিজ্ঞানী তা পুনরাবিষ্কার করেন। মেনডেলের তত্ত্বের বিরুদ্ধে বাধাগুলি যা ছিল তা হল:

এক, তীব্র পেশাগত বাধা। ভন নাগেলি সহ সমসাময়িক অন্যান্য নামকরা জীব- ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী কমবেশি পেশাগত কারণে মেনডেলবিরোধী ছিলেন। একদিকে, তাঁদের খ্যাতি, অন্যদিকে মেনডেলতত্ত্বের (তাঁদের কাছে) দুরূহতা, এমনকী তাঁদের নিজস্ব সূত্রের সীমাবদ্ধতা বেরিয়ে পড়তে পারে—এই সমস্যা, ওইসব বিজ্ঞানীদের কাছে পেশাগত চ্যালেনজ হিসাবে দেখা দিয়েছিল।

দুই, ধারণার অন্ধত্ব। ধর্মীয় ভাবনার বিরুদ্ধচারীই শুধুই নয়; সমসাময়িক ধারণা যে জৈব ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে সামগ্রিকভাবে, মেনডেলের বংশধারা সংক্রান্ত পরীক্ষাভিত্তিক সিদ্ধান্তে তা অগ্রাহ্য হয়েছিল।

তিন, পদ্ধতিগত প্রশ্নে। তখনকার প্রাণি- ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগের নীতিগতভাবে বিরোধী ছিলেন। এই অদ্ভুত গণিতবিরোধী সংস্কার তারপরেও দীর্ঘদিন টিঁকে ছিল। ১৯০১-১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে গলটন আর পিয়ারসন একে ঐতিহাসিক চ্যালেনজ জানান নতুন বিজ্ঞান-পত্রিকা *Biometrika*-র মধ্য দিয়ে। গলটন লিখলেন—এই পত্রিকার মাধ্যমে গণিত ও জীববিজ্ঞান পরস্পরকে উৎসাহ ও অনুদান প্রদান করবে। তাঁর মতে, এ হল নতুন বিজ্ঞান, যা শুধুমাত্র বৃদ্ধ সাধকদের প্রশ্রয়ের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারে না।

তা হ লে কী দাঁ ড়া ল?

শুদ্ধমাত্র বিজ্ঞানচেতনার কোনো মানেই হয় না। আমরা দেখেছি তা তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয় সমাজচেতনার দ্বারা। নিজস্ব পরিপার্শ্ব এবং বিজ্ঞানীর চেতনার মধ্যে ক্রিয়াশীল সংঘাত-সমন্বয় একটি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়। এরই প্রভাবে, কোনো-কোনো বিজ্ঞানী প্রতিক্রিয়ার ধারাকে শক্তিশালী করেন, হয়তো না বুঝেই। ফলে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সাময়িক হলেও বিপন্ন হয় বিজ্ঞান-অন্বেষার প্রাণ-স্ফূর্তি। এরই প্রভাবে আবার অন্যদিকে আরেক দল আপোসহীন বিজ্ঞানী প্রগতির ধারাকে বেগ দেন, হয়ে ওঠেন বিজ্ঞান-অন্বেষার সহায়ক শক্তি। ফলে, বিজ্ঞানীর চেতনার স্তর একটা মস্ত নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। তবুও, তাই সব নয়। তারপরেও কথা আছে।

আজকের প্রগতিবাদী বিজ্ঞানীরা প্রৌঢ়ত্বে এসে কাল বা পরশু প্রতিক্রিয়ার নাটবল্টু বনে যান, অনেক ক্ষেত্রে। কেন এমনটা হয়! Bacon says, *Sciential Inflat* and dignitaries who hold high honors for past accomplishment do not usually like to see the current of progress rush too rapidly out of their reach – কিন্তু কেন? বার্ধক্য জমে জড়ত্ব। তাই, কি ব্যক্তিমানুষ বিজ্ঞানীটি, কি তাঁর আ বষ্কার যখন বিকাশের অনিবার্য নিয়মে বার্ধক্যে উপনীত হয়, সে হয়ে পড়ে অংশত পিছিয়ে-পড়া, নতুনতর প্রশ্ন-লক্ষ্য এবং অন্বেষণের প্রেক্ষাপটে। অন্যদিকে, ইতিমধ্যে সময়ের হাত ধরে ওঁরা স্থিতু হয়েছেন, স্বীকৃতি- ও কর্তৃত্ব-প্রাপ্তি ঘটেছে, হয়তো মতবাদিক ধারাটি মডেল (যা ব্যবহৃত ও মূর্ত) রূপ পেয়েছে। ফলে, সে আঁকড়ে থাকতে চায় জমি। তাঁর কর্তৃত্ব, তাঁর প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনে এমনকী অযথার্থভাবেই সাহায্য করে টিঁকে থাকতে, বা নতুন-তরের আগমনকে বিলম্বিত করতে। সে তখন যথার্থই যৌবনরহিত, প্রতিক্রিয়ার নাটবল্টু!

বিজ্ঞান এবং প্রগতি সমার্থক যাঁদের কাছে—তাঁদের চেতনা ও দায়িত্ববোধ অবশ্যই ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁরা নিরলস শ্রমিক। তাঁরা উপলব্ধি করেন—পুরোনো ধারণা একটা শক্তিশালী জমি দেয়, কিন্তু সে সব দেয় না নতুন মানুষের নতুন প্রশ্নের চাহিদায়। এমনকী, পুরোনো তত্ত্বের গর্ভেই বিকশিত হতে পারে নতুন প্রশ্ন, নতুন ব্যাখ্যা। সেও নতুনকে প্রশ্ন করে, পরীক্ষা করে—কিন্তু তা করে ইতিবাচকভাবে, মুক্তমনে, বলিষ্ঠ-নির্ভীক মুক্তমনে। তাঁর চিন্তা-প্রক্রিয়ায় সজাগ থাকে বিকাশের প্রতি স্তরে পুরোনো এবং নতুনের সংঘাত-সমন্বয়ের অনিবার্য, মহান সম্পর্কের কথা। বার্ধক্য-জড়ত্বজাত নেতি-ভাবনা, বা প্রতিষ্ঠান-কর্তৃত্ব বা খ্যাতির ঢক্কানিনাদ আর দুলদুলুনি তাঁকে বিপথ-গামী করতে পারে না। অভিজ্ঞতা তাঁকে জ্ঞানের গভীরতা দেয়, প্রজ্ঞার আলো দেয়। এবং তা সম্ভব হয় নিরবচ্ছিন্ন ও সচেতন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই।

সমস্ত যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধেই সে সংগ্রাম। এর মধ্যেই সে পায় বিজ্ঞানীর সংজ্ঞার্থ!

এ ক টি শ প থ

> I entrust men to believe that it is not an opinion to be held but a work to be done, and to be well assured that I am not labouring to lay the foundation of any sect or doctrine, but of human utility and power : ফ্রান্সিস বেকন॥

গ্রন্থপঞ্জী

যে-সমস্ত বই থেকে সাহায্য নিয়েছি, তার তালিকা দীর্ঘ। মূলত সেই-সমস্ত বই বা লেখা যা থেকে উদাহরণ বা উদ্ধৃতি নিয়েছি—তারই তালিকা দেওয়া হল :—

১। এম প্লাঙ্ক—সায়েন্‌টিফিক অটোবায়োগ্রাফি, ১৯৪৯
২। জে ডি বারনাল—সায়েন্স ইন হিস্টরি, ১৯৬৯
৩। ডব্লু মর্টন—দ্য লাইফ অব মেনডেল, ১৯৩২ (অনুবাদ)
৪। আর ওপেনহাইমার—দ্য ওপেন মাইনড, ১৯৫৫
৫। কে পিয়ারসন—ফ্রানসিস গলটন, তৃতীয় খণ্ড, ১৯২৪
৬। বি বারবার—সায়েন্স অ্যানড দ্য সোশ্যাল অর্ডার, ১৯৬২
৭। কে মার্কস—কালেকটেড ওয়ার্কস, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৬
৮। সি বিব্বর ই – টি এইচ হাক্সলে : সায়েনটিস্ট, হিউম্যানিস্ট অ্যানড এডুকেটর, ১৯৫৯
৯। আর জে স্ট্রুট—থার্ড ব্যারন র‍্যালে, ১৯২৪
১০। নীহার ভট্টাচার্য—গ্যালিলেও গ্যালিলে (অনুবাদ)

কাঁহা হ্যায় মনজিল

আহমদ-উজ-জামান

রেল-স্টেশনের কাঁচা বাজারের পুবদিকের ছোটো গলির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসে আসগর বাজারের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পৌরসভার রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এই ক-দিন একটানা বৃষ্টিতে বাজারের রাস্তা আর অলিগলিগুলো কাদায় স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে উঠেছে। পা যেখানেই ফেলে সেখান থেকে ভুড়ভুড় শব্দে বিশ্রী কাদা ফেঁপে উঠে। বাঁ হাতে কসাইয়ের দোকান। ইমরান জবাই-করা গোরুর সীনা কেটে দোকানের সামনে ঝুলিয়ে রাখছে। পেছনে তার সহযোগী এবাদ গোশতের অন্যান্য অংশ মুগুরের মতো কাঠের টুকরোর উপর রেখে অনবরতভাবে কুপিয়ে যাচ্ছে। বেওয়ারিশ কুকুরগুলো ফেলে-দেয়া গোশত আর হাড়ের টুকরোর খোঁজে ঘুরঘুর করছে। রাস্তার দক্ষিণ পাশ যা অ্যাদ্দিন খালি ছিল তাতে এরই মধ্যে অনেকগুলো নতুন দোকান তৈরি হয়ে গেছে। চাল-ডাল-তেল মুদির দোকান আর ওষুধের ফার্মাসি। মাঝখানে একটা-দুটো চুল কাটার সেলুন। নাতত্ত খদ্দেরের মাথায় স্প্রের বোতল ধরে পানি ঝরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আসগরকে দেখে হাঁক দিল—আরে দোস্ত, কাঁহা জা রহে…। আসগর তাতে কোনো সাড়া না দিয়ে সাবধানে পা ফেলে এগুতে থাকল। একটু অসাবধান হলেই পায়ের ছেঁড়া চপ্পল একদম খতম হয়ে যাবে। আবার গায়ে-গায়ে এমন ধাক্কা লাগছে যে একটুখানি দাঁড়িয়ে কারো সাথে দুটো কথা বলারও সাধ্যি নেই। নাতত্ত আসগরের ঝুপড়ির পাশের ঝুপড়িতে থাকে। তারা দুজনই বলতে গেলে একই সাথে বড়ো হয়েছে এই শহরে। এখন আর তাদের নিজস্ব বাড়িঘর নেই। এখন বিহারী ক্যাম্পের অধিবাসী। বাঁশের ধাড়া দিয়ে তৈরি খুপরি ক্যাম্প। কোনো-কোনো ঝুপড়ির উপরে ছেঁড়া কাঁথা কিংবা চটের আবরণ। ঘিনঘিনে বস্তি। নারী, পুরুষ আর শিশুতে কিলবিল করছে সারা এলাকা। প্রতিদিনই কোনো না কোনো ঝুপড়ির ভেতরে বাচ্চা জন্মাচ্ছে, প্রতিদিন কোনো না কোনো ক্যাম্পে রুগ্ন জীর্ণ বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধা মারা যাচ্ছে; চারি-

দিকে কাশি আর কাতরানির শব্দ, প্রস্রাব আর মলের দুর্গন্ধ।

আসগরের বয়স এখন তিরিশ পেরিয়ে গেছে। এক বছর হল সে শাদি করেছে। না করে উপায় নেই। বিয়ে করা সুন্নত। তার আব্বা তাকে অনেকবার বলেছেন, এভাবে বিয়ে না করে থাকাটা ভালো নয়। তাঁর কথা শুনে আসগরের মনে হত, বিয়ে সুন্নত নয়—ফরজ। জনম্, রিজেক, মৌত, শাদি—এ সবই রাব্বুল আল আমীনের হাতে। তাই শাদি না করে থাকা ঠিক নয়। আসগরের বিয়েতে মাইক লাগানো হয়েছিল। সেই মাইক দুদিন বেজেছিল একনাগাড়ে। আর ক্যাম্পের যত অপুষ্ট ক্ষুধার্ত শিশু ছিল, তারা আসগরের ঝুপড়ির সামনে ঝাঁকে-ঝাঁকে জুটেছিল খাবারের লোভে। আসগর মেহেদি লাগিয়ে হাত লাল করে, চোগাচাপকান চাপিয়ে দুবাস বৈরাত নিয়ে সৈয়দপুর গেল বিয়ে করতে। বিয়ের দিন আসগরের ক্যাম্পের কাদা আর জনজালে ভরা আশপাশ বিরিয়ানির খুশবয় ভরে গিয়েছিল। আসগরের চাচাজান ভালো বিরিয়ানি পাকাতে পারেন। আল্লাহ যে হালতেই রাখুন না কেন, শাদি আর খতনার অনুষ্ঠান ক্যাম্পেতে ধুমধামের সাথেই হয়। আসগরের বাসর-রাত ঝুপড়ির একপাশে এক খাটিয়ার উপরে সুন্দর ফুলতোলা বিছানার চাদর বিছিয়ে তৈরি করা হল। খুপরির ভেতরে আর বাইরে রঙিন কাগজের নিশান আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। খুপরির অন্য-পাশে তার আব্বা আম্মা আর আরো চারটে ভাইবোন গুটিশুটি মেরে শুয়েছিল। দুটো চারপাই কোনোরকমে ভেতরে আঁটে। আসগরের জন্যে নতুন একটা চারপাই তৈরি করা হয়েছিল। চারটি ভাই-বোনের মধ্যে বড়ো বোনটি বিয়ের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। সর্বক্ষণ একটা ময়লা শালওয়ার আর কামিজ তার পরনে থাকে। দ্বিতীয় পোশাক আর নেই। মুশকিল হয়েছে এখন ছেঁড়া উড়নার মধ্য দিয়ে তার বিকাশোন্মুখ দুটো স্তন উঁকি দেয়। তাই সাইফার হাঁটতে বসতে সব সময় বুকের দিকে দৃষ্টি থাকে। ছেলেদের এ সমস্যা নেই। কোনোরকমে একটা পাজামা কিংবা প্যানট হলেই হল। গা খালিই থাকে।

ইয়াসমীনকে বিয়ে করে এনে আসগর দেখল এভাবে চলে না—রোজগারের একটা স্থায়ী পথ বের করা দরকার। কিন্তু এই ক্যাম্পের জীবনে তো স্থায়ী বলে কিছু নেই। তবে সবাই একটা না একটা জুটিয়ে নিয়েছে। টুকটাক কাজ। টুকিটাকি ব্যবসা। আসগর অ্যাদ্দিন এক ওয়ার্কশপে কাজ করত। এখন সেখান থেকে ছাঁটাই হয়ে গেছে। আবার আর-একটা মোটর কারখানায় ঢুকেছে দৈনিক মজুর হিসেবে, সেখানে ওয়েলডিঙের কাজ করে।

ইয়াসমীনকে বিয়ে করে আনার পর আসগর দোস্তদাস্তদের সাথে খুব একটা দেখা করত না, একটু এড়িয়েই চলত। আসলে তার মধ্যে এক শৈথিল্য আছে। দোস্তদের মতো দিনরাত কাজ করতে তার ইচ্ছে হয় না, এক-এক সময় তার দিল গুম মেরে যায়। ভীষণ কান্না পায় তার। তার আম্মার চেহারা তাকে খুব পীড়া দেয়। আম্মা রোগে সব সময় কাতর, পেটে ভীষণ ব্যথা। দাওয়াই বলতে মসজিদের ইমাম সাহেবের পানিপড়া। তার আব্বা মোহাম্মদ ইদরিস গম্ভীর এক লোক। লম্বা মজবুদ দেহে ভাঙন ধরেছে, যেন বাজ-পড়া বটগাছ, উন্নত কপালের কুঞ্চন আরো গভীর হচ্ছে, ভোর রাতে ফজরের আজানের সাথে মোঃ ইদরিস ঘুম থেকে উঠে অজু করে নামাজ পড়তে যান। ক্যাম্পের পাশের মসজিদে ফজরের আর এশার নামাজ অব্যর্থভাবে আদায় করেন। অন্য বেলার নামাজ যখন যেখানে কাজের ধান্দায় ঘোরেন সেখানেই সারেন। এখন তিনি ফেরিওয়ালার কাজ করেন। এক সময় তিনি রেলের বুকিং ক্লার্ক ছিলেন। আসগর সব সময় নামাজ পড়ে না। তবে শুক্রবারে জুমার নামাজে যায়। মসজিদে গিয়ে সে জানালার পাশে বসে বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী

যেন খোঁজে; ইমাম সাহেব খুতবার আগে পার্থিব জীবনের মোহ আর পরকালের ভীষণ আজাব সম্পর্কে ওয়াজ-নসিহত করেন। আসগরের মনে ইমাম সাহেবের কথা কী রেখাপাত করে বোঝা যায় না, তার পাশে বসা বুড়ো নওশের যাকে দেখলে মনে হয় জোয়ারের পানিতে বালুচরে আটকে পড়া সমুদ্রের এক বিদঘুটে মাছ, সে ইমাম সাহেবের ওয়াজের সময় ঘুমে ঢুলতে থাকে। ক্যাম্পের অন্যান্য নামাজি মুসল্লীগণ বসেই ঝিমায় আর হাড়জিরজিরে বাচ্চাগুলো মসজিদের বারান্দায় জটলা বেঁধে হল্লা করে। করে জামাত শেষ হবে, শিন্নি খাবারের লোভে ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে ক্ষুধার্ত শিশুর দল।

বিয়ের পর বেশ কিছুদিন আসগরের ভালোই কেটেছিল। শাদির মধ্যে একরকম যে সুখ আছে, তা সে বুঝতে পেরেছিল। ইয়াসমীনের দিকে সে তাকিয়ে থাকত। ইয়াসমীনের টিকোলো নাক, চিকন কোমর। টানা-টানা চোখ। কিন্তু বেশিদিন ইয়াস-মীনের দেহের এই সৌন্দর্য আর টেকেনি, অস্বাস্থ্যকর খুপরির ভেতরে এসব কি আর থাকে। আসগর ভাবে এক সময় তার আম্মাও খুব সুন্দরী এক নারী ছিলেন। তার মনে পড়ল আম্মার পিঠ জুড়ে লম্বা চুলের কথা। শৈশবে তাকে কোলে নিয়ে ঘুমপাড়ানি গান গাইতেন—আ যারে নিন্দিয়া মেরে নান্‌কে আঁখো মে···। আর এখন তো তাঁকে দেখলে মনে হবে কবর থেকে উঠে আসা এক কঙ্কাল। ইয়াসমীনও কি এক-দিন···।

আসগর ঘুম থেকে উঠে রেল-স্টেশনে যায়। এখন সেও ফেরি করে নানান জিনিস। মোটর কারখানায় কাজ শেষ হয়ে গেছে। আয়ের স্থির কোনো পথ নেই। যখন যেটা সুবিধে সেটাই সে এখন করে। ফেরি করে-করে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন সে মুস-লিমের চায়ের দোকানে এক ভাঙা বেনচিতে এসে বসে। মুসলিমও ক্যাম্পের লোক, কালো চেহারা, ঘুম-ঘুম দুটো চোখ দেখলে মনে হয়—সারারাত সে কাওয়ালি গেয়ে এসে এইমাত্র দোকান খুলেছে। তবে সে রসিয়ে-রসিয়ে কথাও বলে। মুসলিম খদ্দেরের চায়ের কাপে চা ঢালতে-ঢালতে আসগরের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসে। তার হাসির মধ্যে এক-প্রকার দুষ্টুমি যেন লুকিয়ে থাকে। আসগর সে হাসির অর্থ বুঝতে পারে। ইয়াসমীন যে দেখতে সুন্দর। আসগরের ঘাড়ে থাবা মেরে মুসলিম একদিন বলে-ছিল—মজা ক্যায়সে লাগতে হে ইয়ার। আসগর এসব রঙ্গ-তামাসায় যোগ দিতে পারে না, আবার কাউকে সে নারাজ করতেও চায় না। শুধু মাথা নেড়ে একটু হাসে। মুসলিম গুনগুন করে একটি হিন্দি গান ধরে আসগরের দিকে এক কাপ্ চা এগিয়ে দেয়।

স্টেশনের বড়ো রাস্তার পাশে এখন বিদেশী পুরনো কাপড়ের ব্যবসা জমজমাট। চায়ের দোকান থেকে সে বাজার দেখা যায়। আসগর দেখে—গ্রামের দু-একজন চাষী এসে কাপড়গুলো দেখে, নাড়াচাড়া করে। চাষীদের পরনে ময়লা লুঙ্গি। গায়ে ছেঁড়া কুর্তা। হয়তো দু-একটা পোশাক কিনবে। কিন্তু দাম শুনে তারা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় খেতের ফসল বিক্রি করে যে পয়সা পেয়েছিল তা দিয়ে আর পোশাক কেনা যায় না। এই পুরমো কাপড়ের দাম গেল বারের চাইতে এবারে দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু চাষীর খেতে যে বাঁধাকপি, ফুলকপি, বেগুন লাগানো হয়েছিল সেগুলো তো শেষে পানির দরেই বিক্রি করতে হয়েছে। বাজারে দাম পড়ে গিয়েছিল ভীষণ-ভাবে। তাই খেতের ফসলের দাম নেই, চাষীরা পুরনো কাপড়ও কিনতে পারে না। আসগর ভাবে, এই চাষীদের মতো তো তাদেরও অবস্থা, শুধু ফারাক এই যে আসগরদের কোনো মাটি নেই···।

আসগর ভাবে, এই পুরনো কাপড়ের ব্যবসা করলে কেমন হয়। গ্রামের বাজারে কিংবা এমনি ফেরি করে কাপড় বিক্রি করে পয়সা আয় করা যায়। কিন্তু এককালীনভাবে এতগুলো কাপড় যে কিনবে, সে পয়সাও তো তার নেই। হারাগাছের মানিক মিয়া

পুরনো কাপড়ের বড়ো ব্যবসাদার। এক বছরের মধ্যে ব্যবসা করে তিনি হঠাৎ ফুলেফেঁপে উঠেছেন। তিনি ঢাকা থেকে পুরনো কাপড়ের বিরাট চালান নিয়ে আসেন। আসগর ভাবে, একবার তাঁর কাছে যাবে কিনা। তিনি যদি তাকে কিছু কাপড় দেন। বিক্রি করে পয়সা আদায় করে দেবে। মানিক মিয়া তাকে কাপড় দিতে চাইলেন বটে, কিন্তু একটা শর্ত ছিল। বিরাট কাপড়ের চালান আসবে আবার। আর সেই কাপড়ের চালান নিয়ে যেতে হবে বর্ডারে। হ্যাঁ, সীমান্তের ওপারে যাবে তা। আসগর বিষয়টা বুঝতে পারল। তাদের শিবিরের অনেকে এভাবে সীমান্তের ওপারে চালানের গোপন ব্যবসা করে। সীমান্তের ওপার থেকেও শাড়ি-কাপড় আসে। হিলি সীমান্তে এ ব্যবসার খবর তার জানা আছে। আসগর ভাবল মন্দ কী?—ধরা পড়লেই বা কী! কিছু পয়সা ফেললেই হল। আর মানিক মিয়ার মতো ব্যবসায়ীরা তো সব দিকের ফুটো বন্ধ করার কৌশল জানেন। কিন্তু একটু পরে তার মন আবার অন্য দিকে চলে গেল। সীমান্তের ওপারে···কালোবাজারি তেজারতি ···ধ্যেত শালা ··।

আসগরের আব্বা একজন সাচ্চা লোক। তিনি কোনোরকম ঝামেলায় আর পড়তে চান না। তিনি বলেন, একটা মাছ কবার তাওয়া থেকে আগুনে পড়তে পারে। তাঁর জীবনে মাত্র একবার শান্তি এসেছিল, যখন তিনি এদেশে এসে ডেরা পাতলেন আর সেই সাথে রেলের চাকরিটি পেয়ে গেলেন। সেই ৪৭ সালে দেশবিভাগের কিছু আগে বিহারে এক বীভৎস দাঙ্গা হয়ে গেল। মোঃ ইদরিসের মা-বাবা ভাইবোন সবাই কাতল হয়ে গেলেন সেই দাঙ্গায়। তাঁর চোখে ভেসে ওঠে বিহারের ছোটো এক গ্রাম। এক বৃদ্ধ গমের খেতে কাজ করছেন, ভরাট গমের খেতের উপর দিয়ে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে আর তাঁর গমের গাছগুলোতে ঢেউ লাগছে। তারপর লেগে গেল দাঙ্গা। গমের খেত পুড়ে গেল, বাড়িঘর জ্বলে ছাই হয়ে গেল, গাঁয়ের ইদারাগুলো মানুষের লাশে ভরে উঠল। মোহাম্মদ ইদরিস এসব অপ্রীতিকর ঘটনা আর স্মরণ করতে চান না। পরে সেই রক্ত আর আগুনের দরিয়া পাড়ি দিয়ে এসে একটু আশ্রয় পেয়েছিলেন। তা-ও টুটে গিয়েছে। সবই আল্লাহর মরজি। এমতাবস্থায় আসগর কোনো বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। তার ভেতরে তোলপাড় হয় কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা বেঠিক···।

শীত এসে যাচ্ছে। শহরের লোক এখন লেপ তোশক বানাতে শুরু করবে। মোঃ ইদরিশ হাতে ধুনচি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। এক সময় যে হাত রেলের কাগজে কলম চালাত আর অর্থের হিসেব করত, এখন সেই হাতে ধুনচি বাজে। ধুনচির ধুননে তুলো শীর্ণবিশীর্ণ হয়ে বাতাসে যেমন উড়তে থাকে, মোঃ ইদরিস দেখতে পান তাঁর জীবনের প্রতিটি পল তেমনি তুলোধুনো হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোনো কিছুতে তাঁর আর খেদ নেই; ফরিয়াদ নেই। এ সবই তিনি তকদিরের ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী মরিয়ম বেগম যে ধীরে-ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, সেদিকেও তাঁর আর খেয়াল নেই।

ইয়াসমীন এখন পুরনো হয়ে গেছে। এখন ঝুপড়ির খুপরি থেকে বেরিয়ে আসতে তার আর তেমন লজ্জা হয় না। ভোর রাতে উঠে ঝুপড়ির পাশে টিউবওয়েল থেকে পানি তুলে টাট্টি দেয়া স্থানে গোসল সেরে নিয়ে সে প্রাত্যহিক কাজে লেগে যায়। বাসনপত্তর, হাঁড়িপাতিল নিয়ে ক্যাম্পের মেয়েগুলো টিউবওয়েলের চারদিক ঘিরে জড়ো হয়। বস্তির পুরুষগুলো আঁধার থাকতেই উঠে পড়ে। ঘুমজড়ানো মুখে হাই তুলে-তুলে ঠেলাগাড়ি আর রিকশাগুলো নিয়ে স্টেশনের দিকে রওয়ানা হয়। কেউ যায় ক্যাম্পের ভেতরে বারোয়ারি পায়খানায়। এই পায়খানায় শুধু নামেমাত্র এক আবরণ আছে। কারো লজ্জা-শরম আগের মত আর লাগে না। এক সময় যা ছিল বড়ো লজ্জার বিষয়, এখন আর তা তেমন কিছুই নয়। পাশের ঝুপড়ির

সায়েনা প্রস্রাব করার জন্য যখন শালওয়ারের ফিতে খোলে, তখন মনে হয় সে নির্বিকারভাবেই তা খুলছে। কোনো পুরুষমানুষ তখন সামনে থাকলেও তার কিছু আসে যায় না। শিশুগুলো শিবিরের সামনে বেলগাছের নীচে যে ফাঁকা একটু স্থান রয়েছে, তাতে দল বেঁধে গিয়ে বসে পায়খানা করতে। ক্যাম্পের আবর্জনা আর পায়খানার দুর্গন্ধে ভোরের বাতাস হয়ে ওঠে ভরপুর। এই দুর্গন্ধময় ময়লা আর আবর্জনার মধ্য দিয়ে ক্যাম্পের মুসল্লীরা যান মসজিদে নামাজ পড়তে। ইলেকট্রিশিয়্যান ইব্রাহীমের ডান হাত কাঁধ থেকে নেই, সে ঝুলে-ঝুলে হাঁটে। এই আবর্জনার মধ্য দিয়ে মাথায় ময়লা টুপি পরে আল্লাহর নাম জিকির করে সে মসজিদের দিকে এগুতে থাকে। রেল ড্রাইভার খালেক নওয়াজ খানের দু চোখে ক্যাটারেক্ট। কিছুই সে এখন আর দেখতে পায় না। তার রুগ্ন নাতিটি তাকে ধরে নিয়ে যায় মসজিদের গেট পর্যন্ত। মেকানিক আলী সালেম তার ডেরায় কাশতে থাকে সেই শেষ রাত থেকে। কাশতে-কাশতে সেও এগুতে থাকে মসজিদের দিকে। এক সময় এরা সবাই রেলওয়ের দক্ষ শ্রমিক ছিল। এখন এরা সব পেশাগত জীবিকার পথ হারিয়ে ভাগ্যের উপর সব ছেড়ে দিয়েছে। তবে বাঁচার লড়াই চলছে, তাই এখন এরা ফেরিওয়ালা কিংবা রিকশাওয়ালা। ট্রলিম্যান মোবারকের এক-এক সময় ইচ্ছা হয় রেল লাইনের উপর মাথা পেতে দিতে, কিন্তু মোবারকের বুকে বাঁচার দুর্বার এক ইচ্ছাও আছে, দূর হতে তার কানে রুটি-কাপড়া-মোকামের এক ধ্বনি ভেসে আসে।

ইয়াসমীন উঠে চুলোয় চায়ের কেটলি বসায়। আসগর ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া ভেঙে ইয়াসমীনকে কাছে ডাকে, ইয়াসমীন মাথায় উড়না টেনে এগিয়ে যায় আসগরের দিকে। কী হয়েছে? ইয়াসমীন ভাবে, আসগর গত রাতে দেরি করে ফিরেছে। এখন বোধ হয় মাথা ধরেছে। কাছে গিয়ে বলে—ক্যায়া, শিরমে দরদ? একটু টিপে দেব কি? আসগর ভান করে, দেখায় তেমনি একটা কিছু হয়েছে। ইয়াসমীন কাছে আসতেই আসগর তাকে জাপটে ধরে কাছে টেনে নেয়। ইয়া আল্লাহ, উধার আম্মী হ্যায়। আসগরের সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। সে ইয়াসমীনকে চুমু খেতে থাকে, গতরাতে তার যেন তৃপ্তি হয় নি। ছোড়ো, আম্মী দেখলেঙ্গে। আসগরের মনে হল আজ সকালে তার শরীরে এক নতুন শক্তির জোয়ার এসেছে। সে অনেকক্ষণ ইয়াসমীনকে চুমো খেল। মনে হল চুমোতে এত সুখ আগে সে তা কখনও জানে নি। হঠাৎ ওপাশ থেকে আম্মী কেশে উঠলেন। ছোটো ভাইটি দৌড়ে বাইরে চলে গেল। ইয়াসমীন এলিয়ে পড়া ঘন মলিন চুল সুশৃঙ্খল করে উড়নার কাপড় মাথায় টেনে দিল। কেটলির পানি গরম হয়ে ততক্ষণে টগবগ করে উঠেছে।

বেলা অনেক হয়ে গেছে। বোন সাইফা লকলকিয়ে লম্বা হয়ে উঠেছে, নর্দমার কচুগাছের মতো। দুবেলা দুটো পুরো রুটিও খেতে পায় না, তবু দেহের এই বাড়নকে যেন নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না। সাইফার গায়ে পানি সব সময় পড়ে না। কোথায় গোসল করবে? সবদিক খোলা। ফুটন্ত যৌবনের দেহ দেখতে চারদিকের চোখ ওত পেতে থাকে, আম্মা তাকে তাই খুপরি থেকে বের হতে দেন না। সে এসে বলল, ভাইয়া, আজ বাজার থেকে গম আর কিছু গোশত আনতে হবে। তেলও ফুরিয়ে গেছে। ইয়াসমীনও সায় দিল। হ্যাঁ, ঘরের খাবার সব শেষ হয়ে গেছে। মনে করে সব এনো। আসগর আর-এক আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়ে। মনে যে চাঙ্গাভাব এসেছিল তা এতক্ষণে উবে গেছে। মনে পড়ে মানিক মিয়া বলেছিল কাপড়ের গাঁইট নিয়ে বর্ডারে যেতে। সেখানে পৌঁছে দিলেই হবে। মানিক মিয়ার লোক আছে সেখানে। টাকা পেয়ে যাবে। যাবে কিনা ভাবতে লাগল। এদিকে হাতে একটি পয়সাও নেই। ধরা পড়লে মান ইজ্জত শুধুই যাবে না, এই ঝুপড়ির

সবার মওউতও ঘটে যাবে। বিয়ে করে যে দায়িত্ব নিয়েছে তাতে তার সাহস আরো সংকুচিত হয়ে গেছে। ঝুপড়ি থেকে বের হতেই শুনতে পেল, শাহেদার আসমান-ফাটা কান্না। তাহলে আদিল ইন্তেকাল করেছে নিশ্চয়ই। আদিল অনেকদিন থেকে রোগে ভুগছিল। এই যায়, এই যায় করে এতদিন বেঁচে ছিল। আজ বোধ হয় তাহলে মরে গিয়ে একেবারে বেঁচে গেল। আদিল এক কালে রাজমিস্ত্রি ছিল।

কিন্তু ক-দিন আমরা এভাবে বাঁচব। আজ এতটা বছর থেকে এই ঝুপড়ির জীবন। লাশ, পেশাব আর পুরীষের মধ্যে জিন্দেগি বয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে মৃত্যু ঘটছে, আবার এরই মধ্যে জন্ম হচ্ছে। মানুষের তকদীরের এ কী তাজ্জব ব্যাপার। আসগরের মনে পড়ে, বহু বছর আগে ইকবালের এক কবিতা পড়ে তার আব্বা তাকে বুঝিয়েছিলেন যে, মুমিন কোনো সময় তকদীরের অধীন নয়। মানুষ নিজেই আপন তকদীরের স্রষ্টা। অথচ সেই আব্বা এখন সব-কিছু তকদীরের উপর ছেড়ে দিয়ে নির্বিকার হয়ে গেছেন। আর সেও জীবনের সবশক্তি যেন হারিয়ে ফেলছে, সে কিছুই করতে পারছে না। এখন তার ভীষণ এক ধরনের যন্ত্রণা হচ্ছে। সে বুঝতে পারছে না মানুষ মানুষের উপর গজব ঘটায়, না আল্লাহ ইচ্ছা করে তা ঘটিয়ে দেন। এর থেকে মুক্তি কোন্ দিকে, এর জওয়াব কোথায়? ক্যাম্পের মরা গাছগুলোর ডাল ভেঙে পড়ছিল। একটু জোরে বাতাস এলেই তা ভেঙে পড়ে, আসগর ঝড়ের বেগে ঝুপড়ি থেকে বের হয়। ঠোঁটে একটি বিড়ি ধরায়। ইয়াসমীন বলেছিল—ইয়ে বিলকুল ছোড় দেনা···। কিন্তু পারে না। জীবনের জ্বালা আর হতাশার মধ্যে বিড়ির ধোঁয়া বড়ো সুখকর। আসগর ধোঁয়া-ওঠা রাস্তার পাশ দিয়ে চলতে-চলতে ভাবে সে এমন এক মানুষ যার কোনো মাটি নেই, দেশ নেই, মনজিল নেই। অথচ একদিন এরা সবাই শহর-নির্মাণে যোগ দিয়েছে, রাস্তা তৈরি করেছে, মিলের মেশিন চালিয়েছে, রেলের চাকা ঘুরিয়েছে, ইলেকট্রিকের পোল বসিয়ে তার টাঙিয়েছে। তখন এদের হাতের পেশী ছিল ভীষণ শক্ত। আর এখন!

এরা সবাই আশা করে একদিন তারা পাকিস্তানে যাবে। তারা পাকিস্তানের নাগরিক। হায় আল্লাহ! আসগর তার সামান্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারে এরা কত বড়ো নির্বুদ্ধি মজলুম এক জনগোষ্ঠী। আসগর হাঁটতে গিয়ে এমনভাবে হুঁচোট খেল, আর একটু হলে তীব্র বেগে ছুটে যাওয়া ট্রাকের নীচে চাপা পড়ে যেত। আর চাপা পড়লেই বা কী? তার জীবনের কীই বা আর মূল্য আছে···! অপর দিক থেকে ইসমেত একটা ঠেলাগাড়ি চালাতে-চালাতে তার সামনে এসে দাঁড়াল। তার গা দিয়ে ঘাম ঝরছিল। আসগরকে দেখে গাড়িটি থামিয়ে ইসমেত জিগগেস করল—আসগর মিয়া যে! বহুত দিন হুয়া মুলাকাত না হুই। একটা বিড়ি দাও। আসগর পকেটে হাত দিয়ে দেখল বিড়ি আর নেই। একটিই ছিল। ইসমেতের শরীর রোদে কালো হয়ে গেছে। ইসমেত এক সময় খুব ফরসা ছিল। সে টেলিফোন বিভাগে কাজ করত। সেখানকার শ্রমিক ইউনিয়নের জঙ্গি কর্মী ছিল সে। চাকরি চলে গেলে গম ভাঙার কলে কাজ করত। বউ ছেলেমেয়ে সব কোরবান হয়ে গেছে। এখন সে একলা। আসগর তাকে বলল—তোমার স্বাস্থ্য একদম ভেঙে গেছে। ইসমেত ম্লান হেসে কপালের ঘাম মুছে উত্তর দিল—ঠেলা চালানেওয়ালাকো কব তুম সেহ্‌ত আচ্ছা দেখে হো। আসগর সত্যি বড়ো লজ্জা পেল। এই তকলিফের জীবনে সে এ কী আহাম্মকের মতো কুশলজিজ্ঞাসা করল। আসগর আবার বলল—তুমি পাকিস্তানে যাচ্ছ বলেছিলে। কী হল?—বলেছিলাম ঠিক, কিন্তু পাকিস্তানে না গিয়ে গোরস্থানে যাচ্ছি। আসগর চুপ মেরে গেল। এ কী সে একজনের মনে বার-বার কষ্ট দেয়া শুরু করল। আসগর দেখল,

ইসমেত মাথা আর ঘাড় নীচু করে ঠেলাগাড়িতে গায়ের শক্তি প্রয়োগ করছে। আসগরের চোখে হঠাৎ পানি এসে গেল। ইসমেত সরল ছিমছাম গোছের লোক ছিল। ঢিলেঢালা পায়জামা পরত, গালিব আর ইকবালের কবিতা আওড়াত। এখন ইসমেতের ঢিলেঢালা পায়জামা আর নেই, গা খালি। কোমরে জড়িয়ে আছে জার্ণ নেঙটি। চলতে-চলতে আসগর ভাবে, এ-ও বোধ হয় তকদীর-কা সিয়াসী!

আসগর একদিন তার আব্বাকে বলেছিল—আমরা কি বিহার থেকে না আসলে হত না। তার আব্বার দাড়ি এখন সম্পূর্ণ সাদা-সফেদ। চোখের দৃষ্টিতে ধূসরতা। দড়ি দিয়ে তার উপরে ভাঙা চশমা বাঁধা। তিনি কোন্ দিকে তাকিয়েছিলেন বোঝা যায় না। গুম মেরে ছিলেন। একটু কাশলেন। তারপর বললেন—ইস্‌মে জবাব ম্যায় নেই দে সেকুঙ্গা—বিষণ্ণ পরিবেশ আরো বিষণ্ণতর হয়ে গিয়েছিল। মোঃ ইদরিসের চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল।

আসগর ম্যাট্রিক পাশ করার পর আর পড়ে নি। রাজনীতি কী, সেটা সে খুব ভালোভাবে বোঝে না। তবে দাঙ্গা কী তা সে জানে। উর্দু ইস্কুলে পড়াশুনা করার সময় সে যেসব উর্দু কিতাব পড়েছে তাতে দাঙ্গার অনেক গল্পকাহিনী ছিল। খাজা আহমেদ আব্বাস আর কৃষণ চন্দরের গল্প তার ভালো লাগত। দাঙ্গাকে সে ভয় পায়। দাঙ্গাকে ঘৃণা করে। একবার তার আব্বাকে বলেছিল, আমরা পাকিস্তানের জন্যে যখন হিজরত করলাম, তখন পশ্চিম পাকিস্তানে না গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে কেন এসেছিলাম? মোঃ ইদরিস বলেছিলেন—আল্লাহ জানেন, সে অবস্থায় মানুষের হুঁশবুদ্ধি কি আর ঠিক ছিল? বাঙলা মুলুক কাছে ছিল বলে বোধ হয়···। ব্যাটা, এসব সওয়াল থাক, তোমার কোনো কাজ থাকলে কাজে যাও। এই বলে মোঃ ইদরিস তাঁর ধুনচি খুঁজতে লাগলেন। শীতের আমেজ লেগে গেছে বাইরে।

আসগর ইজ্জতের গমের মিলে এসে বসল। গম ভাঙার মেশিন চলছে। চারদিকে ভুষি ছড়িয়ে আছে আর বাতাসে উড়ছে। ইজ্জতকে দেখলে মনে হয় তার জীবনে কোনো দাঙ্গাই ঘটে নি। তার মুখে সব সময় হাসি লেগে আছে। বয়স তার চল্লিশের উপরে, সে অনুযায়ী তার শরীর সুঠামই আছে। সে নিজেকে বলে—আমি কোরবানীর খাসি। দরকার হলে নিয়ে কোরবানি দিতে পার। আসগরকে দেখে বলে—আরে আসগর মিয়া, এতনা খামুশ কিউ? থুড়ে মুসকারো জি—কই তো ইন্তেকাল নাই কিয়া? আসগরের ভালো লাগে ইজ্জতকে। মুখে সর্বক্ষণ পান পুরে রাখে, এদিক সেদিক পিক ফেলে। বছরে দু ঈদ ছাড়া ইজ্জত বোধ হয় আর গোসল করে না। আসগর ভাবে, এভাবে হলেও মন্দ ছিল না। সময় তো আর কারো জন্যে অপেক্ষায় নেই, আর আমরা কেউই যখন তকদীরের উপর যেতে পারছি না।

হাক্ক গিয়েছিল লোক্যাল ট্রেন ধরে মোগলহাটে। গিয়েছিল পুরনো পোশাক নিয়ে। বিক্রি করে এসেছে। আর নিয়ে এসেছে চটকদার কিছু ইনডিয়ান শাড়ি। হাক্ক শাড়িগুলো এনে দেয় মায়মুনা বেগমকে। মায়মুনা বেগমের কেউ নেই। স্বামী ছেলে মেয়ে সব হারিয়ে সে এখন একা। তার শুকনো পাতার মতো দেহ থেকে সব রসকস উবে গেছে। জীবনধারণের কোনো উপায় নেই। মায়মুনা বেগম গোপনে শাড়িগুলো কাপড়ের ময়লা ঝোলায় পুরে নিয়ে শহরে বের হয়। শহরের বেগম সাহেবরা এগুলো কেনার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন। মায়মুনা বেগমকে পুলিশ একবার ধরেছিল। তবে মায়মুনার চাতুরী সব জানা আছে। রাস্তার পাশের মাজারের পাশে পুলিশকে নিয়ে মায়মুনা চুপিচুপি কী বলে। পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়। এখন মায়মুনার মতো খাদিজা, আমেনা, রায়হানা—এরা সবাই ঝোলায় নিষিদ্ধ কাপড় লুকিয়ে শহরে বিক্রি করে।

মায়মুনার ঘরের সামনে দিয়ে আসগর যাচ্ছিল। আসগর এখন তামাকের ব্যবসা করে। তামাক নিয়ে

সে আজ পাটগ্রাম যাবে। কিছুদিন আগে সে বেশ কিছু তামাক কিনে রেখে দিয়েছিল। দামের ওঠা-নামা দেখে বাজারে ছাড়বে– এই ছিল পরিকল্পনা। এবারে দাম উঠেছে। স্টেশনের পথে মায়মুনার সাথে দেখা। মায়মুনা পুলিশের পকেটে কিছু দিয়ে শহরের বাসায়-বাসায় কাপড় বিক্রি করে। যখন সে সময় পায় তখন পাকিস্তানে যাবার খোঁজ-খবর নেয়। আসগরকে দেখে জিগগেস করল,—আসগর মিয়া, পাকিস্তানে যাবার কী হল, বিদেশ থেকে নাকি আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে?

—এ খবর তোমাকে কে দিল, চাচী?

—আখলাক মিয়ার মেয়ের জামাই পাকিস্তান থেকে আখলাক মিয়াকে এক চিঠিতে জানিয়েছে।

—কী জানিয়েছে?

—সে কি আর আমি এত জানি, শুধু লতিফা বলছিল, একটা চিঠি এসেছে আখলাকের ঘরে, পাকিস্তানে সবার যাওয়ার ইন্তেজাম হচ্ছে।

আসগর মায়মুনাকে কী বলবে খুঁজে পেল না। কেমন করে বোঝাবে যে—চাচী, এই আশা ছাড়ো। যে দেশে একদিন আমাদের বাপদাদা বিহারের ভিটে-মাটি ছেড়ে এসে বাসা বেঁধেছিলেন, তা থেকে ফের হিজরতের দরকার নেই। এখানেও আমরা বিহারী, পাকিস্তানেও আমরা বিহারী। আমরা যতই পাকিস্তানি বলে চিল্লাই না কেন, কেউ আমাদেরকে পাকিস্তানি বলে স্বীকার করবে না। আজ সকালেও সে সংবাদপত্রে দেখেছে করাচীতে কারফিউ লেগে গিয়েছে। গতরাতে রেডিওতেও সে শুনেছে। করাচীতে দাঙ্গা।

আসগর মায়মুনাকে বলল—শোনো চাচী, পাকিস্তানে যাওয়ার ইরাদা থাকলে ঝেড়ে ফেলে দাও, সেখানে কারফিউ লেগে গেছে।

মায়মুনা অবাক হয়ে আসগরের দিকে তাকায়—কারফিউ! ফের কারফিউ লাগ গেয়ি?—হ্যাঁ কারফিউ, মোহাজের বিহারীদের··· । আসগর তার কথা কিভাবে শেষ করবে ভাবতে লাগল। মায়মুনা আর আসগরকে আলাপ করতে দেখে একজন-একজন করে বেশ কজন পুরুষ আর মেয়ে এসে জমা হয়ে গেল। বাচ্চাকাচ্চা-গুলোও এসে হল্লা শুরু করে দিল, যেন শিন্নী বিতরণ করা হবে। মায়মুনা এদেরকে ধমক দিল—এই ইয়াজুজ-মাজুজের দল! চেল্লাও মত, চুপ কর। তারপর আসগরের দিকে তাকিয়ে বলল—এখন কি করা যায়, আমরা তো পাকিস্তান, আমাদেরকে মারবে কেন? তবারক আলী দৈর্ঘ্যে ছ ফুট লম্বা। এখন শরীরে আর আগের তাগদ নেই। পিঠ কুঁজো হয়ে এসেছে, চামড়া ঝুলে গেছে। তার ঝরে যাওয়া চুলের চওড়া মাথা আর বাদামি আর্দ্র চোখ দেখলে লোহার পিঞ্জরাবদ্ধ বুড়ো এক বাঘের কথা মনে করে দেয়, এক সময় সে ব্যাঙ্কের দারওয়ান ছিল। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ তুলে বলল— এই পাকিস্তানের জন্যে সবই তো গেল। সেই '৪৭ সাল থেকে কোরবান হচ্ছে। লেকিন··· । তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মোমতাজ রিজভি সাদা গোঁফে তাও মেরে বলল—ছোড়ো কোরবান কি বাত। এখন দেখছি সবই আমাদের ভুল। কে দেয় জান আর কে লুটে ফায়দা। তখনই বলেছিলাম—একটু ভেবে দেখো, আদমজীই আমার কে, আর পানজাবিই বা আমার কে? ব্যাটা বদমাইশরা চলে গেল যে যার মুলুকে, যার যার বাল-বাচ্চা, মালসামাল নিয়ে, শুধু পড়ে রইলাম আমরা ক্যাম্পে—এই পায়খানার মাঝে।

শায়েস্তা খাঁ লাঠিতে ভর দিয়ে এসে ভিড়ে যোগ দিল। তার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছিল নতুন একটা কিছু শোনার জন্যে সে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু যা শুনল তাতে সে হতাশ হয়ে মাটিতে ধপাস করে বসে পড়ল। ডাল থেকে দমকা হাওয়ায় যেমন পাকা ফল পড়ে যায়। ইফতেকার একটু ঝেঁঝেঁ উঠল রিজভির কথা শুনে। আরে খুব তো উঁচু গলায় কথা বলছ, তখন তুমিই তো পানজাবিদের সাথে এত কানাঘুষা লাগিয়ে দিলে, শালা নিয়াজীর দেয়া ফাটা রাইফেল নিয়ে ঘুরতে লাগলে যেন ঈস্ট পাকিস্তান ক্যা কমাণ্ডার বন গিয়া। ইসমেতও ততক্ষণ ঠেলাগাড়ি চালিয়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, কথাবার্তা শুনতে-শুনতে ঝিমিয়ে পড়ছিল। ইফতেকারের কথায় হঠাৎ যেন তার মনে পড়ল করাচীতে আদমজী, ভাওয়ানী, ইস্পাহানীদের মতো দৌলতওয়ালাদের মধ্যে তো দাঙ্গা লাগল না, দাঙ্গা লেগে গেল বিহারী পাঠানি পুশতুয়ালা গরিব মজদুরদের মধ্যে শ্রমিক মজদুর বাস্তুহারাদের মধ্যেই যত খুনোখুনি। আজিব দুনিয়া! সে ভাবল সে শুধু অ্যাদ্দিন কবিতার খাতিরে কবিতাই পড়েছে—উঠ্‌ঠো মেরী দুনিয়াকে গরিববুঁকো জাগা দো/কাখ-এ উমরাকে দরওদীওয়ার হেলা দো···এসব বাগী সে কিংবা তার মতো এইসব শ্রমিক মজদুর যারা শুনত জীবনে তা প্রয়োগ করতে কখনও শেখে নি কিংবা তাদেরকে শেখানো হয় নি। তাই আজ এই দোজখি হালত। এখন ১লা মে-র 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' ডাকে তাদেরকে আর আহ্বান জানানো হয় না; তারা অন্য লোক অন্য শ্রমিক হয়ে গেছে। ইফতেখারের কথা শুনে রিজভি চুপ মেরে গিয়েছিল; এবারে উঠে চলে গেল। মায়মুনা নাংগা-ভুখা বাচ্চাদেরকে আর-এক ধমক দিল। তারপর নিস্তেজ পায়ে হাঁটতে লাগল।

তবারক আলী আগের দারোয়ানি জীবনের অভ্যাস-মতো উঠে বুকে হাত দিল যেন বুকের কার্টিজ বেল্ট ঠিক আছে কিনা তা দেখল। শায়েস্তা খান সেখানেই বসে রইল। ইফতেখারের মুখ তখনও ফোলা-ফোলা দেখাচ্ছিল।

আসগর দাঙ্গা, রাজনীতি, পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন এসব কথা উঠলে উশখুশ করে, কিছু একটা সে বলতে চায়—যে বলার মধ্যে জবরদ্দ এক বুদ্ধি থাকবে, যার জৌলুসে সবাইকে তাক করে দেবে। কিন্তু চেষ্টা করেও সে যেভাবে কথা বলতে চায় সেভাবে কথার জোগাড় করতে পারে না। বিলকুল না। সব তার মধ্যে গুলিয়ে যায়। নিজের উপর তার খুব রাগ হয়।

সে ধীরে-ধীরে ইসমেতের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ইসমেত তার গাড়িতে হাত লাগাচ্ছিল। আসগরও সেই সাথে ঠেলাগাড়িতে হাত লাগিয়ে ইসমেতের দিকে তাকিয়ে জিগগেস করল—তুমি এখন আর ফয়েজ আহমদের কবিতা পড় না? সাজ্জাদ জাহিরের লেখা?

বাংলাদেশ

বাঙলায় বিদ্যুৎ-ব্যবস্থার বিবর্তন

অমিতাভ রায়

কলকাতা তখন ভারতবর্ষের রাজধানী। আর ভারতবর্ষ তো তখন আজকের বার্মা থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত; এমনকী বর্তমান শ্রীলঙ্কাও তখন ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত। শুধুমাত্র প্রশাসনকেন্দ্র কেন, সেদিনের কলকাতা শহর তো ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি। তবুও বৈভবসমৃদ্ধ রাজধানী কলকাতার রাজপথ আধুনিক সমাজ-সভ্যতার সোনার কাঠি বিদ্যুতের পরশ পেয়ে ঝলমলিয়ে ওঠার বেশ কিছুদিন আগেই শৈলশহর দার্জিলিঙ ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম সর্বজনীন ক্ষেত্রে বিজলী বাতির ঝলক পরখ করার সুযোগ পেয়েছিল।

নভেমবর ১০, ১৮৯৭। ভারতীয় মহাদেশে একটি (বিদ্যুৎ)-উজ্জ্বল দিন। এইদিন দার্জিলিঙ পুরসভার উদ্যোগে সংস্থাপিত "সিদ্রাবঙ জলবিদ্যুৎকেন্দ্র" উৎপাদন শুরু করে। সিদ্রাবঙ জলবিদ্যুৎকেন্দ্রই ভারতবর্ষের প্রথম বাণিজ্যভিত্তিক বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র, এবং কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সর্বসাধারণকে সরবরাহর সুযোগ ছিল।

যাত্রা শুরুর আগে

১৮৫৭। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম অথবা সিপাহি অভ্যুত্থান। ভারতে ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির মূল ঘাঁটি কলকাতা-সহ সমগ্র উত্তর ভারত উত্তাল। দেশের যখন এইরকম টালমাটাল অবস্থা, তখন রাতের কলকাতার রাস্তায় জ্বলে মাত্র ৩১৩টি আলো। এই আলোগুলি ছিল আসলে তেলের বাতি। সুতরাং, সঙ্গত কারণেই এদের প্রদীপ হিসাবে আখ্যায়িত করাটা অসমীচীন নয়। এবং অবশ্যই এই প্রদীপগুলি সাহেবপাড়ার রাস্তায় জ্বলত। অভ্যুত্থানের দাপটে একদিকে দেশে প্রবর্তিত হল ব্রিটিশ-রাজের শাসন; অন্যদিকে কলকাতার পৌর কর্তৃপক্ষ শহরে আলোর ব্যবস্থা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। অতএব ওরিয়েনটাল গ্যাস কোম্পানির সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদিত হল। এই চুক্তি অনুযায়ী ১৮৫৯-এর মধ্যে কলকাতার

রাস্তায় সর্বসাধারণের সুবিধার্থে ৬০০টি গ্যাসবাতি বসানো হল। তেলের আলোর সংখ্যাও বাড়িয়ে ১০০০ করা হল। কলকাতার গ্যাসের আলোর মান নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট ছিল। কারণ, খোদ বিলিতি সাহেবের অভিমত, 'কলকাতার গ্যাসের আলো লনডনের তুলনায় ভালো না হলেও নিশ্চিতভাবে সমপর্যায়ের।'

১৮৭৯। ২৮শে জুলাই মি. ফ্লুরি নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক কলকাতায় এক জনসমাবেশে তখনকার দিনের আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে দেখালেন। তাঁর কাজের ধারাটি ছিল অত্যন্ত সহজ। একটি ছোট্ট বাষ্পীয় এনজিনের সাহায্যে একটি চাকা ঘুরিয়ে ডায়নামো চালানো হত। কলকাতায় প্রথম মানুষের হাতে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হল। বৈদ্যুতিক আলোর চোখধাঁধানো জ্যোতিতে কলকাতার মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত। সবারই বাসনা—কলকাতার রাস্তায় বিজলি বাতি জ্বলুক। কিন্তু খরচের যা বহর! সবাই ভাবলেন—রাজাবাদশার প্রাসাদ ছাড়া অন্য কোথাও বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানো চলবে না। সুতরাং রাস্তাঘাট সহ সাধারণ মানুষের বাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের চিন্তা কল্পনায় পর্যবসিত হল। ইতিমধ্যে ১৮৮২ সালে ইংল্যানডে বিদ্যুৎব্যবস্থার প্রচলন হওয়ার পর থেকে এদেশে বাসিন্দা ইংরেজদের মধ্যে বিদ্যুৎ ব্যবহারের একটা প্রবণতা দেখা দেয়। দেশীয় বিত্তবান অভিজাতবৃন্দ স্বাভাবিকভাবেই এই প্রবণতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন। কিন্তু তখনও এদেশে বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায়, এবং বাষ্পীয়-এনজিন-চালিত ডায়নামো দ্বারা উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায়, বিত্তবানদেরও কেবলমাত্র উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষেই ডায়নামো-উৎপাদিত বৈদ্যুতিক আলোয় গৃহসজ্জা করে সন্তুষ্ট থাকতে হত। নিত্যদিন বিদ্যুৎ-ব্যবহার তাঁদের পক্ষেও সাধ্যাতীত ছিল। আজকাল যেমন ডিজেলচালিত জেনারেটর ভাড়ায় পাওয়া যায়, সেদিন তেমনি বাষ্পীয়-এনজিন-চালিত ডায়নামো ভাড়ায় পাওয়া যেত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিকানীরের রাজপ্রাসাদ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই পদ্ধতিতেই স্থায়িভাবে আলোকিত করা হয়েছিল। তবে এ সবই ব্যক্তিগত প্রয়োজন-অভিলাষ পূরণের প্রচেষ্টা মাত্র।

আভিজাত্যের আকর্ষণে ডায়নামো-উৎপাদিত মহার্ঘ্য বিদ্যুতের গৃহ-অলঙ্করণ সেযুগে সময়বিশেষে সংবাদশিরোনাম হত। জানুয়ারি ১৭, ১৮৯৭ "দি স্টেট্‌স্‌ম্যান্‌" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। "বেলভিডিয়ারে একটি উজ্জ্বল রাত" শিরোনামে প্রকাশিত এই সংবাদে বলা হল,—'গত বৃহস্পতিবার আলেকজানডার ও লেডি ম্যাকেনজির সৌজন্যে অনুষ্ঠিত বল্‌ উপলক্ষে বেলভিডিয়ারের সংবর্ধনা-কক্ষগুলি যেমনভাবে সাজানো হয়েছিল,—তা অভূতপূর্ব। শুধুমাত্র বলরুমেই পাঁচটি কাটগ্লাসের ঝাড়লনঠন ছিল, যার প্রতিটিতে ছিল বারোটি করে বৈদ্যুতিক বাতি। এগুলি ঘরের মাঝখানে ঝুলছিল, আর দেওয়ালে ছিল আঠারোটি ব্র্যাকেট, যেগুলির প্রতিটিতে ছিল তিনটি করে বৈদ্যুতিক বাতি। লাগোয়া দালানে বৈদ্যুতিক বাতির ব্র্যাকেট ছিল, আর সিঁড়ি ও যাতায়াতের পথে ঝুলছিল কাটগ্লাসের বৈদ্যুতিক বাতি। একই রকমভাবে ভোজন-কক্ষ, শয়ন-কক্ষ সুন্দর কাটগ্লাসের রঙিন বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে সাজানো হয়েছিল।'

এদিকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে ততদিনে ভারতবর্ষে কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেছে। যেমন, কয়লার ব্যবহারের সুবিধার জন্য কলকাতা (হাওড়া) থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইনের পত্তন (১৮৫০); যদিও গাড়ি চলা শুরু হয় আরও কয়েক বছর পর। জনসাধারণের জন্য টেলিগ্রাফ-ব্যবহার প্রবর্তন (১৮৫১)। রিহড়ায় (হুগলি) প্রথম চটকল স্থাপন (১৮৫৪)। ডাকমাশুল সমীকরণ (১৮৫৫)। কলকাতায় ভূগর্ভস্থ নর্দমা নির্মাণ শুরু (১৮৫৯)।

কলকাতা পোর্টকমিশনার্স (ট্রাস্ট) বা বন্দর কর্তৃপক্ষ গঠন (১৮৭০)। কলকাতায় ঘোড়ায়-টানা ট্রামগাড়ির প্রবর্তন (১৮৮০)। কলকাতায় টেলিফোন-ব্যবস্থার প্রবর্তন (১৮৮১)।

সব মিলিয়ে শিল্পবিপ্লবের যাবতীয় সুফলগুলি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে আসতে শুরু করে। আর এই সময়সীমাতেই ইংল্যানডে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন ও বন্টন শুরু হয়ে যাওয়ায় ইংল্যানডের শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ ভারতবর্ষেও বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠে। সুতরাং ১৮৮০-র দশকের শেষভাগেই অনুভূত হচ্ছিল —আর বেশি দেরি নেই ; কলকাতায় বিদ্যুতের যুগ আসছে।

গোড়ার কথা

শিলিগুড়ি থেকে হিলকার্ট রোড ধরে দার্জিলিঙ যাওয়ার পথে শহরে ঢোকার একটু আগে মূলরাস্তা থেকে একটি জীপগাড়ি যাওয়ার মতো একটি সরু রাস্তা ব্লুমফিল্ড চা-বাগান পর্যন্ত নেমে গেছে। ব্লুমফিল্ড চা-বাগান থেকে আরও ৩০০ মিটার নীচে বারবুটিয়া ঝুলন্ত সেতু। এই সেতুর অপর পাড়ে সিদ্রাবঙ। জরিপের হিসাবে দার্জিলিং রেল স্টেশন থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে, এবং প্রায় ১১০০ মিটার নীচে সিদ্রাবঙের অবস্থান। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় সিদ্রাবঙ জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হয়। ১০ই নভেমবর ১৮৯৭ অর্থাৎ উদ্বোধনের দিনে সিদ্রাবঙ জলবিদ্যুৎকেন্দ্রর নিহিত উৎপাদনক্ষমতা ছিল ১৩৫ কিলোওয়াট। এখনকার মেগাওয়াট-এ পরিচিত-অভ্যস্ত কান এবং মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা যায়, ০·১৩৫ মেগাওয়াট। বোঝাই যাচ্ছে, ভারতবর্ষের প্রথম বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নিহিত উৎপাদনক্ষমতা ছিল কত সামান্য। তবে ছোটো থেকেই তো বড়ো হওয়ার শুরু। সিদ্রাবঙ জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় জল তিনটি ধারায় আসে। ফুম, বারবুটিয়া এবং কোতোয়ালী নদীর জলব্যবহার করে এই জলবিদ্যুৎকেন্দ্রটি চালানো হয়। সংস্থাপনের সময় সিদ্রাবঙ জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ব্যয় হয়েছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। পরবর্তী কালে ১৯০৫ ও ১৯১০-এ একটি করে ১৩৫ কিলোওয়াট এবং ১৯৩১ ও ১৯৩৫-এ দুটি করে ২০০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ইউনিট এই বিদ্যুৎকেন্দ্রে সংযোজিত হয়। সিদ্রাবঙ জলবিদ্যুৎকেন্দ্র এখনও চালু আছে। এখানে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দার্জিলিঙ শহরে সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে সিদ্রাবঙের নিহিত উৎপাদনক্ষমতা ৮০০ কিলোওয়াট। প্রতিটি ২০০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার চারটি জেনারেটর এখানে কাজ করে। তার মধ্যে প্রথম দুটি (আসিয়া নির্মিত) ১৯৩১-এ, এবং বাকি দুটি (ব্রুশপিবল্‌স্ নির্মিত) ১৯৩৫-এ সংস্থাপিত।

অতঃপর কলকাতা

এপ্রিল ১৭, ১৮৯৯। কলকাতার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। কলকাতায় বিদ্যুৎ-উৎপাদন (বাণিজ্যিক ভিত্তিতে) ও বন্টন-ব্যবস্থার সূত্রপাত হল। বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্রটি ইমামবাগ লেনে অবস্থিত। মধ্য কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের উলটো দিকে ড. বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি গেছে সেটি ধরে একটু এগোলেই ইমামবাগ লেন। ১০০০ কিলোওয়াট বা ১ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার এই তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রটি সেদিনের সর্বাধুনিক কারিগরি কৌশলের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। ক্রম্পটন-এর ডায়নামো, উইলিয়ামস-এর এনজিন আর ব্যাবকক্-উইল্‌কক্স-এর বয়লারে সমৃদ্ধ এই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ৪৫০ আর ২২৫ ভোল্ট ডি. সি. ব্যবস্থায় সরবরাহর আয়োজন করা হয়েছিল। সেদিন মাত্র ১ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহর ব্যবস্থা ছিল। এইভাবেই লনডন ব্যতিরেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শহর তথা তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতাকে

বিদ্যুতায়িত করার সূত্রপাত হল।

কলকাতার প্রথম বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্রের মালিক ছিল 'দি ইনডিয়ান ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড'; '১৮৯৫-এর বেঙ্গল অ্যাক্ট-৯' বা নামান্তরে 'ক্যালকাটা ইলেকট্রিক লাইটিং অ্যাক্ট' অনুযায়ী বহু সংস্থাই কলকাতার জন্য বিদ্যুৎ-উৎপাদন ও বন্টন-ব্যবস্থার দায়িত্ব নেবার জন্য আবেদন করেছিল। অবশেষে ১৮৯৭-এর ৭ই জানুয়ারি লনডন-এর 'ক্রম্পটন অ্যানড কোম্পানি লিমিটেড'-এর ভারতীয় এজেন্ট 'কিলবার্ন অ্যানড কোম্পানি', দি ইনডিয়ান ইলেকট্রিক কোম্পানির নামে কলকাতার জন্য বিদ্যুৎ-উৎপাদন ও সরবরাহর দায়িত্ব পাবার অব্যবহিত পর, ১৪ই জানুয়ারি ১৮৯৭ লনডনে দি ইনডিয়ান ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড পঞ্জীভুক্ত হয়। শুরুর সেদিন কোম্পানির মূলধন ছিল এক হাজার পাউনড। পরবর্তী কালে, ১৮৯৭-এর ফেবরুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর বিশেষ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্থার নাম পরিবর্তিত হয়ে হল,— 'দি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড' (সংক্ষেপে সি. ই. এস. সি)—যা বর্তমানে সি. ই. এস. সি লিমিটেড নামেই পরিচিত।

উল্লিখিত সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, সি. ই. এস. সি-র মূলধন বাড়িয়ে এক লক্ষ পাউনড করা হবে। এই উপলক্ষে, ওই বছরই মে মাসে শেয়ার বিক্রি শুরু হয়। এবং প্রথম দিনেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যের তুলনায় অনেক বেশি শেয়ার বিক্রি হয়ে যায়। সি. ই. এস. সি-র এই শেয়ার বিক্রির ঘটনাকে ভারতীয় মূলধনী বাজারের আধুনিক যুগে প্রবেশ বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

বিদ্যুতের কার্যকারিতা-উপযোগিতা-প্রয়োজনীয়তা জনমানসে প্রচার করার জন্য সি. ই. এস. সি সে যুগে নিয়মিত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন পরিবেশন করত। পুরনো সংবাদপত্রে সেদিনের সেই বিজ্ঞাপন দেখলে এখন বেশ মজা লাগে। 'ইলেকট্রিসিটি আপনার অঙ্গুলিসঙ্কেতের অপেক্ষায় একটি কার্যক্ষম ভৃত্য'; 'ইলেকট্রিকসিটি আপনার জীবনে নূতন স্বত্ব দান করিবে', 'সুখপ্রদ বিজলী এত সস্তা'—এইরকম শ্লোগান-সহযোগে ছবিসহ এইসব বিজ্ঞাপন পরিবেশিত হত।

বিজ্ঞাপন প্রচারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিদ্যুৎ-ব্যবহারের প্রসার ঘটতে থাকল। বর্ধিত চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে এবং বিদ্যুৎকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এই শতাব্দীর প্রারম্ভে সি. ই. এস. সি-কে আরও কয়েকটি কেন্দ্র সংস্থাপন করতে হয়। ১৯০২-এর মার্চে আলিপুরে সংস্থাপিত হল ৭৫০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র। ১৯০৬-এর মে মাসে কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে গঙ্গা পেরিয়ে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেল হাওড়ায়; ১৬৫ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হল। মাত্র কয়েক মাস বাদে ১৯০৬-এর সেপটেমবর মাসে উলটোডাঙায় চালু হল সে যুগের সর্ববৃহৎ উৎপাদন-কেন্দ্র ; নিহিত উৎপাদনক্ষমতা ১২০০ কিলোওয়াট বা ১·২ মেগাওয়াট। ইতিমধ্যে কিন্তু বিদ্যুতের চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ বিভিন্ন শিল্প-সংস্থা বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার সুযোগ ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছে। গার্হস্থ্য ক্ষেত্রেও আগ্রহী গ্রাহকের সংখ্যা উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হয়েছে।

১৯১০-এর সেপটেমবর মাসে ভারতীয় বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। ঐ সময় কলকাতার উলটোডাঙায় এ. সি. ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী বিদ্যুৎকেন্দ্র সংস্থাপিত হয়। দেশের বিদ্যুৎ-ব্যবস্থায় এটি একটি ঐতিহাসিক সংযোজন। কিন্তু আরও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কাজ এতদিনে শুরু হয়ে গিয়েছিল।

১৯০৯-এর ডিসেমবর মাসে কলকাতার একটি কেন্দ্রীয় তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র সংস্থাপনের সিদ্ধান্ত সি. ই. এস. সি কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে। বিদ্যুতের চাহিদা, ব্যবহারের ধরন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত এবং

অর্থনৈতিক সমীক্ষার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯১২-র জুলাই মাসে কাশীপুরে সংস্থাপিত ১৫ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রটি উৎপাদন শুরু করার সাথে-সাথে উল্লিখিত সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হল। ওয়েরলিকন কোম্পানির বাষ্পীয় টারবাইন স্টারলিঙ ও ব্যাবকক অ্যানড উইলকক্স কোম্পানির বয়লারে সমৃদ্ধ কাশীপুর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র ৬ হাজার ভোলট চাপে এ. সি বিদ্যুৎ উৎপাদন করত। কিন্তু শহরের বিদ্যুৎব্যবস্থা ছিল ডি. সি.-ভিত্তিক। অতএব বাণিজ্যিক সংস্থায় সরবরাহের জন্য জ্যাক্‌সন্ লেনে ইংরেজদের পরিষেবার জন্য, ওয়েলেসলি স্ট্রীট এবং প্রিন্সেপ স্ট্রীটে ক্রস পিক্‌ল্‌স্ কোম্পানির মোটর কনভার্টার সংস্থাপন করে কাশীপুরে উৎপাদিত এ.সি. ব্যবস্থার বিদ্যুৎপ্রবাহকে ডি.সি-তে রূপান্তরিত করে সরবরাহর ব্যবস্থা করা হল। ডি. সি.-তে রূপান্তর করার যন্ত্র মোটর কনভার্টারগুলি যেখানে বসানো হল, সেগুলির নাম হল সাব-স্টেশন। পরবর্তী কালে উলটোডাঙা, হাওড়া এবং আলিপুরের উৎপাদনকেন্দ্রগুলিও সাব স্টেশন-এ রূপান্তরিত হয়। ইতিমধ্যে ১৯১০-এর দশকে কলকাতার কাছে ব্যারাকপুরে সংস্থাপিত হয়েছে ১ হাজার কিলোওয়াটের চেয়ে কম নিহিত উৎপাদনক্ষমতার একটি ছোট তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র। স্থানীয় প্রয়োজনেই বেসরকারি মালিকানায় এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি সংস্থাপিত হয়েছিল। [সঠিক সংস্থাপনের তারিখ ও নিহিত উৎপাদনক্ষমতার তথ্য উদ্ধার সম্ভব হয় নি।]

১৯০৭-এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কিলবার্ন কোম্পানির দপ্তর থেকে সি. ই. এস. সি-র কাজকর্ম পরিচালিত হত। ১লা জানুয়ারি ১৯০৮—সি. ই. এস. সি-র কলকাতার সদর দপ্তর ৮ ডালহৌসী স্কোয়ারে স্থানান্তরিত হল। পরে আবার এখান থেকে ৬ ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ১৯২০-র দশকে সি. ই. এস. সি. কর্তৃপক্ষ অনুভব করলেন যে ভাড়াকরা বাড়িতে আর চলছে না। সুতরাং প্রয়োজনের তাগিদে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট আর সেনট্রাল অ্যাভেনিউ-র সংযোগস্থলে ছয়তলা সি. ই. এস. সি-র কলকাতার সদর দপ্তর তৈরির জন্য ১৯২৬-এ জায়গা কেনা হল। গড়ে উঠল 'ভিক্টোরিয়া হাউস'। লনডনের হলবর্ন-এ অবস্থিত সি. ই. এস. সি-র সদর দপ্তরও এই একই নামে পরিচিত।

ইতিমধ্যে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার কেন্দ্রভূমি চৌরঙ্গী এলাকায় বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে রাস্তা আলোকিত করার কাজ শেষ হয়েছে। সরকার ও পুরসভাও এ বিষয়ে যথার্থ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯০২-এর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি বিদ্যুৎ-চালিত হয়েছিল।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে সি. ই. এস. সি-র নবনির্মিত 'সাদার্ন জেনারেটিং স্টেশন' বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। ৭·৫ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার দুটি ইউনিট নিয়ে গার্ডেনরীচে অবস্থিত এই বিদ্যুৎকেন্দ্র সংস্থাপিত হয়েছিল। পরে ১৯২৮, ১৯৩১, ১৯৩৪, ১৯৩৭ এবং ১৯৪৬ সালে আরও পাঁচটি ইউনিট সংস্থাপিত হওয়ায় সাদার্ন জেনারেটিং স্টেশনের সামগ্রিক নিহিত উৎপাদনক্ষমতা হয় ১০১ মেগাওয়াট। প্রথম দুটি ৭·৫ মেগাওয়াট-এর ইউনিট-এর নির্মাতা ছিল ইংল্যানডের বি.টি. এইচ টার্বো অলটারনেটারস। পরবর্তী পাঁচটি ইউনিটের (একটি ৭·৫ মেগাওয়াটের এবং বাদবাকি চারটির নিহিত উৎপাদনক্ষমতা ২০ মেগাওয়াট)। টার্বো জেনারেটর তৈরি করেছিল ইংল্যানডের সি. এ. পার্সনস সংস্থা। বর্তমানে এই কেন্দ্রটির উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ। পুরানো কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে গড়ে তোলা হচ্ছে দুটি ৬৭·৫ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ইউনিট সমন্বিত নতুন তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র।

বর্ধিত চাহিদা মেটাতে সি. ই. এস. সি. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর সময় থেকে যুদ্ধকালীন সময়ে ব্যারাকপুর আর নৈহাটির মধ্যবর্তী এলাকা শ্যামনগর রেল স্টেশনের পাশে গঙ্গার ধারে 'মূলাজোড় জেনারেটিঙ স্টেশন সংস্থাপন করে। তিনটি ৩০ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন ইউনিট যথাক্রমে ১৯৩৯, ১৯৪০ ও ১৯৫০-এ সংস্থাপিত হয়। ১৯৫১ ও ১৯৫৫-র অনুরূপ দুটি ইউনিট মূলাজোড় বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্রে সংযোজিত হয়। পাঁচটি ইউনিটের টার্বো-জেনারেটর ইংল্যানডের সি. এ. পার্সনস কর্তৃক নির্মিত।

কলকাতাকেন্দ্রিক শিল্পসংস্থাগুলির একটা বড়ো অংশই হাওড়া শহর এবং তার আশেপাশে অবস্থিত। হুগলি নদী হাওড়া শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে এক বড়ো প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এই সীমাবদ্ধতা দূর করার কাজ শুরু হয়। প্রতিটি ১২-টন-ওজন-বিশিষ্ট দুটি কেবল্ (বিশেষ ধরনের বিদ্যুৎ-পরিবাহী) হুগলি নদীর তলদেশে সংস্থাপিত হয়। কলকাতা-হাওড়া পারাপারের জন্য সাবেক আমলের পন্টন সেতু যেখানে ছিল, ঠিক তার নীচেকার নদীর তলদেশ দিয়ে এই কেব্‌ল দুটি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জাহাজ যাতায়াতে বা নোঙর ফেলা-তোলায় যাতে কেব্‌ল দুটি আঘাত না পায়, সেইজন্যই এই স্থানটি নির্ধারিত হয়েছিল। পরে একই পদ্ধতিতে কাশীপুর থেকে বেলুড় পর্যন্ত হুগলি নদী পেরিয়ে হাওড়া শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তখনও বিদ্যুৎ সরবরাহব্যবস্থা কর্তৃক নদী পেরোনোর সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটে নি।

১৯২৯-এর ১৬ই ডিসেম্বর তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রযুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উদ্বোধন হল। ওই দিন গার্ডেনরীচে অবস্থিত সাদার্ন জেনারেটিঙ স্টেশন থেকে হাওড়ায় বিদ্যুৎ পৌঁছানোর জন্য হুগলি নদীর তলদেশ দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ শুরু হয়। হুগলি নদীর তলদেশের ৯০ ফুট নীচে ৬ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট এবং ৬৯০ গজ দীর্ঘ এই সুড়ঙ্গটি দু বছরের মধ্যে তৈরি হয়। ঢালাই লোহার পাইপকে রিইনফোর্সড-কংক্রীটের সাহায্যে বসিয়ে এই সুড়ঙ্গটি নির্মিত হয়। যদিও নকশা প্রণয়ন এবং কাজ করানোর ক্ষেত্রে ইংরেজদের কৃতিত্ব ছিল, কিন্তু হাতে-কলমে, গায়ে-গতরে খেটে কাজটি সুসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের ভূমিকাও খুব একটা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বিশেষত বর্ষাকালে ৯৯ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা আর ১০০ শতাংশ আর্দ্রতার মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হত। এত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে গার্ডেনরীচ থেকে শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেন পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরিবহণের ব্যবস্থা ১৯৩১-এর সেপটেমবরে সুসম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে বিদ্যুতের ব্যবহার ব্যাপক হারে বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত দশ বছরে ৯১ শতাংশ বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিষয়টি সরকারের নজরে এল। ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি 'বিদ্যুৎ উন্নয়ন কৃত্যক' (ইলেকট্রিসিটি ডেভেলপমেন্ট ডায়রেকটরেট বা ই. ডি. ডি.) নামক সরকারি বিভাগের জন্ম হল। ই.ডি. ডি-র তরফে প্রথম কাজ হিসাবে কলকাতার উত্তরে এক হাজার বর্গমাইল এলাকার বৈদ্যুতীকরণকে বেছে নেওয়া হল। এর জন্য প্রয়োজন হল একশো মাইল দীর্ঘ পরিবহণব্যবস্থা সংস্থাপন।

ই. ডি. ডি. কাজ শুরু করার প্রাক্-মুহূর্তে রাজ্যের ৩৭টি শহরে সি. ই. এস. সি. সহ ২৫টি বেসরকারি বিদ্যুৎ-উৎপাদনকারী সংস্থা সরকারের অনুমতি নিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করত। ই. ডি ডি. ১৯৪৭-এ ব্যারাকপুরের বিদ্যুৎসংস্থাকে অধিগ্রহণ করে। কলকাতা আর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সি. ই. এস. সি-কে উৎপাদনক্ষমতা সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হয়। বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি, দেশবিভাগ, স্বাধীনতা—সব মিলিয়ে হঠাৎ বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে গেল। ১৯৪৯-এ সি. ই. এস. সি-র 'নিউ কাশীপুর জেনারেটিঙ স্টেশন' সংস্থাপিত হল। কলকাতা উত্তর প্রান্তে কাশীপুরে অবস্থিত এই কেন্দ্রে ১৯৪৯ সালে দুটি ৩০ মেগাওয়াট এবং ১৯৫০ আর ১৯৬৩ সালে দুটি ৫০ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন-

ক্ষমতার ইউনিট সংস্থাপিত হয়। নিউ কাশীপুর জেনারেটিঙ স্টেশনের টার্বো-জেনারেটরগুলি যথারীতি ইংলনডের সি. এ. পার্সনস্ কর্তৃক নির্মিত।

পরবর্তী ত্রিশ বছরে সি. ই. এস. সি-র উৎপাদন বাড়ে নি। বরং কমেছে। কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী ৫৬৭ বর্গ মিটার এলাকার বিদ্যুৎ-সরবরাহকারী সি. ই. এস. সি-র ভারতীয়করণ ১৯৭৮-এ হয়েছে। এবং তারপর সি. ই. এস. সি. গড়ে তুলেছে টিটাগড় তাপ-বিদ্যুৎপ্রকল্প।

শহর ছেড়ে, বাইরে দূরে

লোহার খনি, কয়লার খনিকে কেন্দ্র করে রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছিল। কারণ, গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই এই অঞ্চলে কয়লা-লোহা উত্তোলনের কাজ সংগঠিত আকারে শুরু হয়। সুতরাং বিদ্যুতের মাধ্যমে এইসব খনির উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা ছিল। সুতরাং এই চাহিদা মেটানোর তাগিদে ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হল 'দিশের-গড় পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানি।' মূলত খনিগুলিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কাজেই এই সংস্থাটি ব্যস্ত। ১৯২৮-এ প্রথম এই সংস্থার ৩ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র সংস্থাপিত হয়। পরে, ১৯৩৫, ১৯৩৯ এবং ১৯৬৫ সালে এই সংস্থার আরও তিনটি ৫ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ইউনিট সংস্থাপিত হয়। দিশেরগড় পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানির যন্ত্রগুলিও মূলত ইংলনডের সি. এ. পার্সনস-এর তৈরি। এই সংস্থা প্রধানত আসানসোল রানীগঞ্জ অঞ্চলের খনিগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। অনুরূপ একটি সংস্থা 'অ্যাসোসিয়েট পাওয়ার কোম্পানি' ১৯৩০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরাও একই এলাকার অন্য খনিগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এদের প্রথম ইউনিট ১৯৩১-এ (৩ মেগা-ওয়াট), তৃতীয় ইউনিট ১৯৩৩-এ (৩ মেগাওয়াট) এবং চতুর্থ ইউনিট ১৯৪৯-এ (১·৮৭৫ মেগাওয়াট) সংস্থাপিত হয়। উল্লিখিত দুটি সংস্থা ১৯৭৭ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত অ্যানড্রু-ইউল্ সংস্থার পরিচালনাধীন।

সুতরাং ১৯৭৭ থেকে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রায় বিলীন। দিশেরগড় পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানির চারটি ইউনিট যথাক্রমে বর্ধমান জেলার দিশেরগড়, শিবপুর, লুচিপুর ও বানকোলায় অবস্থিত।

১৯৩১, ১৯৩৫ এবং ১৯৪৫-এ দার্জিলিঙ পুরসভার উদ্যোগে যথাক্রমে ২টি ২০০ কিলোওয়াট, তিনটি ২০০ কিলোওয়াট ও ২টি ৪৮০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার জেনারেটর সংস্থাপিত হল। জল ছিল এইসব জেনারেটরের পরিচালিকা শক্তির উৎস। প্রায় একই সময়ে দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চলে আরও তিনটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে উঠে। কার্শিয়াঙ জল-বিদ্যুৎকেন্দ্র ১৯৩৩-এ সংস্থাপিত হয়। ১৯৩৩ সালের সেপটেমবর থেকে নভেমবর মাস পর্যন্ত মাত্র তিন মাস সময়ে কার্শিয়াঙ জলবিদ্যুৎকেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। ২টি ২০০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ইউনিট সেই সময় সংস্থাপিত হয়। ১৯৪৯-এর ৩০শে এপ্রিল আর-একটি ৪০০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ইউনিট সংস্থাপিত হয়। গোয়েঙ্কা অ্যানড কোম্পানির উদ্যোগে নির্মিত জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রটি ১৯৫৩-য় রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করে। ১৯৫৭-য় একটি ৪৪৮ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদন-ক্ষমতার ইউনিট সংযোজিত হয়। কার্শিয়াঙ শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে ফাজি রোডের উপর এই জলবিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণের সামগ্রিক দায়িত্বে ছিলেন নেপালের প্রথম ইনজিনিয়ার শ্রী পি. এম. সুন্দরমাল্লা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য,—শ্রীমাল্লা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইনজিনিয়ারিং স্নাতক ছিলেন। দিলারাম চা-বাগানের কাছে বেলতার নামক জায়গায় রিনচিটন নদীর জলকে ফাজি জল-বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের জন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। ১৯৮৩-তে এখানে আর একটি ৪০০ কিলোওয়াটের ইউনিট সংস্থাপিত হয়েছে। সিংটম

জল-বিদ্যুৎ-কেন্দ্র ১৯৩৫-এ একটি ২০০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ইউনিট সংস্থাপনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে ১৯৪৫-এ আরও ২টি ৪৮০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ইউনিট এই জল-বিদ্যুৎ-কেন্দ্রটিতে সংস্থাপিত হয়। এই জল-বিদ্যুৎ-কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রধানত বিভিন্ন চা-বাগানের চাহিদা মেটাত। অবশিষ্ট বিদ্যুৎ স্থানীয় শহরাঞ্চলে ব্যবহৃত হত।

১৯৪৭-এর আগে পশ্চিম বাঙলার বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রে আর-একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল গৌরীপুর তাপ-বিদ্যুৎ-কেন্দ্র। কলকাতা থেকে সামান্য দূরে নৈহাটির কাছে গঙ্গার ধারে গৌরীপুরে ১৯৩২-এ ১০ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার এই বিদ্যুৎ-কেন্দ্রটি সংস্থাপিত হয়। পরবর্তীতে একটি ৬·২৫০ মেগাওয়াট (১৯৫৪) এবং একটি ১৮·৭৫০ মেগাওয়াট (১৯৫১) নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ইউনিট এখানে সংযোজিত হয়েছে।

পশ্চিম বাঙলার অন্যান্য জল-বিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলি হল যথাক্রমে বীরভূম জেলার মাসাঞ্জোর, জলপাইগুড়ি জেলার জলঢাকা এবং দার্জিলিং জেলার লিটন রঙ্গিত, চিন্‌চিটন এবং বিজনবাড়ি জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প। বীরভূম জেলার মাসাঞ্জোরে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর যে বাঁধ এবং জলাধার আছে সেই জল ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে মাসাঞ্জোর জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর একেকটি ২ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ২টি ইউনিট সংস্থাপনের মাধ্যমে পশ্চিম বাঙলার সরকারের এই জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পটি চালু হয়। পরবর্তী কালে এটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ-এর হাতে হস্তান্তরিত হয়।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

বড়দা ও আমার তরুণকালের স্মৃতি

সুধীর সেন

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা

দিদি এবার আমার কবিতার কথা তুললেন : 'তোমার "মায়ের জাতি" কবিতাটি আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। যেমন সুন্দর ভাব, তেমনি জোরালো ও মর্মস্পর্শী। নারীর দাবি আর অধিকারের কথা অমন-ভাবে কাউকে তো কখনো বলতে শুনি নি। তাদের জন্য অমন দরদ আর অনুভূতি তোমার কী করে হল, বলো তো।'

কথাটা আগে কখনো তলিয়ে দেখি নি। নিজের মনে কোথা থেকে কী করে প্রেরণা আসে, ধীরে-ধীরে দানা বাঁধে আর ক্রমে গভীর বিশ্বাসে পরিণত হয়, তা বিশ্লেষণ করে দেখি নি, করবার কথা মনেও হয় নি। তাই ভেবে-ভেবে দিদির কথার জবাব দিতে হল :

'আমার এই মনোভাবের সূচনা হয় ছোটোবেলায়, সাত-আট বছর বয়সে, যখন আমি মাসির বাড়িতে ছিলাম, গুরুহিত গ্রামে আর সেখান থেকে কসবা স্কুলে পড়তাম। গুরুহিত এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, সোজা লাইন টানলে বড়ো জোর ১৫ মাইল হবে। তখন দেখেছি ছোটো-ছোটো মেয়েদের উপর কী পরিমাণ কাজের চাপ পড়ত। পড়াশুনার সুযোগ তারা সামান্যই পেত। তা ছাড়া ধরেই নেওয়া হত যে মেয়েদের লেখাপড়ার প্রয়োজন নেই। আপনা থেকেই আমার মনে হত এটা অন্যায়। ছেলেমেয়েতে তফাত করাটা আমার একেবারেই পছন্দ হত না। মাসির বাড়িতে অবশ্য সে প্রশ্নটা অবান্তর ছিল। কারণ তাঁদের ছিল পাঁচ মেয়ে, কোনো ছেলে ছিল না—দু মেয়ে আমার চেয়ে বড়ো, একজন সমবয়সী, আর দুজন ছোটো।'

'তারপরে এল এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। মাসির বাড়িতে ও ছোটো গ্রামের অন্যান্য বাড়িতে দেখলাম মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে বারো-তেরো বছর বয়সে। শ্বশুরবাড়িতে যাত্রা করার সময় বহুবার শুনেছি তাদের আকুল কান্না, মা-বাবাকে ছেড়ে তারা কিছুতেই যেতে চাইত না। মা-বাবারাও মনে দুঃখ পেতেন, তা হলেও যেন এক রকম জোর করেই তাদের দূরে ঠেলে দিতেন। সেই বালিকাবধূদের বিদায়বেলার কান্না শুনে আমারো কান্না পেত।'

মাথা তুলে দিদির দিকে তাকালাম। দেখলাম, দিদির চোখ ছলছল করছে। বুঝলাম, অতর্কিতে তাঁর মনে অতীতের করুণ স্মৃতি জাগিয়ে দিয়েছি। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'তারপর?'

'সে সময় আমি শরৎচন্দ্রের ছোটোগল্প কিছু-কিছু পড়েছিলাম। এখনো মনে আছে আমি "মহেশ" পড়ে কেমন বিচলিত হয়েছিলাম। তার কিছুদিন পরই আমার হাতে এল তাঁর "অরক্ষণীয়া"। এ উপন্যাস পড়ার পর আমার চোখ খুলে গেল। এবার বুঝতে পারলাম বালবিবাহের আসল কারণ কী। হঠাৎ যেন ঘরে-ঘরে অরক্ষণীয়াদের দেখতে পেলাম। মনে হল তাদের মৌন হাহাকারে শুধু গুরুহিত গ্রাম নয়, আমাদের সমগ্র সমাজ পরিপূর্ণ। মনে-মনে পণ করলাম, আমি এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব, আমার যতটুকু সাধ্য, তার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলব।'

দিদি তন্ময় হয়ে শুনলেন। তারপর অনেক কিছু এসে সে সংকল্পকে দৃঢ়তর করে দিয়ে গেল, একে-একে দিদিকে তাও বললাম। সেই গ্রামের স্কুলে থাকতেই বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়ি। তাঁর প্রভাব আমার জীবনে অপরিসীম। এই জ্ঞানবীর, দানবীর, কর্মবীর, দয়ালু, সমাজভক্ত, আত্মসম্ভ্রমপূর্ণ সমাজসংস্কারক ও সত্যের উপাসককে তখন থেকেই মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করে এসেছি, তখন থেকেই তিনি হলেন আমার কাছে আদর্শ মহাপুরুষ। তাঁর বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য ধর্মযুদ্ধের কাহিনী পড়ে গর্ব অনুভব করেছি, তাঁর কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছি। বালবিধবার দুঃখ মোচন করতে হলে তাদের পুনর্বিবাহই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে-সঙ্গে চাই বালবিবাহ যথাসাধ্য দূরীকরণ। এ দুয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে, তা সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়।

'তার কিছুকাল পরে পড়ি রবীন্দ্রনাথের "বিদ্যাসাগর চরিত" আর সে প্রসঙ্গে তাঁর করুণা-ময়ীর চরিত্রের অপূর্ব বর্ণনা ও ঈশ্বরচন্দ্রের উপর এই দয়াময়ী মাতার প্রভাব। ফলে আমার সঙ্কল্প আরো দৃঢ়ীভূত হল। রবীন্দ্রনাথের দুটো লাইন বার-বার শুনেছি, নিজের মনেও আউড়িয়েছি :

> সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী
> রেখেছ বাঙালি করে—মানুষ কর নি

'আমরা ভুলে যাই বালিকা বা অশিক্ষিতা মাতার পক্ষে স্নেহমুগ্ধ হওয়া অনিবার্য। সন্তানের "বাঙালিত্ব" ঘুচাতে হলে মাতাকেও বাঙালিসুলভ দৌর্বল্যের হাত থেকে সর্বাগ্রে মুক্তি দিতে হবে, তাকেও শিক্ষিত ও দেহে মনে প্রাণে পরিপুষ্ট হতে হয়ে। আমার কাছে তা কৈশোরেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর সবচেয়ে বড় সত্য হল এই যে মেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশের প্রধানতম অন্তরায় হল তাদের অপরিণত বয়সে পরিণয়।'

দিদির দিকে তাকিয়ে মনে হল, যেন তিনি এক মনে, এমনকী ক্ষুধার্ত হয়ে, আমার অন্তরের কথা শুনছেন আর কী ভাবছেন। আমার মনোভাব আর চিন্তাধারা তাঁর কাছে তখন ঠিক-ঠিক কী ভাষায় প্রকাশ করেছিলাম, এতকাল পরে তার নিখুঁত পুনরাবৃত্তি করা অবশ্য সম্ভব নয়। তবে এ কথা বলতে পারি যে তার সারমর্মে কোনো ব্যতিক্রম হয় নি।

গান্ধিজীর স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা মস্ত বড়ো দিক হল স্ত্রীস্বাধীনতা। তাঁর ডাকে মেয়েরা পরদার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হাজারে-হাজারে, সারা দেশ জুড়ে। দেখে আমারো সেদিন উল্লাসের অন্ত ছিল না। কিন্তু এখানেও গান্ধিজীর অবদান বিরাট হলেও থেকে গেল অসম্পূর্ণ ও একতরফা। তিনি দেশকে জাগালেন, কিন্তু জনশক্তিকে যথোচিত-ভাবে সৃষ্টির কাজে লাগাতে পারলেন না। নারীশক্তির

বেলাও একই কথা খাটে। তিনি সারা দেশকে ঠেলে দিলেন ভক্তির দিকে, নিজে "রঘুপতি রাঘব" মন্ত্র গ্রহণ করলেন রক্ষাকবচের মতো, আর জ্ঞানমার্গ বর্জন করে চললেন প্রায় অস্পৃশ্য বলে। কোনো দেশই যে বিনা শিক্ষায় এগোতে পারে না বা নিজের উন্নতি সাধন করতে পারে না, গান্ধিজী তাঁর অত মাহাত্ম্য ও সত্যাগ্রহ সত্ত্বেও এ সত্য সহজেই ভুলে গেলেন! তিনি নিদ্রিতকে জাগালেন, কিন্তু সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত করতে পারলেন না।

ইতিহাসে নিজের দেশের বিদুষীদের কথা পড়েছিলাম। সে সময় আমেরিকা থেকে লেখা বিবেকানন্দের পত্রাবলীও আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। বিজাতীয় মেমসাহেবদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ততদিনে চাক্ষুষ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার ফলে ইউরোপ ও আমেরিকা নানা দিকে কিভাবে এগিয়ে গেছে তার ইতিবৃত্তও অনেকটা জানা হয়ে গিয়েছিল। ভাবতাম নিজের দেশেই বা তা কেন হবে না। তাই তখন হতেই আমি স্বপ্ন দেখে আসছিলাম যে আমাদের দেশেও একদিন বিদ্বান ও বিদুষীর সৃষ্টি হবে হাজারে-হাজারে, তারাই দেশের সব সমস্যার সমাধানে তৎপর হবে ও দেশকে গড়ে তুলবে নূতন ভাবে আধুনিক যুগের উপযোগী করে।

দিদি একমনে আমার কথা শুনছিলেন ও নানাভাবে সায় দিচ্ছিলেন—কখনো মাথা নেড়ে, কখনো দু-চারটি কথা বলে, তারপরে বললেন, 'তোমার এ স্বপ্ন জীবনে চিরস্থায়ী হোক, দিন-দিন সত্য হয়ে উঠুক, এই কামনা করি।'

হঠাৎ আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললাম, 'জান, দিদি, গুরু আমাকে কী আদেশ দিয়েছিল?' দিদি শুনবার জন্য উদগ্রীব হলেন। গুরু বলেছিল, 'কখনো মেয়েদের মুখের দিকে বা তাদের উপরের দিকে তাকাবে না, সব সময় চোখ রাখবে তাদের পায়ের উপর।' সঙ্গে-সঙ্গে বললাম, 'আমি তাঁর সে কথা কানে তুলি নি।'

দিদি অর্ধচন্দ্রাকারে তাঁর ডান হাত ছুঁড়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন আর একটু রাগের সঙ্গে বললেন, সেই গুরু সাধু নয়। আসল সাধু হলে তুমি! সেজন্যই তো তোমাকে আমি এ নাম দিয়েছি।' দিদি ছিলেন ভাবপরায়ণ, অথচ সংযত ও স্বল্পভাষী। তাই তাঁর মনের ভাব ভাষার চেয়েও বেশি ফুটে উঠত তাঁর চোখেমুখে, তাঁর হাবভাবে।

বেশ কিছুক্ষণ আগেই আমরা বিল পার হয়ে এসে পড়েছিলাম তিস্তা নদীতে। মাঝি তখন লগি রেখে বৈঠে হাতে নিল, তাই দিয়ে নৌকো চালাল। নদীতে স্রোত বিশেষ ছিল না, বিল আর নদী মিশে সব একাকার হয়ে গিয়েছিল, এক বৈঠের জোরেই নৌকোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিছু দূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছিল। দিদি বললেন যে আমরা সে গ্রামে গিয়ে ঘাটে নৌকো লাগাব ও সবাই মিলে ওখানে কিছু খেয়ে নেব। মাঝিরও বিশ্রাম হবে।

ঘাটে গিয়ে নৌকো লাগল। দিদি বাড়ি থেকে পিকনিকের জন্য নানারকম খাবার সঙ্গে করে এনেছিলেন। তাই নিজের হাতে বার করে সবাইকে দিলেন। মাঝি ও ঝি এমন পিকনিকে যোগ দিতে পারায় খুব খুশি হল। খাবার সময় সে অঞ্চলের কিছু-কিছু বর্ণনাও শুনলাম। গ্রামের জীবনযাত্রার সঙ্গে অবশ্য আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তবু নূতন করে কিছু কিছু শুনলাম ও শিখলাম। এই গ্রামে 'স্টেশনে' পৌঁনে এক ঘণ্টার মতো কাটিয়ে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম, এবার সোজা বিরামপুরের দিকে।

শিবদা, ময়নামতী ও মাধাইপুর

বিনাউটিতে দিদিকে আশ্রমজীবনের কথা ফাঁকে-ফাঁকে অনেকখানি বলেছিলাম। তা হলেও কাহিনী সম্পূর্ণ বলা হয় নি। এবার দিদি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার গ্রামের স্বপ্ন অমন সুন্দর ছিল। তুমি তা ছেড়ে কী করে গুরুর আশ্রমে গেলে?'

দিদি জানতেন যে বড়দার বিপ্লব-জীবনের সঙ্গে

কোনো না কোনো আকারে তার যোগ ছিল, কিন্তু কী তা সঠিক জানতেন না। এবার তাঁকে আদ্যোপান্ত সব ঘটনা যথাসম্ভব বিস্তারিত ভাবে বললাম। কাকার বাড়িতে সন্ন্যাসী-সমাগম, এক গুরুর কাছে আমাকে সমর্পণ, শিবদার সঙ্গে আমার ভ্রাতৃত্বও বন্ধুত্ব, আমাদের অধ্যয়নব্রত, চারবন্ধুর তর্কবিতর্ক, আমার ময়নামতীর স্বপ্ন, খুড়িমার আকস্মিক মৃত্যু, কাকার সংসারে ভাঙন, সন্ন্যাসীর সুবর্ণ সুযোগ, শিবদাকে তাঁর কাছে সমর্পণ, শিবদার অন্তর্ধান ও সন্ন্যাস গ্রহণ, আমার বিমূঢ় অবস্থা, সংসারত্যাগ, মারাত্মক অভিমান। আশ্রমের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও তিন উদ্ধারপর্ব ও গৃহপ্রত্যাবর্তনের কথা তাঁকে আগেই বলেছিলাম।

দিদি অবাক্ হয়ে সব শুনলেন। একটু চুপ থেকে তাঁকে বললাম, 'মাধাইপুর থেকে বিদায়ের শেষ দৃশ্য এখনো আমার চোখের সামনে ভাসে। শিবদার সেই গম্ভীর মুখ ও উদাস দৃষ্টি। তাঁকে ফেলে আসতে হল, তাঁর জন্য আমি কিছু করতে পারলাম না, সেটা আমার মস্ত বড়ো দুঃখ। সে দুঃখ এ জীবনে যাবে না।'

দিদি আঁচল দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিলেন। এরপর নিজেরও চোখ মুছলেন। দুজনেই চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

খানিক পরে দিদি বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে এসেছ তাতে যে কত খুশি হয়েছি বলতে পারি নে। তাই তো তোমার সব কথা তোমার মুখে শুনতে পারলাম। তা না হলে হয়তো এ সুযোগ আর পেতাম না।'

একটু থেমে বললেন, 'তোমার সেই গ্রামের ও ময়নামতীর স্বপ্ন আর আদর্শ মস্ত বড়ো জিনিস; বিধাতার দান। সে মহামূল্য দান গুরু চেয়েছিলেন তোমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে, কিন্তু পারেন নি। সেটাও বিধাতারই আশীর্বাদ।'

আবার একটু চুপ করে কী ভাবলেন, তারপর বললেন, 'তোমার সেই "সংসার" কবিতা আমার বড়ো ভালো লেগেছে। আমি মনে-মনে তোমার কাছে ঠিক এ জিনিসই চেয়েছিলাম। সংসার মায়া নয়, সংসারই হল সত্য; তোমার ভাষায় আমাদের "কর্মক্ষেত্র ও তীর্থক্ষেত্র"। মায়া হল আশ্রম, সন্ন্যাস ও সেই সন্ন্যাসী, আর সে মায়ার সঙ্গে জড়িত ছিল অনেকখানি মিথ্যা। তুমি যে সেবাধর্ম ব্রতরূপে গ্রহণ করেছ সে-ই হল আসল ধর্ম, সাধুত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।'

আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন, হয়তো নিজের মনকে শান্ত করার জন্যে। তারপর বললেন, 'তোমার বিধিদত্ত স্বপ্ন ও আদর্শ সত্য হোক, তুমি তাদের সত্য করে তোল তোমার জীবনে আমি মনেপ্রাণে তাই চাই। দিদি দেখবে তোমার জয়যাত্রা গর্বের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে।' বলে আমার মাথায় হাত রাখলেন।

আমি অনেক চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে বললাম, 'দিদি তুমি আমাকে যা দিয়েছ তা অমূল্য, তার কোনো তুলনা নেই। সে দান আজীবন আমার সম্বল হয়ে থাকবে।' বলে তাঁকে প্রণাম করলাম।

বাইরে তাকিয়ে দেখি সূর্য পশ্চিমে অনেকটা হেলে পড়েছে, আকাশও রঙিন হয়ে উঠেছে। অল্প দূরে একটি গ্রাম দেখা যাচ্ছিল, অস্তগামী রবির কিরণে মনে হল তাকে যেন রঙিন সাজে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিদি বললেন, 'এই গ্রামই হল বিরামপুর। আমরা অন্ধকার হবার আগেই ওখানে পৌঁছে যাব। মা তোমাকে পেয়ে খুব খুশি হবেন।'

বিরামপুরে

নৌকো ঘাটে লাগার সঙ্গে-সঙ্গেই বৌদির নিজের ও পাশের বাড়ির সব আত্মীয় এসে হাজির হলেন। তাঁরা দিদির আগমনের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসেছিলেন।

মাসিমাকে প্রণাম করলাম। তাঁর সঙ্গে এই আমার প্রথম দেখা, তবে আমাদের কাকিমার সঙ্গে তাঁর চেহারার আদল সহজেই চোখে ধরা পড়ে। আমি আসাতে মাসিমা সত্যি খুব খুশি হলেন, বিশেষ

করে অমন অপ্রত্যাশিতভাবে আর অত ঘণ্টা দিদির সঙ্গে নৌকোয় কাটিয়ে আসাতে। একে-একে আর সবার সঙ্গে পরিচয় হল। তার মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ে দিদির ছোটো ভাই কচিকে। (ভালো নাম—বিনয় বর্ধন)।

কচি ঘুরিয়ে আমাকে সারা বাড়ি দেখাল। মস্ত বড়ো দালান-ওয়ালা বাড়ি অনেকটা জায়গা জুড়ে, পিসির বাড়ির মতোই। গ্রামেও বর্ধনবাড়ির নাম আর প্রতিপত্তি যথেষ্ট আছে বোঝা গেল। প্রত্যেক বছরই এখানেও খুব ঘটা করে দুর্গাপূজা হয়, তারপরে আসে লক্ষ্মীপূজা। দিদির রুটিন ছিল দুর্গাপূজার সময় শ্বশুরবাড়িতে থাকা, আর লক্ষ্মীপূজার সময় বাপের বাড়িতে থেকে কিছুদিন ছুটি ভোগ করে যাওয়া। কচি আমাকে মণ্ডপে নিয়ে গেল, প্রতিমা দেখাল, পরের দিনই পুজো হবে বলল, আর লক্ষ্মীপূর্ণিমা উপলক্ষে পাড়ার ছেলেরা মিলে প্রতিবছরের মতো এবারও একটি নাটক করবে বলল। (মেয়েদের তখনও রঙ্গমঞ্চে ওঠা বারণ ছিল!) এ নাটকের সবচেয়ে বড়ো উদ্যোগী ও নায়িকা ছিল কচি নিজে।

পরদিন সকালে বেশ বেলা হয়ে গেল, অথচ দিদিকে কোথাও দেখতে পেলাম না। মাসিমাকে জিজ্ঞেস করায় বললেন, 'কাল রাত্তিরে ময়নার খুব জ্বর এসেছে, তাই এখন বিছানায় শুয়ে আছে।' আমাকে দিদির কাছে নিয়ে গেলেন। দিদিকে শয্যাশায়ী দেখে একটু অদ্ভুত লাগল। কারণ তাঁকে সবসময়ই দেখেছি কাজ নিয়ে ব্যস্ত, সকাল থেকে অনেকটা রাত পর্যন্ত।

দিদি আমাকে দেখে হাসিমুখে তাঁর পাশে বসতে বসলেন। তাঁর কপালে হাত দিয়ে মনে হল অন্তত ১০৪ ডিগ্রী জ্বর হবে। মাসিমাও তাই বললেন। খানিকটা হাসিচ্ছলে তাঁকে বললাম, 'মনে হচ্ছে আমার জ্বর সারিয়ে দিয়ে সেটা তুমি নিজেই নিয়ে নিলে।' দিদি হেসে বললেন, 'শীগগীরই জ্বর চলে যাবে।' কিছুক্ষণ তাঁর কাছে বসে বললাম, 'তুমি এখন বিশ্রাম করো, আমি পরে আবার আসব।'

তারপরে নিজের ঘরে গেলাম। নৌকোডুবির পরের দিন একটা কবিতা লেখা আরম্ভ করেছিলাম। এবার বসে সেটা শেষ করলাম ও দিদির জন্য একটা পরিষ্কার কপি তৈরি করলাম। তার নাম দিয়েছিলাম "কর্তব্য" এবং তাতে ছিল—

কেন এ জীবন, কে জানে কিসের তরে—!
বিপদের পরে বিপদে পড়িয়া কেন যে যাই নি মরে!

* * *

না সহিতে পারি অন্তরজ্বালা করেছি কভু
মরণেরে আহ্বান!
মরণের ডাকে উঠেছি সভয়ে শিহরি তবু,
আকুল হয়েছে প্রাণ!
চাহিয়া চাহি নি যাইতে শমন-ঘরে!
কেন এ জীবন না জানি কিসের তরে!

* * *

সেই বেগ আছে, সেই বল আছে,
শুধু ফিরিয়াছে গতি।
সেই বলিষ্ঠ প্রাণ আছে আজো,
শুধু ফিরিয়াছে মতি।

* * *

বুঝেছি এবার কেন এ জীবন,
বুঝেছি কিসের তরে—
অগণিত কাজ সাধিবার আছে,
সারাটা জীবন ভরে।
চৌদিকে আজি উৎপীড়িতের
ক্রন্দন শোনা যায়।
নিঃস্ব, নিঃসহায়
মনে হয় তারা আমারেই যেন চায়।
আমি যাব ছুটি কর্মসাগরে,
অন্তরে মোর জাগরে, জাগরে—
থেকো না, থেকো না নিমগ্ন নিদ্রায়।

* * *

কবিতার নীচে তারিখ রয়েছে ১৮ই আশ্বিন, ১৩২৯ বাঙলা, লক্ষ্মীপূর্ণিমা, বিরামপুর। আর তার সঙ্গে খাতায় লেখা রয়েছে: '১৫ই আশ্বিন সোমবার

১৩২৯ বাঙলার সন্ধ্যাবেলায় একেলা বিরাট জল-প্লাবিত ক্ষেত্রে জীবনযুদ্ধ, স্মরণীয় দিন বটে!'

লেখা শেষ করে আবার দিদির কাছে গেলাম। তাঁর হাতে কবিতাটি তুলে দিলাম। খুলে কয়েক-লাইন পড়লেন, খুব খুশি হলেন বোঝা গেল। পরে ভালো করে পড়বেন বলে বালিশের নীচে রেখে দিলেন। আবার কিছুক্ষণ তাঁর কাছে বসলাম চুপ করে, অত জ্বরে তাঁর কথা বলা উচিত নয় বলে। তবু কয়েক ঘণ্টা পর-পরই তাঁর কাছে গিয়ে মৌন আলাপে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসতাম।

রাত্তিরে নাটক হল। কচি নায়িকার পার্ট সানন্দে ও সুষ্ঠুভাবে করল। কিন্তু আমার মন পড়ে ছিল দিদির কাছে। তাঁকে ছাড়া আমার কাছে সবই শূন্য বলে মনে হল। প্রতিপদে আসল নায়িকারই অভাব অনুভব করছিলাম।

লক্ষ্মীপূর্ণিমা হয়ে গেল। বাড়ি এবার শান্ত, সবাই অনেকটা ক্লান্ত ও বিষণ্ণ দিদির এই আকস্মিক অসুখের জন্য। আরো একটা দিন ওখানে কাটালাম, কয়েক-বার দিদির কাছে গিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। তাঁর জ্বর ছাড়ার কোনো লক্ষণ নেই। এবার ডাক্তারও যেন একটু ভাবিত হয়ে উঠলেন।

এদিকে আমার ছুটিও ফুরিয়ে আসছিল। তাই কুমিল্লা ফেরার ব্যবস্থা হল। দিদির কাছে গেলাম বিদায় নিতে। তাঁর কপালে হাত দিয়ে বুঝলাম জ্বর একই ভাবে চলেছে, ছাড়বার কোনো লক্ষণ নেই, ওঠানাবাও নেই। তবু তাঁকে বললাম, 'আমার তো এখন যাবার সময় হয়েছে। তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো, দিদি।' দিদি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, একটু হাসবার চেষ্টা করে ক্ষীণ-স্বরে বললেন, 'সেরে উঠব, তুমি ভেবো না। নিজে ভালো থেকো।' তাঁর শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বহুকষ্টে শুকনো চোখে বিদায় নিলাম।

মাসিমাকে প্রণাম করলাম। কয়েকদিন তাঁদের কাছে থেকে গেলাম বলে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে আমি দিদির বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলাম আর তাঁর প্রতি আমারো একটা গভীর আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল।

সবাই ঘাটে এসে আমাকে নৌকোয় তুলে দিল। কচিকে বললাম, শীগগীরই আবার কুমিল্লায় দেখা হবে। সবাই হাত নেড়ে আমাকে বিদায় দিল। নৌকো চলল আবার সেই বিলের উপর দিয়ে, তবে অন্য দিকে, আর যাত্রী এবার আমি একা।

নৌকো ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ল। রুমালে মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। যখন মুখ তুলে বাইরের দিকে তাকালাম তখন দেখি বিরামপুর অনেক দূরে চলে গেছে, প্রায় দৃষ্টির নাগালের বাইরে; আশ্বিনের নীল আকাশের নীচে বিলের হালকা গেরুয়া জলের উপর সূর্যের আলো ঝলমল করছে; আর তার উপর দিয়ে নৌকো চলেছে, মন্থর গতিতে, হেলেদুলে, মাঝির একঘেয়ে লগি ফেলার সঙ্গে তাল রেখে। সেই অর্ধস্ফুট কলধ্বনির সঙ্গে সেদিন যেন মিশ্রিত ছিল এক অব্যক্ত ক্রন্দন।

আমার ছুটি শেষ হল। মাত্র তিন সপ্তাহ বাইরে ছিলাম। অথচ বার-বার মনে হতে লাগল যেন এক সুদীর্ঘ তীর্থযাত্রা সাঙ্গ করে বিশুদ্ধ চিত্তে ঘরে ফিরে যাচ্ছি।

দিদির দান

আশ্রম থেকে ফিরে এসে কুমিল্লায় স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু মনের অবস্থা যেন কিছুতেই স্বাভাবিক হচ্ছিল না। সেই সুদীর্ঘ আত্ম-নির্যাতনের বেদনা ভুলবার বহু চেষ্টা করেও ভুলতে পারি নি। পদে-পদে মনে হত সে বেদনা যেন মর্ম-স্থলে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে একটা জমাট-বাধা বিস্ফোটকের মতো। নানাভাবে তার প্রতিকারের চেষ্টা করেছি—তার উপর কাজের ভার চাপিয়ে, ছন্দ ও সাহিত্যের মাদকত্ব দিয়ে, কখনো বা তার উপর

গীতাঞ্জলির প্রলেপ দিয়ে। তাতে সেই নিগূঢ় যাতনার সাময়িক উপশম হয়েছে মাত্র, স্থায়ী ফল হয় নি।

সেই অশান্ত ও অব্যবস্থিত অবস্থায় দৈবাৎ গিয়ে হাজির হলাম পিসির বাড়িতে। সেখানে দিদির মতো ব্যাকুল শ্রোতা পেয়ে প্রাণ ঢেলে সব কথা তাঁকে অবারিত স্রোতে বলে গেলাম। দিদির অলৌকিক স্নেহস্পর্শে কয়েক দিনের মধ্যেই সেই দুরন্ত বিস্ফোটক বিগলিত হয়ে বিলীন হয়ে গেল।

গুরুর প্ররোচনায় দিনের পর দিন নিজের আত্ম-বিশ্বাসের উপর নির্মমভাবে কুড়ুল মেরে চলেছিলাম তাকে নির্মূল করতে হবে মনে করে। কিন্তু তা এতই দৃঢ়বদ্ধমূল ছিল যে তাকে সম্পূর্ণ উৎপাটিত করতে পারি নি। তবু সেই নিষ্ঠুর প্রচেষ্টা আমার অন্তরে কী পরিমাণ ক্ষত ও ক্ষতির সৃষ্টি করেছিল তা অকল্পনীয়। দিদি এতে যেন এক সঞ্জীবনী সুধা ঢেলে আমার সেই ম্রিয়মাণ আত্মপ্রত্যয়কে পুনরুজ্জীবিত করে তাকে বলিষ্ঠ করে দিলেন।

গুরুর আদেশে একদিন আমি শৈশব ও কৈশোরের স্বতঃস্ফূর্ত স্বপ্ন আর আদর্শ বিসর্জন দেবার জন্য উদ্যত হয়ে উঠেছিলাম আর সেই ধ্বংসের পথে অনেকদূর এগিয়েছিলাম। দিদি এসে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে সে স্বপ্ন আর আদর্শ বহুমূল্যবান, বিধাতার দান, ও তাকেই আমার জীবনের ধ্রুবতারা করে দিয়ে গেলেন।

আশ্রমের মরুভূমিতে আমি নিজেকে প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলাম। দিদি আমার সেই ধূলিধূসরিত সত্তাকে কুড়িয়ে তুলে তাকে স্নেহসুধা আর অশ্রুগঙ্গা-জলে পবিত্র ও নির্মল করে আবার আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। দিদির কাছে আমি লাভ করেছিলাম সত্যিকারের দ্বিজত্ব। তাঁর সে দান আমি ভুলব কী করে?

নূতন আলোক

হঠাৎ যেন স্বপ্ন থেকে জাগলাম। বাইরের দিকে তাকালাম। তখনো দৃশ্য একই রকম। শুধু দূরে তিন-চারটে গ্রাম দেখা যাচ্ছিল। মাঝিকে জিজ্ঞেস করলাম, আখাউড়ার আর কত বাকি। বলল যে খুব দূরে নয়, আর এক ঘণ্টাও লাগবে না। তখন কাগজ কলম নিয়ে লেখায় মন দিলাম। সে কবিতায় ছিল —

ভালোবাসা, তুমি জীবনে আমার
নূতন আলোক জ্বেলেছ।
শত বন্ধনে এবার আমায়
সংসার সাথে বেঁধেছ।

নৌকো এসে আখাউড়া স্টেশনের ঘাটে পৌঁছল। মাঝি মাল নিয়ে আমার সঙ্গে ওয়েটিঙ রুমে এল। তখনো গাড়ি আসার বেশ কিছু বাকি ছিল। তাই ওখানে বসেই আমার কবিতা শেষ করলাম। এ লেখা একান্তই নিজের জন্য। তা ছাড়া দিদি অসুস্থ, তাই তাঁকে আর নূতন লেখা দিয়ে বিব্রত করতে চাই নি।

কিছুক্ষণ পরে ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল। মাঝি বাড়ির নির্দেশমত আমাকে গাড়িতে তুলে ঠিক-মতো বসিয়ে দিল। তাকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম তার সুন্দর ব্যবহার ও সাহায্যের জন্য। এবার গাড়ি ছাড়ার উপক্রম হল। মাঝিও হাতজোড় করে নমস্কার করে বিদায় নিল।

স্বর্গস্য দ্বারম্

সাধুদের মুখে যত কথা শুনেছিলাম তার মধ্যে আমার সবচেয়ে অপছন্দ ছিল, "নারী নরকস্য দ্বারম্"। কথাটা সংস্কৃত, কাজেই এ কুসংস্কার বা কুকথা যে প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই তরুণ বয়সেও একথার মধ্যে আমি কোনো পৌরুষ বা সাধুত্বের লক্ষণ খুঁজে পাই নি, বরঞ্চ মনে হয়েছে তাতে আছে মনুষ্যত্বের অভাব, অসত্য ও অধর্ম। প্রতিবাদ করার সাহস আমার ছিল না, তাই চুপ করে থাকতে হয়েছিল। তবে কথাটাকে কোনোদিনই আমল দিই নি, মনে হত যেন তা শুনেও শুনিনি।

সাধুদের এ ভুল যে কত প্রচণ্ড এবার তো তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম নূতন করে অল্প কয়েকদিনের ছুটিতে। যে দেবীতুল্য নারী এসে দুহাতে ব্যাকুল আগ্রহে আমার স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে গেলেন তাঁর উদ্দেশে আবার আমার মাথা নত করলাম।

ট্রেনের গতি অনেক মন্দা হয়ে এল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি গুরুহিত গ্রামের পাশ দিয়ে চলেছি। তার খানিক পরেই এল কমলাসাগর, কসবা শহরের স্টেশন যেখানে গাড়ি ধরে কয়েক বছর আগে বহুবার কুমিল্লা যাতায়াত করেছি। মনে হল গুরুহিতে মাসির বাড়িতে আমি তো মেয়েদের সঙ্গেই খেলাধুলো করেছিলাম। মাসি ও বোনদের কাছ থেকে কত আদর-যত্ন পেয়েছিলাম। আমি কি তাদের হেয় মনে করতে পারি? আমি যে তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

আবার ট্রেন চলল। আমারো চিন্তাধারা চলল একই লাইনে। রবীন্দ্রনাথের "পতিতা" ধিক্কারসহ বলেছিল:

দেবতারে মোর কেহ তো চাহে নি,
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা
দূর দুর্গম মনোবনবাসে
পাঠাইল তারে করিয়া হেলা।

সাধুরাও সেই "মাটির ঢেলা"ই দেখতে পেতেন, "দেবতারে" নয়। আমার গুরুও ছিলেন সে অপরাধে গুরুতর অপরাধী।

তবু সন্ন্যাসীর দৃষ্টি ও আচরণ যে অন্য স্তরের হতে পারে তা অস্বীকার করব কেমন করে? তার জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, আর তা ফুটে উঠেছে একটিমাত্র প্রাণস্পর্শী কথায়:

আজি রজনীতে হয়েছে সময়
এসেছি, বাসবদত্তা।

সেই আসল সন্ন্যাসী পথিভ্রষ্ট, রুগ্ন, পরিত্যক্ত নারীর মধ্যেও দেখতে পেয়েছিলেন শুধু তাঁর অন্তর্নিহিত দেবতাকে।

স্বর্গ ও নরক বহুকাল থেকে আমার কাছে নিছক কল্পনামাত্র। তাদের অস্তিত্ব মানি শুধু দুই ক্ষেত্রে— মানুষের মানসিক জগতে আর ভাষার অলংকারশাস্ত্রে। তাই আলংকারিকভাবে বলতে পারি আমার কাছে নারী হল "স্বর্গস্য দ্বারম্"। মাতৃ, ভগ্নী, ভার্য্যা, কন্যা ও বন্ধুরূপে কত রমণী বিচিত্র সম্পদে আমার জীবনকে সমৃদ্ধ ও রমণীয় করেছে তা ভাবলে আমি অবাক হই। তাদের কাছে আমার ঋণ অপরিসীম। তাদের এ মহামূল্য দান ছাড়া আমার জীবন নরকতুল্য না হোক, মরুতুল্য হত সন্দেহ নেই।

শেষ কাজ

কুমিল্লায় ফিরে এসে আবার সেই বাঁধাধরা দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আরম্ভ করলাম—স্কুলের লেখাপড়া, বড়দার সঙ্গে আলোচনা, কিছু-কিছু সংসারের কাজ। আমার সেই পুরনো আশ্রমজাত বিস্ফোটক ইতিমধ্যে নিঃশেষে অন্তর্ধান করেছিল। এবার তার স্থান এসে দখল করল দিদির জন্য দুশ্চিন্তা।

কচিও সে সময় কুমিল্লা এল। আমরা পড়তাম একই শ্রেণীতে, তবে—দুই স্কুলে। কচি থাকত আমাদের বাড়ি থেকে দশ-বারো মিনিটের পথ দূরে। প্রায় রোজই তার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম দিদির সংবাদ নেবার জন্য। ক্রমাগত শুনে যাচ্ছিলাম যে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি, তার মানে অবস্থা খারাপের দিকেই চলছিল। সেদিন ৫ই অগ্রহায়ণ, কচি এসে খবর দিল, দিদির অবস্থা খুব খারাপ, ডাক্তার হাল ছেড়ে দিয়েছে, যে-কোনো সময় বিদায় নিতে পারেন।

এ আশঙ্কা কিছুদিন থেকেই মনে আনাগোনা করছিল। তবু আশা ছাড়ি নি। কচির কথা একটা তীরের মতো গিয়ে মনকে বিদ্ধ করল। ঘরে গিয়ে নিরালায় মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। তারপর কাগজ কলম নিয়ে অন্তরের বেদনা ঢেলে দিলাম এক সুদীর্ঘ বল্গাহীন কবিতায়:

সত্যি কি তবে চলে যাবে চিরতরে?

"সাধু" বলে আর ডাকিবে না কভু মোরে ?
না না, দিদি, তুমি যেয়ো না, যেয়ো না···

বিধাতা আমার সে আকুল মিনতি মানলেন না। পাঁচ দিন পরে খবর এল দিদি চিরবিদায় নিয়েছেন। মৃত্যুদিন : ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ সন, রবিবার বিকেলবেলা।

একদিন আশ্রমে আমি অনেক কচাগাছ পুঁতেছিলাম। দিদি যেন আমাকে সেই আশ্রম থেকে তুলে এনে অশ্রুজলে অভিষিক্ত করে সযত্নে সংসারে পুঁতে দিয়ে গেলেন, আর তার উর্বর পরিবেষ্টনে নানা রঙের কিছু স্বপ্নের বীজ ছড়িয়ে দিলেন। বার বার মনে হল, এই যেন ছিল তাঁর জীবনের শেষ কাজ। সে কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হল, আর সঙ্গে-সঙ্গে তিনিও বিদায় নিয়ে চলে গেলেন পরলোকে।

দিদি আমাকে এক বেদনা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তারপরেই দিয়ে গেলেন আরেক বেদনা। তাঁর দুই দানই আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

মৃত্যুর মাধুরী

দিদির আকস্মিক মৃত্যুতে আমি কত বড়ো আঘাত পেয়েছিলাম বাড়ির কেউ তা বুঝতে পারে নি। সন্ন্যাসধর্মে আর যাই হোক, তা আমার সংযমকে দৃঢ়ীভূত করে দিয়েছিল। তাই অন্তরে যে ঝড় বইছিল বাইরে তা প্রকাশ পায় নি। সেদিন রবীন্দ্রনাথের লেখা লাইনগুলো আমার কাছে আরো সত্য হয়ে উঠল :

তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।
চিরবিদায়ের আভা দিয়া
রাঙায়ে দিয়েছ মোর হিয়া,
এঁকে গেছ সব ভাবনায়
সূর্যাস্তের বরন মাধুরী।

তার পর থেকে রবীন্দ্রনাথের "ছবি" কবিতাও যে কতবার আওড়িয়েছি ঠিক নেই, বিশেষ করে সেই অবিস্মরণীয় লাইন ক-টি :

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

তারপরে জীবনের পথে-পথে আরো কত প্রিয়জনকে হারিয়ে এসেছি। মৃত্যুর মাধুরীও তাই দিন-দিন আরো ঘনীভূত হয়ে জীবনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে, আর চিরবিদায়ের আভা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে তাকে রাঙিয়ে রেখেছে।

মৃত্যুর সঙ্গে আমার মিতালি বহু পুরাতন। সে মিতালি নিঃস্বার্থ নয়। যে প্রিয়জনকে কালস্রোতে হারিয়ে নিজে এসে অশীতির কোঠায় পৌঁছেছি, তাঁদের স্মৃতিই যে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। সে স্মৃতিসম্পদ যে জাদুঘরে সঞ্চিত রয়েছে তার দ্বাররক্ষী হল মৃত্যু বা স্বয়ং যমরাজ। তাকে এড়িয়ে তো সে ঐশ্বর্য সম্ভোগের কোনো উপায় নেই। তাই বহুদিন আগেই তার সঙ্গে একটা রফা করে নিয়েছি। এখন মৃত্যু আমার নিত্যসহচর।

শ্রীসুধীর সেন লিখিত "বড়দা ও আমার তরুণকালের স্মৃতি"র পরবর্তী অধ্যায়টিতে প্রমুখ ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের বাঙলা ছন্দচর্চা নিয়ে বিশদ আলোচনা থাকায় এই অংশটি আমরা নিবন্ধাকারে দু-এক সংখ্যা পরে প্রকাশ করব। চতুরঙ্গে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ হিসাবে এই লেখার প্রকাশ এ সংখ্যাতেই সমাপ্ত হল।

ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন, ১৮২৪-১৯২০

বিনয় চৌধুরী

১২

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণ দিয়ে কৃষক-আন্দোলনের সামগ্রিক রূপ বোঝানো যায় না; বিদ্রোহীদের জটিল মানসিকতা বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে অপরিহার্য—আমাদের এ সিদ্ধান্তের অর্থ এই নয় যে, আমরা অর্থনৈতিক কারণের গুরুত্ব অস্বীকার করছি। বস্তুত, এ অর্থনৈতিক দিকের যথাযথ পর্যালোচনা ছাড়া কৃষকদের মানসিকতার নানা বৈশিষ্ট্য অস্পষ্ট থেকে যায়। এই প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে এ বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব ছিল না।

আমাদের নির্বাচিত আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে কৃষকদের শ্রেণীসম্পর্কের আপেক্ষিক গুরুত্ব-নির্দেশ প্রাসঙ্গিক হবে। ঐতিহাসিক পরিস্থিতিভেদে এ সম্পর্কের ভূমিকার রূপও ভিন্ন। একটা বিষয়ে কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক মোটামুটি একমত। তা হল এই যে, যে-প্রভুত্ব এবং কর্তৃত্বের সঙ্গে কৃষকেরা দীর্ঘদিন অভ্যস্ত, শুধুমাত্র তার জন্য সচরাচর কোনো ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে না। কিন্তু প্রভুশ্রেণীর পীড়ন বা শোষণের আকস্মিক তীব্রতাবৃদ্ধিকে কৃষকেরা সহজে মেনে নেয় না, এবং অনুকূল পরিস্থিতিতে তার প্রতিরোধে সংঘবদ্ধ হয়।[৩০০]

আমাদের আলোচিত আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা অংশত মাত্র খাটে। সবক্ষেত্রে এ আকস্মিকতা ছিল না, যেখানেও বা তা ছিল, সেখানে শুধু তা-ই আন্দোলনের আসল কারণ নয়। এখানে সক্রিয় ছিল বিক্ষুব্ধ কৃষকদের এক বিশেষ মানসিকতা। সেটা হল, নানা অভিজ্ঞতাজাত এক দৃঢ় প্রত্যয় যে, দেশের শাসকগোষ্ঠী প্রভুশ্রেণীর স্বৈরাচার বন্ধ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে; শুধু তাই নয়, স্থানীয় প্রশাসনের কোনো-কোনো অংশের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া এ পীড়ন সম্ভবই হত না। তাই বিদ্রোহের প্রধান প্রেরণা ছিল বিকল্প রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংকল্প।

একটিমাত্র ব্যতিক্রম ফরাজি আন্দোলন। জমিদার-নীলকর-বিরোধী আন্দোলনে স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে ফরাজিদের সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল; কিন্তু তারা ভাবে নি—এ আন্দোলনের সাফল্যের জন্য ব্রিটিশরাজের অপসারণ অপরিহার্য।

ওহাবিদের ক্ষেত্রে, "দাড়ির জরিপানা" নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ নূতন এক উৎপীড়ন। কিন্তু তা এমন কোনো দুর্বহ বোঝা ছিল না যে, শুধুমাত্র এর জন্যই তাদের এত ব্যাপক আন্দোলন ঘটতে পারত। অনেক প্রচলিত আবওয়াব সম্পর্কে তারা কিছুই বলে নি। অথচ এ "জরিপানা"কে তারা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করেছে। এর কারণ—জরিমানার অর্থনৈতিক গুরুত্ব মোটেই নয়; আসল কারণ—এ নূতন জমিদারি পীড়ন তাদের ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাত; বিশেষ করে এ বিশ্বাসে দীক্ষা একান্তই সাম্প্রতিক ঘটনা। বস্তুত, এ জরিমানার প্রতিরোধ পরবর্তী আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। একে কেন্দ্র করে জমিদারের সঙ্গে ওহাবিদের সম্পর্ক ক্রমেই জটিল হয়ে ওঠে। জমিদার নানা কৌশলে 'অবাধ্য প্রজা'-শাসনের চেষ্টা করে। জমিদারি পীড়নের সব কথা ওহাবিরা জানায়। প্রতিকারের কোনো চেষ্টাই সরকার করে নি; এমনকী, স্থানীয় পুলিশ জমিদারের নানা দুষ্কর্মে প্রশ্রয় দিয়েছে; প্রকাশ্যে তাদের পক্ষ নিয়েছে। নদীয়া বিভাগের কমিশনারের কাছে তিতু মীর 'কুখ্যাত এক সর্দার ডাকাত'; আর তার শিষ্যরা 'সর্দারের' 'দুষ্কর্মের' সহযোগী মাত্র। ওহাবি আন্দোলনের পটভূমিকা তাই মূলত রাজনৈতিক। জমিদার-নীলকর-বিরোধী আন্দোলন রাজবিরোধী বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

প্রধানত পাগলপন্থীদের ক্ষেত্রেই আমরা দেখি, জমিদারি পীড়নের আকস্মিক তীব্রতাবৃদ্ধি আঞ্চলিক অর্থনীতিতে এক গুরুতর বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এ পরিস্থিতি বার্মাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল। কিন্তু আগেকার জমিদারি স্বেচ্ছাচার সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির: এর প্রধান রূপ—অনিয়মিতভাবে খাজনা বাড়ানো এবং নূতন-নূতন আবওয়াব বসানো। তা ছাড়া, নিত্য নিয়ত শরিকি সংঘর্ষের ফলে চাষবাসের অপূরণীয় ক্ষতি হত। যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি আলাদা ধরনের। জমিদার তখন সরকারি নির্দেশ পালনের যন্ত্র মাত্র; কৃষকদের উপর নূতন উৎপীড়ন অপরিহার্য হয়েছিল যুদ্ধের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই। অন্যদিকে, যুদ্ধের জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জমিদারের নানা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পাগলপন্থীদের আন্দোলন প্রশাসনকে দমন করতেই হবে। কারণ সামরিক প্রস্তুতিতে কোনো শৈথিল্য বা বিঘ্ন সরকার বরদাস্ত করবে না। তাই, কৃষকদের কাছে এ অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় ছিল শুধুমাত্র জমিদারি প্রভুত্বের অবসান নয়, ব্রিটিশরাজের বদলে পাগলরাজ প্রতিষ্ঠা। তাদের বিশ্বাস ছিল, টিপু পাগলের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের সব দুর্দশার অবসান ঘটবে।

এমন কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই যে, সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) ঠিক আগে জমিদারি আর মহাজনি শোষণ হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহের মানসিকতা বিকাশের প্রথম পর্যায় কুখ্যাত কয়েকজন মহাজনের বাড়ি আক্রমণ। এর কারণ, কোনো নূতন মহাজনি জুলুম নয়। সরকার থেকে প্রতিকারের সব আশা ব্যর্থ হলে প্রতিহিংসা হিসেবে সাঁওতালরা এ কাজ করে; তারা ভেবেছিল, এবার হয়তো মহাজনেরা সতর্ক হবে। মহাজনের কাজে উত্ত্যক্ত হয়ে তারা তাদের বাড়ি চড়াও হয়; সরকার মহাজনের গায়ে হাত দিল না, অথচ 'ডাকাতি'র মিথ্যা অভিযোগে সাঁওতালদের কঠিন সাজা দিল। গোটা সাঁওতাল জগৎ এতে তীব্র ভাবে বিক্ষুব্ধ হয়। এর পর প্রায় এক বছর ধরে সাঁওতালরা নানাভাবে চেষ্টা করেছে, যাতে সরকার মহাজনদের সম্পর্কে কিছু করে। দিব্যশক্তি আবির্ভাবের ঘটনার পরও তারা স্থানীয় প্রশাসনকে একই

কথা বলে। কোনো ফল হয় নি। সহিংস হুলের সিদ্ধান্ত হয়তো আরো বিলম্বিত হত, যদি না মহাজন এবং থানার দারোগার মধ্যে গূঢ় যোগসাজসের নূতন প্রমাণ মিলত। এর পর বিদ্রোহী সাঁওতালদের লক্ষ্যে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। শুধুমাত্র মহাজন এবং জমিদারের প্রতাপ খর্ব করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না; তারা চেয়েছিল স্বতন্ত্র সাঁওতালরাজের প্রতিষ্ঠা।

তাদের পরবর্তী আন্দোলনে রাজবিরোধিতার সুর ক্রমেই স্পষ্ট হয়েছে। ভগীরথ-নির্দেশিত আন্দোলনের (১৮৭৪-৭৫) পটভূমিকা আগের থেকে বহুলাংশে আলাদা। দুর্ভিক্ষের সময় (১৮৭৩-৭৪) খাদ্যশস্য বণ্টনের ব্যাপারে তাদের তীব্র বিক্ষোভ ছিল। তাদের অভিযোগ, সরকারের দেওয়া চাল-ডালের মোটা অংশ মহাজন এবং অন্য ব্যাপারীর হাতে চলে যাচ্ছে, অথচ তাদের চরম দুর্দশা সত্ত্বেও তারা অতি কষ্টে সামান্য কিছু মাত্র যোগাড় করতে পেরেছে। এর জন্য তারা সরকারকেই দায়ী মনে করেছে। সে সময়কার সাঁওতাল-বিক্ষোভের আর-একটা কারণ বিস্তীর্ণ জমিদারি এলাকায় ব্যাপকভাবে খাজনার হারের পুনর্বিন্যাস। সাঁওতালরা দেখল, সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই এটা ঘটেছে। অথচ, বহুক্ষেত্রে এর ফল হয়েছে তাদের পক্ষে মারাত্মক। সরকারের উদ্দেশ্য যাই হোক, সাঁওতালদের অভিযোগ এর ফলে খাজনার বোঝা বেড়েছে, এবং দীর্ঘদিনের অন্যান্য নানা স্বীকৃত অধিকার খর্ব হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি অনুমোদনের অর্থ—খাজনা-বৃদ্ধির বৈধতা সম্পর্কে তাদের কোনো আপত্তি সহজে টিকবে না। অথচ পরবর্তী কালে জমিদারের খাজনা বাড়ানোর নানা অপকৌশল ব্যর্থ করার কোনো চেষ্টাই সরকার করে নি। খাজনা বাড়ার তাৎপর্য শুধু অর্থনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিকও। জমিদারের নূতন ব্যবস্থার ফলে সাঁওতালদের পুরনো সমাজ-সংগঠন ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। সামাজিক সংহতিবোধ তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের একটা প্রধান ভিত্তি। আদম-সুমারি-বিরোধী আন্দোলনে (১৮৮১-৮২) সরকার-বিরোধিতা আরো প্রকট।

সাঁওতাল আন্দোলনেও তাই আমরা দেখি—মূল লক্ষ্য স্বাধীন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা।

মুণ্ডা-আন্দোলনের কারণ হিসেবেও আমরা মুণ্ডাদের আকস্মিক দুর্দশাবৃদ্ধির বিশেষ কোনো ঘটনা দেখতে পাই না। সিপাহি-বিদ্রোহের সময়কার আন্দোলন প্রধান এক ব্যতিক্রম। এর পরের ইতিহাস বহিরাগতদের হাতে মুণ্ডাদের প্রবঞ্চনার ইতিহাস—বিশেষ করে ভুঁইহার মুণ্ডাদের। তাদের অনেক জমি হাতছাড়া হয়ে যায়। তবে এটা দীর্ঘদিন ধরে আস্তে-আস্তে ঘটেছে—হঠাৎ নয়। কিন্তু এর ফলেই সরকার সম্পর্কে অবিশ্বাস ক্রমেই বাড়ছিল। ভুঁইহারি জমির অধিকার সংক্রান্ত বিবাদ-বিসংবাদ ফয়সালার ভার ছিল সরকারের নিজের লোকের উপর। অথচ বহু ভুঁইহার পরিবার পুরনো অধিকারের খানিকটা অংশ মাত্র রক্ষা করতে পেরেছে; অনেকে সর্বস্বান্তও হয়েছে। মুণ্ডারা বরাবর অভিযোগ করেছে—সরকারের লোক জমিদারের পক্ষ নিয়েছে বলেই তাদের এ সর্বনাশ ঘটেছে। কিন্তু প্রতিকার কিছু মেলে নি। পরেও তারা সরকারের কাছে অভিযোগ করেছে, নেহাতই নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে, বহু মুণ্ডার সই-সম্বলিত আরজি মারফত। সরকার কোনো সহানুভূতি দেখায় নি; প্রতিক্ষেত্রেই বলেছে, গুটিকয়েক 'স্বার্থপর', 'ফন্দিবাজ' নেতার প্ররোচনাতেই তারা এসব করছে! স্বভাবতই, ব্রিটিশরাজের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে তারা আস্থা হারায়। যা-কিছু সামান্য মোহ 'সর্দারি-লড়াই'য়ের সময় ছিল, পরে তা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। বীরসার আন্দোলন এ দীর্ঘ ইতিহাসের পরিণতি মাত্র—যদিও তাতে অনেক নূতন লক্ষণ ছিল।

বীরসার দ্বিতীয় বিদ্রোহের আগে মুণ্ডা অর্থনীতিতে পর-পর রকমারি বিপর্যয় ঘটে। কিন্তু বিদ্রোহের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগ নেই। বস্তুত, উপজাতি অঞ্চলের বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য সেখানকার কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে শস্যের ফলন-

সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা নূতন কোনো ঘটনা নয়। তাই শুধু তা দিয়েই বীরসার এ আন্দোলন ব্যাখ্যা করা যায় না। মুণ্ডারাজের প্রতিষ্ঠা না হলে বহিরাগতদের লোলুপ গ্রাস থেকে তাদের পরিত্রাণ নেই—এ বিশ্বাস আগেই গড়ে উঠেছে। সহিংস পন্থা সম্পর্কে বীরসার কিছু দ্বিধা ছিল; কিন্তু মূল লক্ষ্য সম্পর্কে তার চিন্তায় কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। মুণ্ডাজাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য তার সব পরিকল্পনার মূল প্রেরণা স্বাধীন মুণ্ডারাজের স্বপ্ন।

ওরাওঁদের আর্থিক দুর্দশা সম্পর্কে সমসাময়িক সব প্রতিবেদন একমত। জোতজমার স্বল্পতার জন্য কৃষির আয় থেকে বহু পরিবারের ভরণপোষণ চলত না। জীবিকা হিসেবে দিনমজুরি নির্ভরযোগ্য ছিল না। বিশেষ করে যখন নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বা অন্যান্য কারণে শস্যের ফলন হঠাৎ হ্রাস পেত। ওরাওঁ অঞ্চলে এটা আদৌ অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তাই রুজিরোজগারের জন্য দলে-দলে তারা চা-কুলি হিসেবে বাঙলা এবং আসামে যেত। ১৯০৫ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য তাদের দুর্দশা আরো বাড়ে। মহাযুদ্ধের সময় কাপড়-চোপড়, কেরোসিন ইত্যাদি পণ্যের যোগান হঠাৎ হ্রাস পেল বলে তাদের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়ে; অথচ খাদ্যশস্যের দাম বড়ো একটা বাড়ে নি। কোনো-কোনো সময় তা কমেওছে (যেমন ১৯১৭ সালে), ফলে তাদের দুর্দশা চরমে ওঠে।

স্বভাবতই, সরকার এবং বহিরাগত গোষ্ঠী সম্পর্কে ওরাওঁদের বিদ্বেষ ক্রমেই বেড়েছে। কিন্তু ওরাওঁ আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে এ পরিবর্তমান অর্থনীতি এবং শ্রেণীসম্পর্কের প্রত্যক্ষ যোগ সব সময় দেখা যায় না। প্রথম ওরাওঁ আন্দোলন শুরু হয় (এপ্রিল ১৯১৪) মহাযুদ্ধ শুরু হবার আগে (২৮ জুলাই—১ অগস্ট, ১৯১৪), যার ফলে কৃষিপণ্য ছাড়া বহু ভোগ্যপণ্যের দাম হঠাৎ বেড়ে যায়। পরবর্তী আন্দোলনে এ মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব অনস্বীকার্য। তখনকার প্রকট মারোয়াড়ি বিদ্বেষ কাপড়-চোপড়ের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এ সম্প্রদায়ের গৃধ্নুতার ফল। কিন্তু সামগ্রিক আন্দোলনের এটা প্রধান দিক মোটেই নয়। জলপাইগুড়ির আন্দোলনেও চা-মালিকদের সম্পর্কে ওরাওঁদের তীব্র বিরাগের প্রভাব একান্তই গৌণ। এ আন্দোলনের মূল সুর ব্রিটিশরাজ-বিরোধিতা। ১৯১৮/১৯-এর আন্দোলনে সে সময়কার আকস্মিক পণ্য-মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব সন্দেহাতীত; কিন্তু আন্দোলনের মূল লক্ষ্য যে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা অনেক আগেই গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন আন্দোলনের উপলক্ষ মাত্র।

বস্তুত, মূল লক্ষ্যের এ বিশিষ্টতার জন্যই আমাদের নির্বাচিত আন্দোলনগুলির এ পরিবর্তন সম্পর্কে কৃষকদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ফল নয়। এর লক্ষ্য ব্রিটিশরাজের বিকল্প স্বাধীন রাজের প্রতিষ্ঠা। কারণ লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট হলেও লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় বিতর্কাতীত নয়; উপায় স্থির করার পর আন্দোলনের সংগঠন গড়ে তোলা দুরূহতম কাজ। বীরসার দ্বিতীয় আন্দোলনের সাংগঠনিক প্রস্তুতি শেষ হতে প্রায় দু বছর লেগেছিল (ডিসেমবর ১৮৯৭—ডিসেমবর ১৮৯৯)। ১৯১৮-১৯ সালের ওরাওঁ আন্দোলন এর তুলনায় অনেক কম ব্যাপক; তবুও এর সংগঠন গড়ে তুলতে নেতা শিবু ওরাওঁ-র লেগেছিল সাত আট মাস (অগস্ট ১৯১৮—ফেবরুয়ারি ১৯১৯)।

১২.২

আমূল রাজনৈতিক রূপান্তরসাধনের প্রয়াস যেখানে বিদ্রোহের মূল প্রেরণা সেখানেই প্রধানত আমরা ধর্মের এক বিশিষ্ট ভূমিকা দেখি। এখানে ধর্মবিশ্বাসের তাৎপর্য শুধুমাত্র বিদ্রোহীদের সংহতিবোধের একটা প্রধান বনিয়াদ হিসেবে নয়। বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য, লক্ষ্যসিদ্ধির উপায়, বিদ্রোহের সংগঠন ইত্যাদি সম্পর্কে কৃষকদের নানা ধারণাকেও তা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

ফরাজি আন্দোলন এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম। ধর্মের ভূমিকা এখানে অপেক্ষাকৃত সীমিত। বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাসের জন্য জমিদারি-পীড়নের কোনো-কোনো দিককে ফরাজিরা স্বতন্ত্র এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিল। যেমন, এ বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে তারা জমিদারের কোনো-কোনো আবওয়াব মেনে নেয় নি। একই কারণে ফরাজি বা অন্য মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেকার ধর্মসম্পৃক্ত বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসায় জমিদারের কোনো এক্তিয়ারও তারা স্বীকার করে নি। ফরাজি সংগঠনের প্রভাব-প্রতিপত্তি তাই শুধুমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকল না। ধর্মগুরুর নির্দেশকে ফরাজি কৃষকেরা দীর্ঘদিনের প্রথাসম্মত জমিদারি কর্তৃত্বের বিকল্প হিসেবে স্বীকার করে নিল। এ দুই বৈরী গোষ্ঠীর ক্ষমতার লড়াই গ্রামাঞ্চলে একটা নূতন ঘটনা। 'ফরাজি আন্দোলন' আসলে এ লড়াইয়ের একটা রূপ।

ওহাবি, পাগলপন্থী এবং উপজাতিদের সব আন্দোলনে ধর্মের ভূমিকা অনেক বেশি ব্যাপক।

ফরাজিদের মতো নূতন ধর্মবিশ্বাসে দীক্ষিত ওহাবি কৃষকরাও জমিদারি কর্তৃত্বের কোনো-কোনো দিক মেনে নেয় নি। কিন্তু এক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকার আরো বিশিষ্ট রূপ ছিল।

(ক) ইসলাম-অনুমোদিত "জিহাদে"র ধারণা ওহাবিদের রাজবিরোধী মানসিকতাকে গোড়া থেকেই অনুপ্রাণিত করেছিল কিনা বলা শক্ত। বাঙলায় ওহাবিদের গোড়াকার প্রচারে এ ধারণা সম্ভবত সুস্পষ্ট ছিল না। কিভাবে আস্তে-আস্তে এ মানসিকতা গড়ে ওঠে, তা আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি। তা গড়ে ওঠার পর জিহাদের চেতনা তাকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে।

(খ) বিধর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হলেও শহীদ হিসেবে অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে—জিহাদের এ ধারণা ওহাবিদের প্রভাবিত করেছিল কিনা, তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। বিহারীলাল এবং আবদুল গফুর সিদ্দিকীর বিবরণ অনুযায়ী, যুদ্ধের সংকটমুহূর্তে তিতুমীর এ বলে অনুগামীদের উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছিল। এর প্রামাণিকতা বিচারসাপেক্ষ।

(গ) ওহাবিদের এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক ধারণায় ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব লক্ষণীয়। আন্দোলন শুরু হবার পর ওহাবিদের এক প্রচার ছিল—কোম্পানিরাজের অবসানের পর মুসলমানরা আবার তাদের হারানো রাজনৈতিক ক্ষমতা ফিরে পাবে। তিতু নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করে, কিন্তু কোথাও বলে নি যে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের ভার থাকবে শুধুমাত্র ওহাবিগোষ্ঠীর উপর।

(ঘ) তিতুর অলৌকিক ক্ষমতায় ব্রিটিশ বাহিনীর প্রবল পরাক্রম সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যাবে—ওহাবিদের উপর এ ধর্মবিশ্বাসের গভীর প্রভাব সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এ বিশ্বাসের কথা প্রায় জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছিল। সমসাময়িক তিতুর এক জীবন-কাহিনী ("হরুগীতি") একে ব্যঙ্গভরে উল্লেখ করেছে: 'ফকির বলে তখন, বাপুধন, ভয় করব কারে, / এ ছাখ গোল্লা খাই হজরতের বরে'। তিতুমীরের যুদ্ধ সম্পর্কে একটা প্রচলিত প্রবাদের 'গোলা খা জলা'র ভিত্তি এ জনশ্রুতি। যুদ্ধক্ষেত্রে ওহাবিদের বিসদৃশ আচরণ ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষরা এ-ভাবেই ব্যাখ্যা করেছিল। যেভাবে তারা নির্ভয়ে উন্নততর অস্ত্রসজ্জিত শত্রুসেনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তা আদৌ কোনো রণকৌশলসম্মত নয়।

এ ধর্মবিশ্বাস প্রচারিত ওহাবি-মতবাদের অঙ্গ মোটেই নয়। এর একটা উৎস সুফী ও পীর-ঐতিহ্য। ওহাবিরা সুফীবাদ ও পীরবাদের কঠোর সমালোচক; কিন্তু এক সুফী-সাধক (পীরশাহ্ কামাল) এবং তার শিষ্যের ('ফকির' বলে পরিচিত মিশকীন শাহ্) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিদ্রোহের সংগঠনে মিশকীনের প্রত্যক্ষ ভূমিকাও ছিল। সম্ভবত তারই প্রভাবে ওহাবিদের মধ্যে এ বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।

পাগলপন্থীদের ক্ষেত্রে ধর্মগুরুর এ অলৌকিক

ক্ষমতায় বিশ্বাসের প্রভাব আরো গভীর। ওহাবিদের মতো তারাও শুধুমাত্র এ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে লড়াইয়ে নামে নি। যথাসাধ্য সামরিক প্রস্তুতি তাদের ছিল। কিন্তু তাদের নৈতিক এবং আর্থিক বলের উৎস ছিল এ বিশ্বাস।

(ক) সংঘর্ষ শুরু করার আগে তারা টিপু-পাগল ও তার মার ('মা-সাহেবা') সঙ্গে পরামর্শ করে। ওহাবিদের বিশ্বাস থেকে তাদের বিশ্বাস খানিকটা ভিন্ন প্রকৃতির। ওহাবিদের বিশ্বাস ছিল, নেতার অতি-প্রাকৃত ক্ষমতার প্রভাবে শত্রুশক্তি নিষ্ফল হয়ে যাবে। কিন্তু ওহাবিদের নিজস্ব প্রতিরোধের উপর এ বিশ্বাস কী ভাবে কাজ করবে, সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। পাগলপন্থীদের বিশ্বাস-সম্পর্কিত দুটি জন-শ্রুতির কথা সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়: মা-সাহেবা ইচ্ছে করলেই শুধুমাত্র কাপড় ঝেড়ে এক বিশাল বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির করাতে পারেন; দ্বিতীয়ত, মন্ত্রপূত এক বিশেষ গাছের কাঠ থেকে বানানো বন্দুক সত্যিকারের বন্দুকের মতো কার্যকর হবে। (তবে পুলিশি তল্লাসি থেকে জানা যায়, কাঠের বন্দুকের সঙ্গে অন্যান্য প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গিয়েছিল।)

(খ) বিদ্রোহীদের ধারণা, তাদের নেতার মধ্যেই এ অতিপ্রাকৃত শক্তি মূর্ত হয়েছে। বাইরের অদৃশ্য কোনো উৎসের কথা তারা ভাবে নি। নেতার এ শক্তির উৎস এক ধরনের জাদুশক্তি। এ শক্তিকে অতিপ্রাকৃত বলা যায় এ কারণে যে, শুধুমাত্র নেতারই এ ক্ষমতা আছে। বিদ্রোহীদের বিশ্বাস, নেতার জাদু বা মন্ত্র-শক্তিতে তাদের ব্যবহার্য সব সামরিক উপকরণে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির সঞ্চার হবে। তা ছাড়া জাদুশক্তি-প্রয়োগ বিমূর্তও হতে পারে; জাদুশক্তি যে শুধু দৃষ্টি-গোচর বস্তু মারফত কার্যকর হবে, তা নয়; তাই নিরবয়ব এ শক্তির প্রভাবে বহুদূরের ব্রিটিশ বাহিনীর স্বাভাবিক ক্ষমতা ব্যর্থ হবে।

(গ) বিকল্প পাগলরাজের সার্বভৌমত্ব এ অতি-প্রাকৃতশক্তিধর পাগলধর্মগুরু থেকে অভিন্ন। বিকল্প সরকার তাকে এবং তার অনুগামীদের নিয়েই গড়ে ওঠে। বিদ্রোহীরা প্রকাশ্যে বলেছে, পাগলরাজা ছাড়া অন্য কারো নির্দেশ তারা মানবে না। নূতন ফৌজি সড়ক তৈরিতে তারা বেগার খাটবে না, এর একটা কারণ হিসেবে তারা বলেছে, টিপু-পাগল তা বারণ করেছে; জমিদারকে কোনো খাজনা তারা আর দেবে না; এবার থেকে তা টিপুর কোষাগারে জমা পড়বে। অর্থাৎ বিদ্রোহের ঘোষণা, তার সংগঠন এবং বিদ্রোহী-দের সব কাজ ধর্মগুরুর নির্দেশে পরিকল্পিত।

(ঘ) ধর্মবিশ্বাসে পাগলপন্থী না হলেও বহু কৃষক টিপুর নানা ঘোষণা, নির্দেশ এবং সার্বভৌমত্ব নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে। কারণ, ধর্মবিশ্বাস এখানে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয়, জমিদারি-শোষণ-মুক্ত এক নূতন রাজনৈতিক বিধানে বিশ্বাস। তাই পাগল সম্প্রদায় না হয়েও তারা টিপু ও তার মার অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার কথা বিশ্বাস করেছে।

সাঁওতাল, মুণ্ডা এবং ওরাওঁ আন্দোলনে ধর্ম-বিশ্বাসের বিশিষ্ট ভূমিকা মূলত এক, যদিও তার রূপ ভিন্ন। দীর্ঘস্থায়ী এ আন্দোলনগুলির নানা পর্যায় ছিল, কিন্তু তবুও নানা দিক থেকে তাদের সাদৃশ্য আছে।

(ক) পাগলপন্থার আবির্ভাব কোনো সংগঠিত কৃষক-আন্দোলনের পটভূমিকায় ঘটে নি। পরে তা কৃষক-বিদ্রোহের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু ধর্মচেতনা গোড়া থেকেই এ তিন আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। (খ) এ তিনক্ষেত্রেই আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের শুরু ধর্মগুরুদের এক ঘোষণা থেকে। তা হল, দিব্যশক্তির নির্দেশেই তারা অনুগামীদের শত্রু-বিরোধী সংগ্রামে ডাক দিচ্ছে, ভগবান-নির্দেশিত বলেই এতে তাদের জয় অনিবার্য; আর এ জয়ে তাদের সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হবে। জয় সম্পর্কে এ নিশ্চিত প্রত্যয় দিল বিদ্রোহীদের নৈতিক বলের প্রধান উৎস। অতিপ্রাকৃত শক্তির হস্তক্ষেপে

প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি নিষ্ফল হবে, এ বিশ্বাসও তাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। (গ) ধর্মগুরু-দের প্রাথমিক ভূমিকা ছিল দিব্যশক্তিপ্রেরিত বার্তাকে অনুগামীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া; কিন্তু তারাই পরে দিব্যপুরুষের স্তরে উন্নীত হল। (ঘ) অলৌকিক ক্ষমতাবলে ধর্মগুরুরা দুরারোগ্য রোগ ইত্যাদি সারাতে পারে। সাধারণের এ বিশ্বাস কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপক প্রভাবের কারণ ছিল—যেমন দুবিয়া গোসাঁই, বারসা মুণ্ডা। সিধু-কানুর ক্ষেত্রে এ লৌকিক বিশ্বাসের কোন ভূমিকা ছিল কিনা বলা শক্ত। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ ভূমিকা ক্রমেই গৌণ হয়ে যায়। অনুগামীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দৈব-দুর্বিপাককে ছাপিয়ে ওঠে সমগ্র উপজাতির জন্য এক সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন।[৩০১] ধর্মগুরুর সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের ভিত্তি এ স্বপ্ন-সৃষ্টিতে তার ভূমিকা। (ঙ) নূতন-নূতন ধর্মগুরুর আবির্ভাব সাঁওতাল এবং ওরাওঁ আন্দোলনের একটা বিশেষ দিক। কিন্তু তাদের সম্পর্কে সাধারণের ধারণা আদিগুরুর ব্যক্তিত্বের আদলেই গড়ে উঠেছে। (চ) প্রথম পর্যায়ের আন্দো-লনের ব্যর্থতায় ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে উপজাতিদের ধারণায় এক পরিবর্তন আসে। তা হল এক নূতন বোধ যে তাদের অনেক পুরনো ধর্মবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক নানা প্রথা বর্জন করে নূতন ধর্ম ও সমাজ গড়ে তুললেই তারা প্রবল শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে সফল হবে। ধর্মবিশ্বাসের ভূমিকা এখানে আদৌ হ্রাস পায় নি। বিশ্বাসের রূপ পালটেছে মাত্র।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

তথ্যনির্দেশ

৩০০. Barrington Moor-এর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: 'Economic deterioration by slow degrees can become accepted by its victims as part of the normal situation. Especially where no alternative is clearly visible, more and more privation can gradually find acceptance in the peasant's standard of what is right and proper. What infuriates peasants (and not just peasants) is a new and sudden imposition of demand that strikes many people at once and that is a break with accepted rules and customs.' *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, 1977, Chapter 'The Peasant and Revolution', p. 474

৩০১. Bryan R. Wilson এ পরিবর্তনকে 'from Magic to Millenium' বলেছেন: 'Such [magical] practice and procedures are predominantly personal in applicytion—rarely extending beyond individuals to families or communities. The revolutionist (millenial) response in contrast is always social—tribal or ethnic—and are rarely localized to the merely communal.' *Magic and Millenium* (London, 1973), Chapter 'Conclusions', p. 484.

আমাদের নির্বাচিত আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে এ পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য না হলেও 'millenial' মানসিকতা যে জাদুবিদ্যার প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কিত ধারণা থেকে স্বতন্ত্র, উইলসনের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য।

বিষয় : ব্রহ্মদেশ

বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহারাজ তিব'র আয়ব্যয়

গল্প আছে, মুর্শিদাবাদ-নবাববাড়ির একজন চাকর চাকুরি ছাড়িয়া কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধনী—বাবুর বাড়িতে চাকুরি প্রার্থনা করিয়াছিল। বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে বলে যে, নবাববাড়িতে সে হুকাবরদার ছিল, এবং মাত্র এই কার্যে সে দক্ষ। নবাবসাহেবের পাঁচজন হুকাবরদার আছে, তাহাদের মাসিক বেতন খোরপোশ ও বাড়ি বাবদ ৫৫ টাকা। সে মাসিক ৭৫ টাকা বেতনের লোভে বাবুর বাড়িতে চাকুরি করিতে আসিয়াছে।

বাবুর ম্যানেজারের বেতন ছিল মাসিক ১২৫ টাকা। হুকাবরদারের ৭৫ বেতন দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত ব্যয় হইলেও কৌতুক দেখিবার জন্য ওই হুকাবরদারকে ওই বেতনে চাকুরিতে নেওয়া হইল।

হুকাবরদারের উপদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ আরও তিনজন চাকর ১৫ বেতনে তাহার সহকারীরূপে নিযুক্ত হইল। কেওড়া কা পানি, গুলাব কা আরক, বেলিকা আতর প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্যদ্বারা বাবুর সোনার আলবোলা ও বিদ্রিগুলির জল সুগন্ধ করা হইতে লাগিল। তাঁহার মেজাজ ও তবিয়ত অনুসারে কড়া, মিঠা, মিঠাকড়া, কড়ামিঠা, মিঠি-আমেজ প্রভৃতি নানাপ্রকার তামাক সাজিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। মজলিস বুঝিয়া, রৌদ্রের তাপ পরিমাণ করিয়া, রাত্রির স্নিগ্ধতা অনুভব করিয়া তামাক যোগাইতে-যোগাইতে শীঘ্র হুকাবরদার মনিবের প্রশংসালাভ করিল। কিন্তু বাবুর ম্যানেজার মহাশয় যখন দেখিলেন যে কেবল এই তাম্রকূটের হিসাবেই কর্তার মেজাজ খুশ রাখিবার জন্য মাসিক প্রায় ৫০০ টাকা চলিয়া যাইতেছে, তখন তাঁহার মেজাজ কিছু রুক্ষ হইয়া উঠিল। এক বৎসর কাল পর, হুকাবরদারের চাকুরি আর ম্যানেজার মহাশয়ের বরদাস্ত হইল না। কম বেতনের একজন লোক রাখিয়া তাহাকে বরখাস্ত করা হইল। কিন্তু তাহাকে ম্যানেজার সাহের একখানি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন।

বাদশাহি ভারতের ও নবাবি আমলের বঙ্গদেশে এইরূপ বিলাসিতা যেমন দুনিয়ায় অতুলনীয় ছিল, ব্রহ্মরাজার আমলের ব্রহ্মদেশেও ব্রহ্মরাজগণের ঐশ্বর্য ও বিলাসিতাও তেমনি প্রতীচ্যে স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইত। ব্রহ্মের রাজপ্রাসাদে ব্রহ্মরাজার স্বর্ণমণ্ডিত গৃহকক্ষ, মণিমাণিক্যমণ্ডিত তাঁহাদিগের গৃহসজ্জা, তন্মধ্যে অপ্সরাসদৃশা, সুবেশা, সুকেশা, কনকোত্তমকান্তি রানীবৃন্দ এবং ততোধিক সুন্দরী ও সুযৌবনা তাঁহাদিগের সহচরীসমূহ দেখিয়া বিদেশীয় নয়ন ঝলসিয়া যাইত। তাঁহাদিগের তাম্বুলপাত্রবাহিকা বা জলাধার-রক্ষয়িত্রীগণ যেরূপ উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিত, এবং মণিমুক্তা পদ্মরাগ ও নীলকান্তাদির অলঙ্কার ব্যবহার করিত, তাহাতে তাহাদিগের কর্ত্রীদিগের কত বহুমূল্য অলঙ্কার ও সাজসজ্জা ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইত। রাজকর্মচারিগণও পদানুযায়ী যে-সকল পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন তাহাও বহুমূল্যবান বস্ত্র ও নানাবিধ রত্নাদি দ্বারা ভূষিত হইত। এইরূপ মণিরত্নের ছড়াছড়ি ও স্বর্ণরৌপ্যনির্মিত গৃহসজ্জাদির আতিশয্য দেখিয়া মান্দালয়নিবাসী ইউরোপীয়গণ চমৎকৃত হইয়া যাইতেন। মোলক ও মোলাউঙ-এর আকর ব্রহ্মসরকারের একচেটিয়া ছিল; চীনদেশ হইতে বহুপরিমাণে রৌপ্য ও স্বর্ণ উচ্চ ব্রহ্মদেশে আনীত হইত; অমরাপুরা ইলুওয়া প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট রেশমি কাপড় প্রস্তুত হইত। সেই মণিমুক্তা-হীরা-জহরতের দিনে সামান্য সোনার গহনার বড়ো আদর ছিল না।

কিন্তু মহারাজ তিব'কে বন্দী করিয়া রত্নগিরিতে লইয়া যাওয়ার (১৮৮৫) পর সেই ঐশ্বর্যসম্পন্ন রাজগৃহের মণিমাণিক্য স্বর্ণরৌপ্যাদি আরব্য উপন্যাসের মায়াপুরীর ঐশ্বর্যের ন্যায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কে নিল, কিভাবে অন্তর্হিত হইল তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। মহালোকাজিল ফায়ার সুবর্ণনির্মিত বুদ্ধমূর্তিকে মান্দালয় পর্বত হইতে উঠাইয়া সমস্ত সুবর্ণ ও রত্নাদি অপহরণ করিয়া ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। মান্দালয় পাহাড়ের উপর যে সুবৃহৎ মূর্তি দক্ষিণহস্ত প্রসারণ করিয়া পৃথিবীকে আশীর্বাদ করিতেছিল, তাহার কপালে এক সুবৃহৎ পদ্মরাগমণি ছিল। দস্যুরা তাহা অপহরণ করিয়া মূর্তিকে অগ্নিসাৎ করিয়া দেয়। এখন সে স্থানে নূতন মূর্তি সংগঠিত হইয়াছে। আতুমসি মন্দিরের অভ্যন্তরে যে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার শিরোদেশে বত্রিশ-রতিপরিমিত এক সুপ্রসিদ্ধ হীরক সন্নিবেশিত ছিল। দুর্বৃত্তেরা তাহা হরণ করিয়া নিয়াছিল। দিল্লীর ময়ূরসিংহাসন নাদিরশাহ পারস্যে লইয়া গিয়াছিলেন—এইরূপ সংবাদ আমরা ইতিহাসে পাই; কিন্তু ব্রহ্মরাজপ্রাসাদের মণিমাণিক্যের যে কী হইল তাহার কিছুই সংবাদ পাওয়া যায় না। স্কট সাহেব লিখিয়াছেন: Theebaw surrendered every thing: his country, his treasures and himself to the British.

এইরূপ সুবর্ণ ও রত্নাদির ব্যবহার করিতে নিশ্চয়ই ব্রহ্মরাজার অনেক অর্থব্যয় করিতে হইত। কিন্তু রাজ্যের আয় খুব বেশি ছিল না। মহারাজ তিব'র ভূতপূর্ব মন্ত্রী ওয়েমাঙো উন-ডাউক রাজ্যের আয়-ব্যয়ের এক তালিকা দিয়াছেন। এইসকল আয় ও ব্যয় ব্যতিরেকে মহারাজার খাস আয় ও উপঢৌকনাদিও ছিল। মোল্লা—নামক একজন সদাগর তখন মান্দালয়ে ছিলেন। ইনি মহারাজা তিব'র অনুগ্রহপাত্র ছিলেন। তাঁহার কন্যা গল্প করিয়াছেন যে, মোল্লা—ঈদ উপলক্ষে মহারাজ তিব'কে ভোজ্য উপহার দিতেন। জয়পুরী পাথরের বাটিতে মাস্কট, হালুয়া প্রভৃতি মিষ্টান্ন রাখিয়া রেশমি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, তিনি মহারাজ তিব'কে "ঈদী" উপঢৌকন দিতেন। এইসকল খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া মহারাজ তিব' মোল্লাকে জিজ্ঞাসা করেন:

—এইসকল মিষ্টদ্রব্য তৈয়ার করিতে কত খরচ

পড়িয়াছে ?

চতুর মোল্লা উত্তর দেন—মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা। দিল্লীর বাদশা এরূপ মিষ্টান্ন বৎসরে একদিন মাত্র ভোজন করিতেন। বহু অর্থব্যয়ে সমস্ত বৎসর ধরিয়া ইহার উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়। ব্রহ্মের মহারাজ সেরূপ গরিব নহেন। তিনি ইচ্ছা করিলে প্রতিমাসে এই মিষ্টান্ন ভোজন করিলেও তাঁহার মণিরত্নের অক্ষয়ভাণ্ডারের কিছু-মাত্র অপচয় হইবে না।

মহারাজ তিব' মোল্লার এই খোশামুদিতে খুশি হইয়া কোষাধ্যক্ষকে আদেশ দেন : 'কালা গো তোং ডউ ঠউ পে লাই' (কালাকে তিন পুঁটলি রত্নমণি ইত্যাদি দেওয়া হউক)।

মোল্লা এইবার প্রায় তিন লক্ষ টাকার মণিরত্নাদি লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজ তিব' ও তাঁহার পূর্ববর্তী ব্রহ্মের রাজাগণ যে পাজো (পরিধেয় রেশমি ধুতি) ব্যবহার করিতেন, তাহার এক-একখানির মূল্য খুব কমপক্ষে একহাজার টাকার নীচে ছিল না। ওই রেশমি কাপড় দুই-তিন মাস পরে একবার ধৌত করিবার জন্য প্রেরিত হইত। কিন্তু কোনো রাজাই দুই ধোপের বেশি কোনও বস্ত্র পরিধান করিতেন না। তাঁহার পরিচারকগণ তাহা গ্রহণ করিত। রেশমি রুমাল একবার ব্যবহৃত হইলে দ্বিতীয়বার তাহা ধুইয়া ব্যবহার করা হইত না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য যে সুগন্ধিদ্রব্য ও চন্দনাদি ব্যবহৃত হইত, তাহার শিশি একবার খুলিলে, ব্যবহার করিলে, পুনরায় তাহা মহারাজার ব্যবহারের জন্য রাখা হইত না। তাঁহার পরিচারিকাগণ তাহা গ্রহণ করিত। মহারাজা তিব' মহারানী থুপিয়ালার ও তাঁহার সহচরী-দিগের সহিত অপরাহ্নে চেপাখেলা খেলিতেন। এই-সকল চেপা সবই সুবর্ণ-নির্মিত ছিল। পাশাখেলা রাজপ্রাসাদে খুবই প্রচলিত ছিল। পাশার ঘুঁটিগুলি স্বর্ণ, - রৌপ্য, তাম্র ও হস্তিদন্ত -নির্মিত ছিল।

(রচনা : অনুমান ১৯৩৪)

সমাপ্ত

স্মরণে

দেবীপদ ভট্টাচার্য

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, অধ্যাপক ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য গত ২২ এপ্রিল শনিবার মাঝরাতে কলকাতায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর পাঁচ মাস। তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের পিতৃভূমি যশোহর জেলার ভুগিলহাট গ্রাম। পিতা কেশবলাল, মাতা সুভাষিণী। পিতা ছিলেন পোস্টমাস্টার। যখন তিনি বগুড়া জেলার শেরপুর শহরে কাজ করছিলেন তখন, ১৯২৩ সালের পয়লা জানুয়ারি দেবীপদ জন্মগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তাঁর পিতৃভূমি ও জন্মভূমি উভয়ই বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। দেবীপদ খুলনা জেলার দৌলতপুর কলেজ থেকে সাম্মানিক বাঙলায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙলায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এম. এ. পাস করেন। বাঙলা চরিতসাহিত্যের ওপর গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট (ডি. ফিল.) উপাধি লাভ করেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু ১৯৪৫ সালে শিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে। তারপর ১৯৪৮-৫৮ প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯৫৯ সালে তিনি যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রূপে বৃত হন ১৯৭৯ সালে। ১৯৮২ সালে পদত্যাগ করে ফিরে আসেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৮৭ সালের বর্ষশেষে। সাড়ে তিন যুগের অধিককাল কৃতিত্বের সঙ্গে অধ্যাপনা করে অধ্যাপক ভট্টাচার্য সহকর্মী ও ছাত্রসমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। কৃতী ছাত্রদের প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। ছাত্রবৎসলতা ছিল তাঁর চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট অঙ্গ। কর্তব্যপরায়ণতা ছিল তাঁর স্বভাবধর্ম। অপ্রিয় সত্য কথা বলতে তিনি কখনো কুণ্ঠিত হতেন না। বস্তুত, সমকালীন অধ্যাপক সমাজে স্থিতধী পণ্ডিত হিসাবে তাঁর নাম এপার বাঙলা এবং ওপার বাঙলায় পরম শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন শরৎ সমিতির সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি, বাংলা আকাদেমির কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন রবীন্দ্ররচনাবলীর উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য।

বাঙলা সাহিত্যে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় তাঁর নাম বিশেষ স্মরণীয়। "চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান" যে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র রচনা, একথা তিনি প্রমাণ করেছেন। অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছেন, '"চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান" যে পাদরি লালবিহারী দে-র রচনা সে বিষয়ে আমি বইটির উদ্ধারকর্তা ও সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমান্ দেবীপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে একমত।'

তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি দুভাগে বিভক্ত: সম্পাদনা এবং মৌলিক রচনা। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে "রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান" ছাড়া "রবীন্দ্রনাথ", "গিরিশ রচনাবলী", "শরৎ রচনাবলী", "আশুতোষ চৌধুরীর প্রবন্ধসংগ্রহ", মীর মশাররফ হোসেনের "আমার জীবনী" এবং "রাজনারায়ণ বসুর হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে (১৯৬১) 'পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি' বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকগণের রচনা সংকলন করে যে "রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থ প্রকাশ করেন তার সম্পাদনার ভার অর্পিত হয়েছিল দেবীপদ ভট্টাচার্যের ওপরে। সাহিত্য সংসদ থেকে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত "গিরিশ রচনাবলী"র

সম্পাদনায় তিনি নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্রের যে মূল্যায়ন করেন তাতে আবেগ-উচ্ছ্বাসের লেশমাত্র ছিল না। শরৎ সমিতি পাঁচ খণ্ডে শরৎচন্দ্রের যে রচনাবলী প্রকাশ করেন, তার সম্পাদকত্রয়ের অন্যতম দেবীপদ ভট্টাচার্য। এই রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডে "শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি" তাঁরই রচনা। রাজনারায়ণ বসুর "হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত" পুস্তিকার আকারে রচিত হলেও বিষয়বস্তুতে গুরুত্বপূর্ণ। আশুতোষ চৌধুরীর "প্রবন্ধসংগ্রহ" এবং মীর মশাররফ হোসেনের "আমার জীবনী" অধ্যাপক ভট্টাচার্যের অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় বহন করে। দেবীপদর মৌলিক রচনা "উপন্যাসের কথা" (১৯৬১), "বাংলা চরিতসাহিত্য" (১৯৬৫) এবং "রবীন্দ্র-চর্যা" (১৯৭৩)।

"উপন্যাসের কথা", লেখক বলেছেন, 'সাধারণ পাঠকের জন্য লেখা, পণ্ডিতদের জন্য নয়।' বইখানি তিন অধ্যায়ে বিন্যস্ত। উপন্যাসের জন্ম, উপন্যাসের বিকাশ এবং বাংলা উপন্যাসের আদিপর্ব। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (১৯৮২) লেখক বলছেন, 'বিংশ শতকের রচিত উপন্যাস পৃথক বই হিসাবে 'উপন্যাসের কথা'-র দ্বিতীয় পর্যায়রূপে পরিকল্পিত হয়েছে এবং সেখানি অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হবে।' কিন্তু আমরা যতদূর জানি, এই দ্বিতীয় পর্যায় বা দ্বিতীয় পর্ব আজো প্রকাশিত হয় নি। সম্ভবত পাণ্ডুলিপিও সম্পূর্ণ হয় নি। গ্রন্থকারের দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ "বাংলা চরিতসাহিত্য" (১৯৬৪) তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত গবেষণাগ্রন্থ। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮২-তে। বিষয়বস্তুর পরিধি হল ১৮০১ থেকে ১৯৪১। গ্রন্থকারের মতে চরিতসাহিত্যের ঐশ্বর্য-যুগ হল ১৮৮১ থেকে ১৯১৮। গ্রন্থের শেষভাগে লেখক 'চরিতসাহিত্যে নতুন সম্ভাবনা'র ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চরিত-সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় গ্রন্থখানি উপাদেয় হয়েছে।

দেবীপদ ভট্টাচার্যের রচনাবলীর মধ্যে "রবীন্দ্র-চর্যা" [১৯৭৩] গ্রন্থখানি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম সংস্করণে ছিল পনেরোটি প্রবন্ধ। দ্বিতীয় সংস্করণে [১৯৮৫] তিনটি নতুন প্রসঙ্গ যুক্ত হয়েছে: 'শুন নলিনী', 'অচলায়তন প্রসঙ্গ' এবং 'আয়ার্ল্যাণ্ড, বঙ্গদেশ ও রবীন্দ্রনাথ'।

রবীন্দ্র-চর্যার বেশির ভাগ প্রবন্ধই গবেষণামূলক। নতুন কোনো কথা বলার না থাকলে দেবীপদ লেখনী ধারণ করতেন না। অক্লান্ত পরিশ্রমে নির্ভুল তথ্যসংগ্রহ তাঁর গবেষণায় লক্ষণীয় দিক।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের 'আয়ার্ল্যাণ্ড, বঙ্গদেশ ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারত ও আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্পর্ক ও সংযোগ বিষয়ে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের এটিই প্রথম খসড়া। কিছুদিন আগে কালীঘাটের রবীন্দ্রচর্চাভবনে একটি স্মারক বক্তৃতারও ছিল এই একই বিষয়। চতুরঙ্গেও মে '৮৭ সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও অ্যানি বেশান্ট্' এই সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আসলে এই বিষয়ে তাঁর হাতে প্রভূত উপাদান সংগৃহীত হয়। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এই দিক নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয় নি। অথচ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের হাতে একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার মালমসলা পুঞ্জীভূত হয়েছিল। তিনি নিপুণ নিষ্ঠায় এগুলি সজ্জিত করে রেখেছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশ ভাঙনের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা ভুলে গিয়ে তিনি এই গ্রন্থ রচনার জন্য নতুন-নতুন তথ্যের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি এই সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের সঙ্গে পরামর্শ করেন। পরিতাপের বিষয়, তাঁর সারস্বত জীবনের শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার সুযোগ তিনি পেলেন না। পরিশীলিত মননশক্তি এবং নব-নব কর্মস্পৃহা অটুট থাকা সত্ত্বেও শারীরিক অপটুতার জন্য জীবনাবসান যে অনুশোচনার বিষয়, অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্যের মৃত্যু পুনরায় আমাদের সেকথা স্মরণ করিয়ে দিল।

জগদীশ ভট্টাচার্য

গ্রন্থসমালোচনা

হাসান আজিজুল হকের প্রবন্ধ

গোপাল হালদার

বাংলাদেশ সাহিত্য-আলোচনায় কতটা ভাবে, ভাষায় নিজস্বতা অর্জন করেছে, "কথাসাহিত্যের কথকতা" তার এক বিস্ময়কর নিদর্শন। নানা দিক থেকে তা তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু বিষয়বৈচিত্র্যের জন্যই নয়, এই স্বল্পায়তন গ্রন্থখানির আশ্চর্য সৌষম্য (বা ব্যালান্স) এবং প্রসাদগুণ একত্র হয়ে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের নবজাগ্রত চেতনায় সেখানকার সমাজ-সচেতন লেখককুল স্ব-স্ব আন্তরিকতা, ভাবনার জন্যই বিশেষভাবে আমাদের চোখে পড়েন; আমার মতো এখানের কোনো-কোনো বাঙালি পাঠককে বর্তমান গ্রন্থখানি আশান্বিত করেছে। নানারকমের বিষয়বস্তু নিয়ে এক-এক রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তাতেও লেখকরা প্রায় সকলেই রসোত্তীর্ণ ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা পান। ভাবের সততা ও ভাষার বলিষ্ঠতা পরস্পরের সহযোগিতায় লেখককে উত্তরোত্তর পূর্ণতর পরিচয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়—তাঁর আত্মানুসন্ধান ও পাঠকের স্বীকৃতি দুই-ই এক হয়ে ওঠে। নানা কারণে যদি এ মতামত সামান্য একটু একদেশদর্শী হয়ে ওঠে, তাতে আমি আশ্চর্য বা দুঃখিত হব না। কারণ কয়েকটি উপন্যাস (শওকত ওসমান, রিজিয়া রহমান-ই বেশি), গল্পগ্রন্থ (শওকত ওসমান প্রমুখ অনেকে), সমালোচনা ও ইতিহাসাশ্রিত আলোচনা (আবদুল হালিম, নূরন্নাহার বেগম, মালেকা বেগম, আবুল ফজল, অধ্যাপক সিদ্দিকী, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান), কাব্যসংগ্রহ ও অনুবাদ এবং বিশেষ ধরনের শিশু-সাহিত্যের (এখলাসউদ্দিন আহমদ প্রমুখ) বেশকিছু রচনা পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্রদত্ত তালিকা যে অসম্পূর্ণ ও একপেশে, সে ত্রুটি আমাদের অনিচ্ছা-কৃত বলে মনে করি। কারণ, একদিন যা আমার স্বদেশ-স্বভূমি ছিল, দৈব-দুর্বিপাকে বা রাজনীতির কোপে আমি আর তার সুখদুঃখ-সমন্বিত জীবনধারার অঙ্গীভূত নই বলে যতটুকু পরিচয় ভেসে-ভেসে হাতে আসে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কিন্তু বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনও হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-সমাজ থেকে, বাংলাদেশের হৃদয় থেকে অপ্রতিহত গতিতে যে লেখককুল ভাব-গৌরবে ভাষার সৌকর্যে আমাদের আদরণীয় ও বরণীয়, মানুষ হিসাবে তাঁদের নমস্কার জানাই। অভিনন্দিত করি বাঙলা ভাষায় তাঁদের অবদানকে।

বাংলাদেশের রচনাসম্ভারে কখনও এমন লেখা পেয়েছি যা অত্যন্ত শক্তিশালী। কারো লেখা পড়ে মনে হয়েছে লেখক বা লেখিকা বহুশ্রুত এবং আপনাপন অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখাকে সমৃদ্ধ করেছেন। অসাধারণ সাহস ও মনস্বিতা একত্রে যুক্ত হয়েছে কোনো-কোনো লেখায়। কোথাও আছে আত্মবিশ্লেষণ, আত্মপরীক্ষণ তথা আত্মোত্তরণও। এই শেষোক্ত প্রকারের সঙ্গে কয়েকটি ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে আশ্চর্য একপ্রকারের সুষমা, যে কথা আমি আগেই উল্লেখ করে এসেছি। আলোচ্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের বিশেষত্ব সেইখানে। এ সুষমা-সৌরভ শুধুমাত্র ভাবনা ও ভাষার সমন্বয় নয়; এ হল একপ্রকার আত্মোত্তরণের প্রয়াসের সমুজ্জ্বল ইতিহাসও। মানুষ যে সর্বপ্রথম মানুষ এবং সে-মানুষ নিশ্চয়ই তার পারিপার্শ্বিক দেশকাল নিয়েই গঠিত। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই সে সেই বিশিষ্ট দেশকালপারি-পার্শ্বিকের গণ্ডিকে প্রসারিত করে বিশ্বনাগরিকত্ব তথা

কথাসাহিত্যের কথকতা—হাসান আজিজুল হক। একুশে, কলকাতা ৭৩। কুড়ি টাকা। প্রথম প্রকাশ: ১৯৮১ ঢাকা। 'একুশে' সংস্করণ ১৯৮৯।

বিশ্বমানবিকতার ক্ষেত্রে উন্নীত হয়। এই প্রসার্যমান মানবিকতা বা হিউম্যানিজম সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যেকার একটি নিত্যপ্রবাহিত অবিস্মরণীয় ধারা। মরহুম আবুল ফজলের রচনাধারায় সেই আশ্চর্য উন্নয়ন (তাঁর "দুর্দিনের দিনলিপি") দেখে অপ্রত্যাশিত আনন্দ-বিস্ময় অনুভব করেছিলাম। সেই ধরনের লেখার ধারাকে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক আরো এগিয়ে নিয়ে এসে আমাদের মর্মস্পর্শ করেছেন বলে মনে হল। অনতিক্রান্ত-যৌবন হলেও হাসান আজিজুল হক বহুশ্রুত। কিন্তু সেটুকুমাত্র তাঁর পরিচয় নয়। দেখার সৌভাগ্য না-হলেও শুনেছি তিনি কথাসাহিত্যিকও। এগ্রন্থে তাঁর সাতটি প্রবন্ধ গত দশ-বারো বৎসরে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা লেখাগুলির একটি সঙ্কলন। প্রকাশককে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি তিনি এই গ্রন্থ এদেশের পাঠককে পাঠের সুযোগ করে দিলেন বলে। অবশ্যই এ গ্রন্থ সর্বত্রগামী হবে না। কিন্তু, যেখানে তা প্রবেশলাভ করবে সেখানে 'স্বে মহিম্নি' স্বগৌরবে শুধু যে গৃহীত হবে তাই নয়—পাঠককে তা অনুপ্রাণিত করবে, ভাবাবে, ভালোও লাগবে।

মনে হয়, উভয় বাঙলাতেই বর্তমানে বাঙলা ভাষার শব্দগঠন, শব্দচয়ন ও বৈয়াকরণিক যে উপস্থাপন, এগুলির নীতি বিপর্যস্ত হয়েছে এবং নতুন কোনো সফল-নীতি এখনও চোখে পড়ে না। সেজন্য পূর্বজ লেখক হিসাবে নিজেও উদ্বিগ্নবোধ করি। বঙ্গভাষার পিছনে একটা দীর্ঘকালীন ইতিহাস রয়ে গেছে। ইন্দোইয়োরোপীয় ভাষার কেন্দ্রম গোষ্ঠীর থেকে অবশ্যই পৃথক। আধুনিক ভারত-বাংলাদেশে এই শব্দচয়ন আর বিন্যাসের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চোখে পড়ে ও মনে খটকাও লাগায়। কিন্তু সেদিক দিয়েও এ গ্রন্থের সমন্বয়ধর্ম ভাষাগত বৈষম্যরহিত। বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ এখানে স্ববিরোধী নয়। একথা যে আমার বেশি বলা নয়—মনোযোগী পাঠকও তা উপলব্ধি করবেন, এই আমাদের বিশ্বাস।

ভাবনা-ভাষার আশ্চর্য এক মেলবন্ধনে এই গ্রন্থখানিতে আমরা সাতটি মাত্র সংক্ষিপ্ত, সুপরিণত পরিচয় পাই। এগুলি হল—লেখকের উপনিবেশ, দুই যুগের দেশ মানুষের কথা, দুষ্পাঠ্য কররেখা : আমাদের কথা, সাহিত্য নিয়ে 'এক' বা প্রথম পাঠ। 'দুই' বা দ্বিতীয় পাঠে আছে—'মানুষের মুখ : বিষাদ-সিন্ধু—রবীন্দ্র উপন্যাসে স্বদেশ ভাবনা : গোরা—শরৎচন্দ্র : একালের চোখে—আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ।' বিষয়গুলির বস্তুগত সামান্য সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এ আলোচনা শেষ করব।

গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত। মাত্র একশত বারো পৃষ্ঠার এই বইখানিতে সাতটি নিবন্ধের বিন্যাসেও এক বিশেষ যুক্তি বিদ্যমান। প্রথমাংশের তিনটি নিবন্ধ বস্তুত লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণের প্রক্ষেপ বা প্রোজেকশন, তাতে আত্মক্ষেপ বা রিফ্লেকশনও আছে। এখানে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছ ঋজুতা এসেছে বিশুদ্ধ র‍্যাশনালিজম বা যুক্তিনিষ্ঠতা থেকে। তদ্‌জাত আধুনিকতা ও মানবিকতা অথবা মডার্নিজম ও হিউম্যানিজমও যুক্তিবাদ থেকে প্রসূত বলেই লেখকের আলোচনা আমাদের বিশ্ববীক্ষার দিকেও প্রবৃত্ত করে, 'যেমনটি হওয়া উচিত তাই'—এমনই একটা কথা আমাদের মনে এসে যায়। লেখকের মৌলিকতার উৎস এই যুক্তিনিষ্ঠতায়। উভয় বাঙলার সাহিত্য-ইতিহাসে এজাতীয় রচনা বা লেখকের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই লেখকের বহুশ্রুতি বা প্রচুর অধ্যয়ন। সেইটা তাঁর পথে বাধা হয় নি, বরঞ্চ স্বচ্ছন্দ বিচরণ করার পথে সহযোগী হয়েছে।

প্রথম প্রবন্ধে 'উপনিবেশ' কথাটির সার্থক ব্যবহার আমাদের আনন্দিত করে। মানুষমাত্রেই স্বরূপত অভিযাত্রী এবং সে একা। সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে বা ক্রিয়েটিভ লেখকের চেতনায় এই সচেতন একাকিত্ব অনস্বীকার্য সত্য। অথচ ফলভারানত বৃক্ষের মতো তাকে পথ খুঁজে মানবসমাজে নিজের স্থান পেতে হয় পাঠক-সম্প্রদায়ের কাছে, সহৃদয় হৃদয়সম্বাদিত্ব খুঁজতে

হয়। লেখক বিশিষ্ট একক ও মৌলিক দৃষ্টিকোণের অধিকারী, তবুও তাঁকে সেই নিজস্ব উপনিবেশ খুঁজতে হয়। নিবন্ধের বিন্যাস থেকে এমন ধারণার অবকাশ আছে যে এই উপনিবেশ অবশ্যই সর্বত্র সমভাবে স্থায়িত্বের দাবি করতে পারে না। দ্বিতীয় নিবন্ধটি দুই যুগের দেশমানুষের কথা। এ নিবন্ধ অবাধ গতায়াতে অবিভক্ত তথা বিভক্ত বঙ্গদেশের মূলত ঔপন্যাসিকদের নিয়ে লেখা। এভাবে, খণ্ডিত দুটি প্রান্তের উপন্যাস-সাহিত্যকে এক ঐতিহাসিক অখণ্ডতায় দেখার প্রয়াস ইতিপূর্বে চোখে পড়ে নি। উপন্যাসের কথা বাঙলা সাহিত্যে ভাবতে গেলে প্রাকবিভক্ত চিরায়ত ধারাটির কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না—এ সত্য তিনি জানেন বলেই অনায়াস সততায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যের আলোচনায় অবতীর্ণ হন। আমাদের মনে হয়েছে, এই বিরাট ধারাটির অনুসরণে পারম্পর্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং সেইটাই খুব স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও তাঁর অনুসৃত স্রোতোধারা আমাদেরও চোখে পড়ে এবং সেখান থেকে তিনি কালোপযোগী নব-পরিক্রমাপথে বাঙলাদেশের উপন্যাস-শাখার স্রোতটিকে ঠিকমতো ধরে নিয়েছেন। লেখকের সযত্নচয়নে আমাদের প্রায় সব পরিচিত উপন্যাসকারগণ বাংলাদেশ-প্রাঙ্গণে দেখা দিয়েছেন। একটা নাম অনুল্লেখিত রয়ে গেছে বলে আমি মনে করি। সে নামটি বেগম রিজিয়া রহমানের। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস বহুলপ্রচারিত ও সুলিখিত। যেমন "শিলায় শিলায় আগুন", "ঘরভাঙা ঘর", "একাল চিরকাল" এবং বিশেষ করে সময়োচিতভাবে লেখা দুঃসাহসিক উপন্যাস "রক্তের আখরে"। সময়ের গতির স্বাক্ষর ও প্রায় দলিল-চিত্র হয়েও এসব উপন্যাসের রসোত্তীর্ণতা স্বীকার্য ছিল মনে হয়। তৃতীয় প্রবন্ধটি 'দুষ্পাঠ্য কররেখা' কথাটি নির্মমভাবে সত্য। এখানেও তিনি এদেশ-ওদেশ মিলিয়েই এই মন্তব্য করেছেন যে আজকের দিনের সাহিত্য (কথাসাহিত্য) কোন্ দিকে যাচ্ছে এর গতি-প্রকৃতি অনির্ণেয়। তবু তা আছে, থাকবে। উচ্ছ্রিত অসংখ্য ফেনপুঞ্জের মতো রাশি-রাশি লেখা গল্প-কবিতা-রম্যরচনা-উপন্যাস-ছোটগল্প-বড়গল্প পাশাপাশি দুই বাঙলায় রচিত হয়ে চলেছে—বস্তু প্রায় একই। মূলধারায় প্রাক্‌বিভক্ত বঙ্গদেশের কথাসাহিত্য যেখানে বস্তুপুঞ্জে ঘুলিয়ে উঠছে, সেখানে বরঞ্চ নবজাগ্রত বাংলাদেশে কালসচেতন দায়িত্ববান এক মধ্যশ্রেণী থেকে উত্থিত লেখকবর্গ একরকম শক্তিশালী আশাবাদের দিকে বিবর্তিত অভিযানে চলেছেন এমনও ঠিক মনে হচ্ছে না—তাই ভাগ্যরেখা স্পষ্ট নয় এবং কররেখাও দুষ্পাঠ্য।

দ্বিতীয়াংশে চারটি নিবন্ধ সঙ্কলিত। এগুলি বলা যায় লেখকভিত্তিক। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কাছে মীর মশাররফ হোসেনের "বিষাদ-সিন্ধু"র পুনরুপস্থাপনা ও মূল্যায়ন খুবই বুদ্ধিগ্রাহ্য বলে মনে হয়েছে। ক্লাসিকধর্মী রচনা কিংবা কোনও ক্লাসিকভিত্তিক রচনার এই একপ্রকার সফলতা ও সবলতা আমাদের চোখে না পড়ে পারে না। মহাভারতের চরিত্র কিংবা শেকস্‌পীয়ারের চরিত্রগুলিতে মুখ ও মুখোশ একাকার হয়ে যায়। "বিষাদ-সিন্ধু"র চরিত্ররাও তাই। এজিদ বা জয়নাব চরিত্র অত্যন্ত প্রকট সবল চরিত্র। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো স্নেহান্ধ পিতৃচরিত্র এজিদের পিতা। অতি সহজভাবেই এগুলির আমাদের মনে ছবি আঁকা হয়ে যেতে থাকে। অথচ, আরও একটা কথাও সত্য—মীর মশাররফ হোসেন তাঁর চরিত্র-চিত্রণে যেন এক অপ্রত্যাশিত আধুনিক মানসের পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রগুলির মুখোশ খোলা সর্বদেশকালিক মানবীয় পরিচয় অভিব্যক্তও হয়েছে। "বিষাদ-সিন্ধু"র যোগ্য সমাদর ইতিপূর্বে হয়েছে। তথাপি আমরা লেখকের কাছেও একপ্রকার কৃতজ্ঞতা অনুভব করি। যে শুদ্ধ যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা পূর্বে বলেছি, লেখক তার অধিকারী হিসাবে এই দেশকাল-পরিব্যাপ্ত অথচ দেশকালাতীত সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর মতে

"বিষাদ-সিন্ধু" উপন্যাস,—এটি তাই ইতিহাসও নয়, ধর্মতত্ত্বও নয়।

পরবর্তী আলোচনাটি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা—যা "গোরা" উপন্যাসে দেখা যায় তাই নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা নিয়ে পরস্পর-বিরোধী কয়েকটি মতবাদই আছে। কারো মতে তিনি স্বদেশী-ভাবনাপুষ্ট ছিলেন সেই হিন্দুমেলার সময় থেকে, বিশেষ করে তা ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়ার সঙ্গে সংযুক্ত। কারো মতে তিনি সহিংস বিপ্লববাদের বিরোধী ছিলেন। অথচ যে-কোনও মহৎ লেখক কিংবা অন্তত সৎ লেখককে তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে সমাজ-সচেতন ব্যক্তি হিসাবে গঠিত ও বর্ধিত রূপে না-লক্ষ করে পারা যায় না—রাজনারায়ণ বসুর গুপ্ত দলে তিনিও ছিলেন। সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্ররচনার অনুধ্যান ও অনুসন্ধান দ্বারা এই সত্যই পুনরাবিষ্কৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের সকল কর্মকাণ্ডেই একপ্রকার সৃজনীশক্তি অভিব্যক্ত হত। তাঁর সমাজভাবনা তাই কখনও সমাজ-সংস্কার হয়ে ওঠে নি, যেমনটি দেখা যায় চতুরঙ্গের শচীশের জ্যেঠামশাই চরিত্রে। এমন চরিত্রের আধার তাঁর চোখে-দেখা পাশে-থাকা মানুষ-দের মধ্যেই ছিল। তেমনভাবেই সেই সমাজচেতনার সঙ্গে তৎকালীন রাজনৈতিক ভাবনা যুক্ত না হয়ে পারে নি। তিনি তো পরাধীন ভারতে সিপাহি বিদ্রোহের ঠিক পরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এরূপ উত্তরাধিকার থাকা সত্ত্বেও তিনি সামগ্রিকভাবে যুক্তি দিয়েই বুঝতেন যে তথাকথিত র‍্যাডিক্যালিজম-নিহিলিজম-টেররিজম দ্বারা সার্বিক দেশোদ্ধার সম্ভব হয় না—পরাধীনতার মুক্তি হয় না। তাকে অর্জন করতে হয় বুদ্ধির মুক্তি দিয়ে এবং মুক্তির বুদ্ধি দিয়ে। এই পথও ক্রমপ্রসার্যমান। এই ক্রমমুক্তির পথটিই এক মহৎ মানবমুক্তির উদারতায় "গোরা" উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে। বস্তুত "গোরা" উপন্যাসের পরে রবীন্দ্রনাথের শুধু নয়, বাঙলা ভাষায় রচিত বহু উপন্যাসই ম্লান বোধ হয়। লক্ষ করলে বোঝা যায়, এই মানবমুক্তি লোকভয়-রাজভয়-মৃত্যুভয় এগুলিকে অতিক্রম করে চলে যায় এক প্রসন্ন বিষণ্ণ-তার মাধুর্যমণ্ডিত জীবনবাদের দিকে। আনন্দময়ী চরিত্রটি হল তারই প্রতীক—রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল রাজনীতিতত্ত্বের তিনি এক সমন্বয়প্রতীক। জীবন একটা সিম্ফনির মতো মহৎ গভীর গম্ভীর। আত্ম-প্রকাশ, এবং রাজনীতির প্রবক্তারাও মূলত মানুষ—এই হল "গোরা" উপন্যাসের মর্মকথা। স্বদেশ-ভাবনার ভাবুকগণ তাই কেউ-ই উৎকেন্দ্রিক হতে পারেন না, এবং শুধুমাত্র পুনরাবৃত্তির ঘূর্ণাবর্তেও পাক খান না। লেখকের মতের একটা বড়ো অংশের সঙ্গে আমরা তাই সহমত হই। এই গোরা জন্মসূত্রে সাহেব—যাদের বিরুদ্ধে এদেশের একটা বৃত্তের লোকের মতো সেও লড়াই করে। অথচ তার ভাগ্য-সূত্রে সে নিজেই সাহেব। সুতরাং কর্মসূত্রে তাকে মহাভারতীয়ত্ব অর্জন করতে হয়। একটা মহৎ দ্বন্দ্ব-সমুত্তীর্ণ মহাপথের পথিক হয়েও সে ভারতপথিক। 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীর' নাহলে মানুষ যে মানুষও হতে পারে না, রবীন্দ্রনাথ তা মানতেন, তাঁর আশ্চর্য মননশীলতা তাঁকে কোথাও মাথা নত করতে দেয় নি; আবার আপনার অর্জিত গৌরবে মাথা উঁচু করে স্পর্ধা না করে আপন মর্যাদায় তিনি চলতে পারতেন। তাঁর সুহৃদজনের মধ্যে তৎকালে নিবেদিতা চরিত্রের ছায়া গোরা চরিত্রে অনুসৃত হয়েছে কিনা এটা ভাববার মতো। রবীন্দ্র-রাজনীতিও সৃজনাত্মক নীতি—সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতা থেকে তা প্রসারিত হয়,—এক বিশ্বাত্মবোধির সত্যে উপনীত হয়। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এ সত্যকে 'নিজের মত' করে নয় যুক্তির সর্বত্রগামিতা দিয়ে উপলব্ধি করেছেন।

লেখকের আর-একটি নিবন্ধ এ-গ্রন্থে বিধৃত—এটির নাম 'শরৎচন্দ্র একালের চোখে'। নিঃসন্দেহে বলি, শরৎচন্দ্রের এই মূল্যায়ন প্রয়োজন ছিল। এ মূল্যায়ন দেশে-দেশে, কালে-কালে লেখক নিয়ে সমালোচকদের মনে যথোচিতভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে। শরৎচন্দ্রের কালে নিশ্চয়ই তিনি কিছু মানুষকে সহানুভূতির চোখে দেখেছেন। এ দেখাও তাঁর সত্য। তেমনই সত্য অন্য কথাটাও। ইচ্ছা করলেই তিনি তাঁর তৎকালীন সমাজজীবনের প্রচলিত ধারণার উপরে উঠ.ত পারতেন না—পারেন নি বলেই। তিনি তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে করুণা ও সত্যকার সহানুভূতির চোখেই দেখতে পারেন এই মাত্র। তাঁর স্ত্রী-চরিত্র শুধু নয়, পুরুষ-চরিত্রও সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। যেখানে তা হয়ে উঠেও বা, সেটা আকস্মিক—যেমনটি ঘটে "অরক্ষণীয়া"র অতুল চরিত্রে একেবারে শেষের দিকে। খোসা-ছাড়ানো পেঁয়াজের মতো মানবজীবন তো শুধু সংস্কারের খোসা-ছাড়ানো নিঃশেষিত কিছু নয়, এমন হতে পারে না। সে একটা মানুষ—উত্থান-পতন, সুখে-দুঃখে দোলায়মান মানুষকে বাস্তবপক্ষে আমরা শরৎচন্দ্রের মধ্যে যেভাবে পাই তার চেয়ে স্পষ্টরূপে পাই তাঁর সমসাময়িক হিন্দি লেখক প্রেমচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্পে। শরৎচন্দ্রের রচনায় যুক্তি অনুসরণ করে হৃদয়বত্তাকে। তারা পরস্পর সমবন্ধ নয়। সেই কারণে শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলি আমাদের কাছে তাদের রচয়িতার দয়ার দানে পুষ্ট, ইচ্ছানুসারে সম্ভূত। কিন্তু, তারা আপন গৌরবে স্থিত নয়। শরৎ-চন্দ্র বিধবাকে সহানুভূতিসহকারে তীর্থযাত্রা করান,-বিদ্রোহ করান না। সে বিদ্রোহ তাঁর নিজের মনেও আসে না। অত্যাচারিত ম্লানমুখে নিয়তি মেনে নেয়। শরৎচন্দ্রের লেখকসত্তা এইভাবে দ্বিধাবিদীর্ণ হয়ে তাঁর রচনায় বিধৃত হয়ে আছে। শরৎসাহিত্যের বাস্তবতা একপ্রকার নিষ্করুণ সমাজসচেতন স্থিতিশীলতাকে সমর্থন জানায়—এও না-মেনে পারা যায় না। একালের মননে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এরকম একটি সত্যে উপনীত হয়েছেন যা আমাদেরও ভাবায়। আর তিনি এটি করেছেন শরৎচন্দ্র-রচনাকে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দিয়ে এবং তা থেকে পৃথক পথে সমুত্তীর্ণ হয়ে উভয়তভাবে।

লেখকের শেষ প্রবন্ধটি হল "আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ"। এই বইটি আমাদের পড়া নেই। তাই সম্পূর্ণভাবে লেখকের চোখ দিয়েই সেটিকে দেখতে হয়েছে। বিষবৃক্ষ অমৃতফল দেয় না। অনুমান করি উক্ত লেখক তাঁর চোখে তাঁর দেশ-কাল-সমাজের সকলপ্রকার অপচয়-অপলাপ এবং অত্যাচার-অনাচার-কে কঠিনভাবে কঠোর এবং প্রাকৃতভাষায় সম্মার্জনী চালিয়ে একেবারে দূর করতে চেয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সে প্রয়াসকে সহনশীলতার দৃষ্টিসহ দেখেও তাকে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি জানেন যে এই প্রচণ্ড উদ্ধত প্রতিবাদ আপন গতিতেই বেশি-দূর উঠবে না—ফিরে আসবে মনস্তত্ত্বের অমোঘ বিধানে নিজেরই কাছে এবং তাঁর প্রতীক্ষা থাকে উক্ত লেখকের মননের উত্তরায়ণ প্রকল্পের। এটিই প্রকৃত আশা। যে কোনও দেশের সৎ সাহিত্য মহৎ সাহিত্যের এই হল সাধনপথ—জীবনসাধনা তথা মননের উত্তরণ।

কথা-শেষে আরও একবার লেখককে ধন্যবাদ জানাতে হয়; অনুভব করতে হয় একপ্রকার সাজাত্য তাঁর সঙ্গে। তাঁর মধ্য দিয়ে একধরনের তীর্থস্নান ঘটে বিশ্বমানবিকতার বহমান সলিলে। বলতে ইচ্ছা করে—'Transvalue your values. Go further and always go further'.

অনুলেখিকা : শ্রীমতী অরুণা হালদার

তিন লেখিকা : তিন বিষয়

সৌমেন সেন

লেখেন যিনি অর্থাৎ গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ইত্যাদি যিনি রচনা করেন, তাঁকে কখনো আমরা বলি লেখক,

ঠুমরী ও বাইজী বেবা মুহরী। প্রতিভাস, কলকাতা। ১৯৮৬। কুড়ি টাকা।

রূপে অরূপে ম্যাডোনা—হাসনা বেগম। সচ্চিদানন্দ প্রকাশনী। ঢাকা। ১৯৮৬। পনেরো টাকা।

আমি লুসিয়ঃ উত্তরঃপুরুষ—কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবার্ক, কলকাতা। ১৯৮৮। ছত্রিশ টাকা।

কখনো লেখিকা, নাম দেখে। আলোচ্য তিনটি বইয়ের রচয়িতাদের আমরা লেখিকা বলছি একমাত্র এই কারণেই নয়। শুধু নামেই নয়, অনেক সময় বিষয়েও নারীত্ব ফুটে ওঠে বইকি লেখিকাদের ক্ষেত্রে। মহিলা-ঔপন্যাসিককে আমরা ঔপন্যাসিকা না বললেও তাঁর রচনায় কখনো যে নারীত্ব বেশ বেশিই প্রকাশ হয়, তা অস্বীকার করা যাবে না, ব্যতিক্রম থাকলেও। আলোচ্য বইগুলির ক্ষেত্রে অবশ্য সমস্যা তেমন নেই; তিনজন লেখিকার দুজনের বিষয় নারীকেন্দ্রিক, অন্যজনের নারীকেন্দ্রিকতা ঘোষিত। প্রথম জনের বিষয় ঠুমরী ও বাঈজী; দ্বিতীয়ের প্রসঙ্গ নারীমুক্তি, আর তৃতীয় জন মানুষের বিবর্তন তাঁর বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েও ঘোষণা করেছেন 'কিছুটা নারীকেন্দ্রিকতা' তাঁর অভিপ্রেতই।

অতএব আমাদের এই আলোচনার শিরোনামে এই তিন লেখিকার তেমন আপত্তি থাকবে না বলেই ভরসা করি।

রেবা মুহুরীর "ঠুমরী ও বাঈজী" বস্তুতই একটি অন্তরঙ্গ রচনা। ঠুমরী চর্চা ও শিক্ষার সূত্রে খ্যাতনাম্নী বাঈজীদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের জীবন-অভিজ্ঞতা তিনি যেভাবে জেনেছেন তা জানানোই বইটির প্রকাশ-উদ্দেশ্য। স্বনামখ্যাত অমিয়নাথ সান্যালের কন্যা এবং শিষ্যা, স্বয়ং খ্যাতনাম্নী শিল্পী রেবা মুহুরীর পক্ষে এই অন্তরঙ্গতা এমনই স্বাভাবিক যে তাঁর এই রচনা প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই আশ্চর্য সুখপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ঠুমরী শেখা ও গাওয়ার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা আর সেই সূত্রে খ্যাতনাম্নী ঠুমরী-শিল্পী বাঈজীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা বইটিকে অতিরিক্ত মাত্রা দিয়েছে। ভারি চমৎকার এক রম্যতা বইটির আকর্ষণ। সঙ্গে আছে ঠুমরী সম্পর্কে সহজ আলোচনা। আর কৌতূহলও কি কম মেটে? সিদ্ধেশ্বরীবাঈ, রসুলানবাঈ, বড়ীমোতিবাঈ, বেগম আখতার প্রভৃতির জীবনকথার কিছুটাও তো আমরা জানলাম। আর তাতে অনেক ভুল জানারও অবসান হয়। ঠুমরী কী, তার উৎপত্তিই বা কী, তার ঢঙ ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক জরুরি প্রসঙ্গে বিশারদদের মতামত ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু পাঠকসাধারণের কাছে জানার আনন্দই মুখ্য—লেখিকার উদ্দেশ্যও ছিল তাই। সঙ্গে বাঈজীদের গল্প-কথা। বর্তমান আলোচক সেই পাঠক-সাধারণেরই একজন, তাঁদের আনন্দেরই ভাগীদার।

হাসনা বেগমের রচনার বিষয় তুলনায় জটিল। তবে যখন কোনো রচনায় ব্যক্তিগত স্পর্শ লাগে তখন প্রবন্ধেও একধরনের রম্যতা আসে। একটি গুরুতর প্রবন্ধের বিষয়কে গল্পচ্ছলে বলার জন্যই হয়তো এই রম্যতার আশ্রয়। "রূপে-অরূপে ম্যাডোনা"য় তাই দেশী-বিদেশী কয়েকজন নারীর আসা-যাওয়া, আলাপ-চারিতা, অভিজ্ঞতাবিনিময় আর বিশ্লেষণ। প্রশ্নটা এই: নারীর মুখ্য ভূমিকা কী? হয়তো নারীমুক্তির কোনো ম্যানিফেস্টো রচনা হাসনা বেগমের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু প্রসঙ্গ তা-ই। এসব প্রশ্ন তো তিনিই তুলেছেন: 'মুক্তি কথাটার অর্থ বড় বিস্তৃত বড়ই ব্যাপক। কিসের থেকে মুক্তি। কেন মুক্তি। মুক্তি কী সে মনের মুক্তি? অভিব্যক্তির? অর্থনৈতিক মুক্তির সাথে এই মুক্তির অর্থাৎ নারী-মুক্তির কোথায় সংযোগ?' এই প্রশ্নের উত্তরও যেন তিনি পেয়েছেন; যেমন তাঁর বক্তব্য: 'নারী-মুক্তি কেবল নারীরই মুক্তি নয়—নারী বা পুরুষ নির্বিশেষে এই মুক্তির বাণী পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন।' 'নারীমুক্তির সাথে নারীর অর্থনৈতিক মূল্য অনেকাংশে জড়িত।' 'এই মুক্তি সমগ্র মানবসমাজের মুক্তি।' ইত্যাদি। আবার এমন উক্তিও আছে: 'বাঁচার দুর্বার ইচ্ছেই নারীকে বাঁচিয়ে রাখে নি, তার মাতৃত্বই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, আজো।' গ্রন্থের নামটি কি তাই "রূপে অরূপে ম্যাডোনা"? অথচ তার পাশাপাশিই আমাদের জানানো হয়: 'নারীর মনেও তবু কোথায় যেন সুপ্ত হয়ে আছে একটা প্রবল প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা—নিজেকে অকাতরে নির্মমভাবে বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার পরও কিন্তু সেটা তাকে সর্বক্ষণ পীড়ন করছে।' হয়তো স্বাভাবিক। নারীমুক্তির প্রসঙ্গটি হয়তো এখনো এইভাবেই বিতর্কিত। এজন্যেই রচনাটি বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। হাসনা বেগম শেষকথা বলার চেষ্টাই করেন নি। প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন মাত্র, একজন নারীর (শুধু লেখিকারই নন) অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতায়।

"আমি লুসির উত্তরপুরুষ" একটি জ্ঞানগর্ভ আলোচনার বিষয় নিয়ে সহজ গ্রন্থরচনার চেষ্টা। গ্রন্থের মুখবন্ধে এই কথাই লেখিকা বলেছেন। এমনকী তাঁর ভাষা যে 'বিনোদনের ভাষা', তাও উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি মানুষের বিবর্তন। এই বিষয় নিয়ে তো ভারী-ভারী বই অনেকই লেখা হয়েছে, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার সূত্রেও তার অনেকগুলি, কিন্তু সহজপাঠ্য বই তো তেমন নেই। অন্তত বাঙলা ভাষায় তো বটেই। কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অর্জিত জ্ঞান এমনি সহজ ভাষায় অন্যকে—পাঠক-সাধারণকে—তাঁর ভাষায় 'কিশোরোর্ধ্ব স্ত্রী-পুরুষ'কে—দিতে চেয়েছেন। বর্তমান আলোচক যেহেতু সেইসব ভারী-ভারী বইয়ের আঘাতে বিবশ, তাই এই রচনা প্রকৃতই উপভোগ করেছেন। এবং আশা করতে দোষ কী, তাঁর সঙ্গী হবেন আরো অনেকেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে নারীকেন্দ্রিকতা কেন জরুরি, দরকারই বা কেন, তা বোধগম্য হল না। লেখিকা বলছেন: 'মেয়েদের মনে কিছুটা স্বনির্ভরতা সঞ্চারের জন্য।' হবেও বা। মজা লাগে এই জন্য যে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়কেও গ্রন্থের শিরোনাম রাখতে হয় "আমি লুসির উত্তরপুরুষ"। অর্থাৎ পুরুষ শব্দটি এখানে লিঙ্গহীন, যেমন মানুষের বিবর্তন। কিন্তু এসব তো আবার ভারী কথা-ই। বিষয়টি সুখপাঠ্য বিস্তার পেয়েছে এই আনন্দই পাঠকের এবং তা-ই মূল্যবান।

মনের মধ্যের ছবি

পরিমল চক্রবর্তী

শিল্পমাত্রেই শিল্পীর মনের মধ্যের ছবি। কবিতাও একটি শিল্প; ফলত কবির মনের মধ্যেরই ছবি। কিন্তু কেমন সেই ছবি? অবশ্যই ব্যক্তিগত এবং বিশেষভাবেই ব্যক্তিগত; তবু নিঃসন্দেহেই তা আলোচনা-ও বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। আপাতত যে তিনটি কাব্যগ্রন্থ হাতে এসেছে, সে তিনটির কবিতাগুলির আংশিক উদ্ধৃতির সাহায্যে উদ্ধার করা যাক এগুলির তিন রচয়িতার মনের মধ্যের সেই ছবি, এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা আর বিশ্লেষণ থেকে উদ্ধার করা যাক তার স্বরূপ।

প্রথমেই অশোক বাগচীর "ছুরি ও কলম"। মুখবন্ধ থেকে জানা যায়, তিন পুরুষ ধরেই তাঁরা চিকিৎসক এবং "নবজীবনের গান"-এর কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'স্মৃতির অনুপ্রেরণাতেই' তিনি 'মাঝে মাঝে প্রলাপ-উক্তির মত কবিতা লিখে' ফেলেন। তা ছাড়া, ওই মুখবন্ধে কবি হিসেবে তাঁর 'আনাড়ীপনা'র কথাও তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। অশোকবাবুকে ধন্যবাদ যে তিনি পেশাসূত্রে চিকিৎসক হয়েও নেশা-সূত্রে কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছেন। এবং দ্বিগুণ ধন্যবাদ এই কারণে যে কবিতা রচনার মতো দুরূহ কর্মে তাঁর 'আনাড়ীপনা'র কথাও তিনি শিশুসুলভ সারল্যে স্বীকার করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বয়সে প্রবীণ হয়েও শিশুপ্রতিম এই সারল্য তাঁর পক্ষে, অন্তত এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির রচয়িতা হিসেবে, খুব কৃতিত্বের পরিচয়বাহী হয়ে উঠতে পারে নি।

ছুরি ও কলম—অশোক বাগচী। পৃষ্ঠা ৩৭। দু টাকা।
ভাত খুঁটে খাই—প্রভাতকুমার মিশ্র। শোভনা, কলকাতা ৬। পৃষ্ঠা ১২। তিন টাকা।
ধুলো খাই যদি প্রেম পাই—অরুণকুমার চক্রবর্তী। গোধূলি প্রকাশনী, চন্দননগর। পৃষ্ঠা ৬৪। চোদ্দো টাকা।

কেননা দেহমনের ব্যাধি-আরোগ্যের নিদান হয়তো তাঁর অজানা নয়, কিন্তু মানসলোকের বিশল্যকরণী আধুনিক কবিতার ছলাকলা আজও তাঁর অজ্ঞাত। বক্তব্যের অসংলগ্নতা, বাক্যবন্ধের শ্লথতা, শব্দপ্রয়োগের ভ্রান্তি, বিশেষণের অপপ্রয়োগ এবং স্থানে-অস্থানে উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য—ইত্যাদি, অর্থাৎ যা-কিছু আধুনিকতায় দীক্ষিত কবিদের অপছন্দ—তার অনেক কটিই অনেক কবিতায় অনেক মাত্রায় বিদ্যমান। ফলে, এই কবিতাগুলি পড়ে কোনো কঠোর সমালোচক এমন সিদ্ধান্তেই আসবেন যে, শিক্ষা-নবিশির শেষ ধাপটুকু অতিক্রমের সময় কিংবা সুযোগ—কোনোটাই তিনি এখনও পান নি। তবু, তাঁকে আমি অনুরোধ করব, তিনি যেন নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় না দেন এবং কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আধুনিক কবিতা পাঠের সময় একটু করে নেন। কেননা, আমার বিশ্বাস, ভালো কবিতা লেখার একটিমাত্র পথই আমাদের সামনে খোলা আছে—ভালো কবিতা পড়া। ভালো কবিতা লিখতে শেখার অন্য কোনো পথ আমাদের জানা নেই। এবং আমার ধারণা, যদি তিনি আমার বিনীত পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁর পক্ষে :

গান্ধির সাথে সাথে
শান্তি গেছে ধরাতল ছাড়ি।
('নীল দানিয়ুব তীরে')

এই গভীর সত্যের অগভীর উচ্চারণ, কিংবা :

কিন্তু যতই বয়স বাড়ে ততই দেখি
সমাজের হোমড়াচোমড়া যারা
তাদেরও সবার মুখ অদৃশ্য মুখোসে ঢাকা।
('মুখোস')

এ-ধরনের সর্বজ্ঞাত সত্যের অনর্থক উদঘাটনের পণ্ডশ্রমের পরিবর্তে :

পিঙ্গল সহরে আকাশ—
তোমার ফ্যাকাশে মুখ
যেন এক অ্যানিমিয়া রোগী।
('প্রেমের সমাধি')

কল্প মেদুর বাণীচিত্রায়ণ, অথবা :

স্পীকারের চোঙা মুখে
বকেই চলেছে এক যুবা,
যার ময়লা পাঞ্জাবী-পাঞ্জাবী
বহুদিন পায় নাই সাবানের দেখা।
('মেনহীর')

প্রতিম সাবলীল ভাষার কথন ক্রমশই সহজ ও অনায়াস হয়ে আসবে।

অশোক বাগচী তাঁর 'কলম'কে 'ছুরি'র মতো ধার করে তুলতে পারেন নি, কেননা সেই প্রয়াসে তিনি একাগ্রই হন নি। কিন্তু "ভাত খুঁটে খাই"-এর কবি প্রভাতকুমার মিশ্র, ছুরিধার করে তুলতে না পারলেও, তাঁর কলমকে অন্তত ততখানি ধারালো অবশ্যই করে তুলতে পেরেছেন, কবিতাপদবাচ্য রচনাকর্মের পক্ষে যতটুকু না হলেই নয়। এবং তা যে তিনি পেরেছেন, মাত্র বারো পৃষ্ঠার অতি ক্ষীণাবয়ব এই গ্রন্থিকার প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই তার প্রমাণও তিনি রেখেছেন। কিন্তু আমার এই মন্তব্যে সন্তুষ্ট না হয়ে কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, 'প্রভাতবাবুর কবিতার বৈশিষ্ট্য কী?' তাহলে সেই প্রশ্নকর্তার উদ্দেশে আমার উত্তর, 'অতি সুললিত ভাষায় এক দরদি হৃদয়ের উত্তাপ এই ক্ষীণকায় কবিতাপুস্তিকার রচনাগুলিতে বিকীর্ণ হয়েছে।' এবং শুধু প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্তও উদ্ধার করি এই কবির কাব্য-কৃতিত্বের :

॥ ক ॥

বহুদিন ভাত নেই,
বহুদিন ঘুমোই নি স্নিগ্ধ ভাতের গন্ধে
স্বপ্ন দেখে দেখে।
খই নয়, ভাত রাঁধো, ভাত।
('ভাত')

॥ খ ॥

আমার কোন কাঠ নেই,
এখনো কেনা হয়ে ওঠেনি ;

রাত্রি হলে
আমার সমস্ত ঘর
শুধু জোনাকি আর জোনাকি
যেন স্বপ্নের মতো ভেসে বেড়ায়
কিছু উজ্জ্বল কাঠের রেণু।
('সঞ্চয়')

॥ গ ॥

আমার ছেলে আগুনের পাশে বসে
রোজ আমাকে চিঠি লেখে।
('শীত')

॥ ঘ ॥

কড়াই-এ দুধ তোলার আগে
একবার চোখ মোছে
আর শীর্ণ ছেলেটার বুকের কথা ভেবে
এক গেলাস বেশি জল দেয়।
('জীবনযাপন')

॥ ঙ ॥

একটি শিশুও ··
অঞ্জলি পেতে বসেছে
রাস্তার ধারে
ভাঙা নলকূপটির নিচে।
জল নেই, তবুও।
('অমোঘ')

কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ কথা না জানিয়ে আমি পারছি না যে কয়েকটি কবিতায়, যেমন 'আগুন', 'অপ্রয়োজন' কিংবা 'ফ্রীজ' প্রভৃতিতে—তাঁর কাব্যভাবনা যথেষ্ট পরিস্ফুট নয়, কিছুটা দরকচা-মারা গোছের। তা ছাড়া, 'সুধাপুরের গীর্জা' কবিতায় 'গিয়েছিলে' অর্থে 'গেছলে' শব্দের প্রয়োগও চক্ষু ও কর্ণের পক্ষে রীতি-মতো পীড়াদায়ক। গ্রন্থিকাটির নিরাভরণ প্রচ্ছদটি মনোহরণ।

অরুণকুমার চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থটির নাম "বুলো খাই যদি প্রেম পাই"। নামকরণটি শুধু অদ্ভুত কিংবা তাৎপর্যপূর্ণই নয়, আমাদের অনুভূতির জগতের একটি গভীর সত্যেরও দ্যোতক। সত্যিই তো, এই অরুন্তুদ সংসারে যাঁরা অরুণের মতো প্রেমবুভুক্ষু, তাঁরা যে সত্যিকারের প্রেমের বিনিময়ে ধুলো খেতেও রাজি হবেন, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

এই কবিতাগুলিতে প্রকাশিত অরুণের যে-মনোধর্ম, তা আক্ষরিক অর্থেই একজন বাউলের, যিনি তাঁর ছন্নছাড়া সংসার বলতে পাহাড়-অরণ্য-সাগর-সমন্বিত বিস্তৃত ভূভাগকেই বুঝেছেন। কবি হিসেবে এই মানস-বিস্তারের সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা, যে-কারণে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর কবিতা জীবনের নিখুঁত ফোটোগ্রাফে পরিণত হয়েছে। এবং তাঁর কবিতার এই ফোটোগ্রাফিক ডেপিকশন বহিরঙ্গিক—যেমন :

ক.

মাংসমাখন পেঁচিয়ে আছে শ্যাওলাবরণ শাড়ী।
('জল ভেঙেছে জলের দেয়াল')

খ.

ধনেখালি শাড়ী, টানটান শরীরে প্যাঁচানো, স্মার্ট,
উজ্জ্বল দুরন্ত হরিণী।
('ঐ আসে শিবের সকাল')

কিংবা

গ.

নীলের উঠোনে
কারা উড়িয়ে দিলো আধপোড়া কার্বনমেঘ।
('ঐ আসে শিবের সকাল')

এবং অন্তরাঙ্গিক :

ঘ.

ভুল, শুধু ভুল ভালোবেসে মানুষেরা বেঠিক মাতাল॥
('ভুল ভালোবেসে')

অথবা

ঙ.

সামনে সময় আবহমান, চক্রাকারে
খুঁজছো তুমি, খুঁজছি আমি।
('মৎস্যমিথুন')

এই প্রাণময় গ্রহে মানবীয় অস্তিত্ব অরুণের মনে এমন কতকগুলি জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছে, যেগুলির তাড়না

তাঁকে এই ধরনের পংক্তি-প্রণয়নে প্রাণিত করেছে :

কুষ্ঠের জীবাণুর মতোন এতো লোভ আমাদের চোখে কেন
আজও লেগে আছে।
('সবুজ সন্ন্যাসী')

কিংবা

চূড়ান্ত—জৌলুষ-মদে ঠোঁট রেখে এভাবেই নিজেকে ঠকাও?
('বৃষ্টি আনো কথার শেকড়ে')

আবার কয়েকটি কবিতায় সেই জিজ্ঞাসার উত্তরস্বরূপ কতকগুলি উপলব্ধির— যেমন :

এ-পৃথিবী আজন্ম কাঙাল, অন্নদাস প্রেমের পূজারী
('অন্নদাসী, ভাত দাও')

কিংবা

নির্জন লাবণ্যে স্নান কতোদিন করে নি মানুষ।
('নৈঃশব্দ্যের কবিতা : এক')

অথবা

আমাদের এই অপেক্ষা ··
প্রবহমান এই প্রজন্ম থেকে অন্য এক প্রজন্মের দিকে।
('আলোর কণ্ঠস্বর')

ইত্যাদি। প্রেমের কবিতার লেখক হিসেবে অরুণ বড়ো অভিমানী। এই অভিমানের বশবর্তী হয়েই তিনি তাঁর প্রেমিকাকে বলেন :

তোমার ফসল তোমারই থাক, আমি কেবল
তোমার মাঠে ধান খুঁটে খাই সারা বছর।
('এমনতরো' ইচ্ছেটিচ্ছে')

'জ্যোৎস্নার ফাটলে কার মুখ' এবং 'আঙুরারাধী' কবিতায় নিখুঁত ছন্দের প্রতি তাঁর আনুগত্য ব্যক্তিগত-ভাবে বর্তমান সমালোচকের পক্ষে পরম প্রীতিকর, কেননা একালীন তরুণ বাঙালি কবিদের কাছে কবিতার অঙ্গাভরণরূপে নিখুঁত ছন্দ একেবারেই যোগ্য মর্যাদা পাচ্ছে না।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদ নয়, ছাপা-বাঁধাই মানানসুগ।

সার্ত্র-এর ছেলেবেলার আত্মকথা

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর মনীষা ফরাসি দার্শনিক-সাহিত্যিক জঁা পল সার্ত্র। তাঁর ছেলেবেলার আত্ম-জীবনী "লে মো" (সঠিক বাঙলা রূপান্তরে 'শব্দাবলী' বা 'শব্দগুলি') তিনি রচনা করেছিলেন পরিণত বয়সে। মূল ফরাসিতে এর প্রকাশকাল ১৯৬৪ সাল—প্রখ্যাত গ্রন্থ-প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পারীর গালিমার এটি প্রকাশ করেন। তখন সার্ত্র-এর বয়স ৫৯। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ বের করেন হ্যামিস হ্যামিলটন। ঈরিন ক্লেফান-এর সেই ভাষান্তরই পেঙ্গুইন প্রথম প্রকাশ করেন ১৯৬৭ সালে। গ্রন্থটির অসম্ভব জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর ইতিমধ্যেই পেঙ্গুইন-এর বারোটি মুদ্রণ। বাঙলা ভাষান্তর প্রার্থিত ছিল বহুদিন ধরেই। অবশেষে বইটির প্রথম প্রকাশের প্রায় পঁচিশ বছর পরে বাঙলা অনুবাদ মুদ্রিত হল সাহিত্য অকাদেমির উদ্যোগে। চল্লিশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি লোকনাথ ভট্টাচার্য প্রচুর সময় ব্যয় করে, শ্রম- ও অভিনিবেশ-সহকারে সার্ত্র-এর শৈশব-দিনগুলির আত্মজীবনীর একটি গ্রাহ্য বাঙলা রূপান্তর উপহার দিলেন।

প্রসঙ্গত জানানো যেতে পারে, সার্ত্র-এর "লে মো"র প্রথম বাঙলা রূপান্তরের চেষ্টা করেছিলেন তন্ময় দত্ত। পুরো রচনাটির অংশবিশেষমাত্র অবশ্য প্রকাশিত হয়েছিল 'আন্তর্জাতিক ছোটগল্প' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায়, ১৯৮০ সালে। স্বভাবতই প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাঙলা অনুবাদের গৌরব লোকনাথ ভট্টাচার্যের।

অনন্য ফরাসি কবি র‍্যাঁবো-র জন্মশতবার্ষিকীর বছরে ১৯৫৪ সালে লোকনাথ ভট্টাচার্য অনুবাদ করে-ছিলেন "নরকে এক ঋতু" (Une Saison En Enfer)। র‍্যাঁবো-র কবিতার সেই চমৎকার ভাষান্তরের স্মৃতি এখনো আমার কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায় নি। আর সেই গ্রন্থের প্রাক্‌কথনে র‍্যাঁবো-র জীবনের যে নিপুণ আলেখ্য নির্মাণ করেছিলেন, তাও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। লোকনাথ ভট্টাচার্যের করা অনুবাদ "শব্দ" পড়তে গিয়ে প্রাথমিকভাবে সেই প্রিয়স্মৃতি মনে এসেছিল।

শৈশবের দিনগুলি-রাতগুলির অজস্র ঘটনা—কোনোটি হালকা মজার, কোনোটি গভীরগম্ভীর, আবার কোনোটি নিতান্তই সাদামাটা। সেইসব ছোটোবড়ো নানা ঘটনার প্রেক্ষাপটে পারিবারিক আনন্দবেদনা, আশা-হতাশা, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন—সবই লিখেছেন সার্ত্র নিহিত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। নিজের নৈঃসঙ্গ, ক্লান্তিহীন পড়াশোনা, অবিশ্রাম লেখা, পিতার মৃত্যু, মায়ের ও দাদামশায়ের অবিরাম প্রশ্রয় ও অনুরাগ, প্রথম স্কুলে পড়তে যাওয়া, শ্রুতিলিখনের ভ্রান্তি, স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে আনা, গৃহশিক্ষক নিয়োগ, পরে আবার স্কুলে ভর্তি হওয়া, সুযোগসন্ধানী বন্ধুদের পরিত্যাগ করা—ইত্যাকার বিষয় নিয়ে সার্ত্র লিখেছেন তাঁর অনন্য বাক্‌শৈলীতে। শৈশব যে খুব ঘটনাবহুল তা নয়, কিন্তু প্রতিটি ঘটনার বিশ্লেষণ এবং আন্তর প্রতিক্রিয়া লেখাটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। ফলত, মূল লেখাটিকে সময় নিয়ে তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করে নিতে হয়। সার্ত্র-এর শৈশব ছিল অজস্র বিভ্রমের মায়াজালে ঘেরা। জীবন আর সাহিত্য সম্পর্কে ছিল তাঁর এক ভ্রান্তিময় ধারণা, এবং এরই প্রভাব পড়েছে তাঁর লেখায়। সেজন্যেই তিনি হয়তো লিখেছিলেন—'শিশুকালই সবকিছু নির্ধারণ করে।' পরবর্তী কালে অন্যত্র সার্ত্র বলেছেন—'যদিও আমি চিরকাল বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরোধিতা করেছি, আমার সব রচনাই লেখা হয়েছে এই শ্রেণীর জন্য, এই শ্রেণীর ভাষায়।' এই সত্যভাষণের সক্ষমতা সার্ত্র-এর সমস্ত লেখাতেই ছড়িয়ে আছে। "শব্দ" তার ব্যতিক্রম নয়। তবে অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় এই লেখাটির পাঠ অপেক্ষাকৃত সহজ। বলা যায়, এখানে সার্ত্র অনেক বেশি প্রাণোচ্ছল। প্রগাঢ় উপলব্ধি নির্মল পরিহাসের সাবলীল বাতাবরণে যেন আরও জমাট বেঁধে যায় পাঠকের মনে। মননশীল সার্ত্র এই ছেলেবেলার আত্মজীবনীতে যেন বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন পাঠকের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তার সেতু তৈরিতে। অনেক ঘটনা থেকে উত্থিত গভীর দর্শনও ছড়ানো, কিন্তু প্রসঙ্গের পিঠোপিঠি সেসব স্বীকারোক্তি কী দ্রুত বোধগম্য হয়ে ওঠে। প্রথম ন বছরের জীবনকথা এই "শব্দ"। সার্ত্র লিখেছেন—'আগে বলা হত, গোঁফহীন চুম্বন নুনহীন ডিমের মতো। আমি তাতে যোগ করব : মন্দহীন ভালোর মত, যেমন আমার জীবনটা ছিল ১৯০৫ থেকে ১৯১৪ সালে।' এই 'মন্দহীন ভালো' ব্যাপার যখন তিনি বিশদ করেন তখন তাঁর তির্যক উক্তিতে বিপন্ন বোধ করেন প্রথাপ্রচল পথের পথিক পাঠক।

শৈশবের দু-একটি সম্পর্কের কথা এখানে লিখলে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সার্ত্র-এর চোখে মা বোনের ইমেজ নিয়ে 'ছোট্ট প্রভাতীবান্ধবী' হয়ে রয়ে গিয়েছিলেন। বছর দুয়েক বয়সে বাবা জঁ বাত্তিস্ত-এর অকাল মৃত্যু যে অসম্পূর্ণ অয়দিপাউস কম্পলেক্স ফেলে গিয়েছিল তা তিনি স্বীকার করেছে। লোকনাথ ভট্টাচার্যের অনুবাদে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু পড়ে নেওয়া যাক :—

'···আমাকে দেখানো হয় এক বিপুলাকার তরুণী, বলা হয় এ নাকি আমার মা। আমি হলে তাকে দিদিই মনে করতাম। সেই কুমারীটি যাকে নজরে-নজরে রাখা হচ্ছে, যে সকলের আজ্ঞাধীন, সে রয়েছে আমার সেবার জন্যে, এটি আমি স্পষ্টই দেখতে পাই। ভালো তাকে আমি বাসি, কিন্তু সম্মান করি কী করে, যখন কেউই তাকে সম্মান করছে না? বাড়িতে বড়ো-বড়ো তিনটি ঘর : একটি মাতামহের, একটি মাতামহীর, একটা "বাচ্চাদের"। "বাচ্চারা" মানে আমরা : উভয়েই নাবালক, উভয়েই সমভাবে প্রতিপালিত। কিন্তু সব নজর আমারই দিকে। একটি

শব্দ—জঁা পল সার্ত্র। অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য। সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮৮। কুড়ি টাকা।

তরুণী মেয়ের বিছানা করা হল আমারই ঘরে। মেয়েটি শোয় একলা, ঘুম থেকে জাগে সুশীলার মতো। আমি শুয়েই থাকি যখন সে তাড়াহুড়ো করে স্নানঘরে ঢোকে তার "গামলা" স্নানের জন্যে। বেরোয় যখন, জামাকাপড় সব পরে ফেলেছে। এমন যে জন, সে কী করে আমার জন্ম দিয়ে থাকতে পারে? সে যখন আমাকে দুখের কথা বলে, আমি সহানুভূতির সঙ্গে শুনি। পরে, বিয়ে করে আমি একে রক্ষা করব। সেই প্রতিশ্রুতি তাকে দিই: তার হাত নেব আমার হাতে, আমার তারুণ্যপূর্ণ গুরুত্ব নিয়োজিত হবে তার সেবায়। তাকে আমি মেনে চলব, একথা কেউ ভাবতে পারে? আমি এত ভালো যে তার সব অনুরোধ রাখি। তা ছাড়া, আদেশ সে আমাকে দেয় না, শুধু অল্প কথায় এমন একটি ভবিষ্যৎ চিত্রিত করে যা আমি যেন দয়া করে সত্যে পরিণত করি, আর তার জন্যে তখন থেকেই সে আমার গুণগান গায়: "আমার ছোট্ট সোনা খুব ভালো হবে, কোনো বাড়াবাড়ি করবে না। সে চুপটি করে বসে থাকবে যখন তার নাকে আমি ওষুধ ঢালব।" এইসব নাই-দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণীর ফাঁদে আমি পা দিয়ে ফেলি।'

ছেলেবেলায় দাদামশাই শার্ল শোয়াইজার-এর ভূমিকা সার্ত্র-এর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল—ফলে ফিরে-ফিরেই মায়ের মতোই দাদামশাই-এর কথা এসেছে আত্মজীবনীতে। পঠনপাঠনের প্রাথমিক প্রস্তুতিপর্বে কিংবা লেখালেখির সূচনাতে এঁর সহায়তা ও সমালোচনা প্রয়োজনীয় ছিল। "শব্দ" থেকে এই প্রসঙ্গে কিছুটা অংশ পড়া যাক:—

'বই লেখে যারা, তাদের সম্বন্ধে আমার অবশ্য কিছু জানার দরকার ছিল। দাদামশাই সেটা জানালেন, ভেবেচিন্তে, শান্তভাবে। সেই সুবিখ্যাত লোকদের নাম তিনি আমায় শেখালেন। তালিকাটা নিজের কাছে নিজেই আমি আওড়ে যেতাম, হিসিয়ড থেকে উগো পর্যন্ত, ভুল না করে। সাধুসন্ত ব্যক্তি এঁরা, গুরুকুল। শার্ল শোয়াইৎজার বলতেন, এঁদের তিনি পুজো করেন। তবু এঁরা তাঁকে বিব্রতও করত। এঁদের জোর করে মাথা-গলানো উপস্থিতির ফলে তিনি মানুষের রচনাকে পবিত্র প্রেতের বলে চালাতে পারতেন না। তিনি তাই এক গোপন পছন্দের ভাব অনুভব করতেন সেইসব রচয়িতাদের প্রতি যাঁরা নিজেদের নাম রেখে যান নি, সেইসব নির্মাতার প্রতি যাঁরা তাঁদের ক্যাথিড্রালের অন্তরালে সবিনয়ে লুকিয়েছেন, অথবা সেইসব লোকগীতের অজস্র লেখকের প্রতি যাঁদেরও নাম জানা যায় না। শেক্সপীয়র নিয়ে তাঁর চিন্তা ছিল না, কারণ শেক্সপীয়রের সত্য পরিচয় জানা নেই। একই কারণে তিনি হোমারকে নিয়েও ভাবতেন না। এ দলে আরো কেউ-কেউ ছিল যারা সত্যিই কখনো ছিল কিনা, সেই নিশ্চয়তা পর্যন্ত নেই। অন্য যারা, যারা নিজেদের জীবনের চিহ্নগুলো মুছে ফেলতে হয় চায় নি নয় পারে নি, তাদের ব্যাপারে তিনি কোনো একটা অজুহাত বার করে ফেলতেন, অবশ্য সেইসব লেখক যদি ইতিমধ্যে মৃত, তবেই। কিন্তু সমসাময়িকদের সকলকে তিনি এক-সঙ্গে বরবাদ করে দিতেন; এর ব্যতিক্রম ছিলেন আনাতল ফ্রাঁস ও কুর্তলিন, যাঁদের লেখায় দাদামশাই মজা পেতেন।'

উদ্ধৃতি দুটি থেকে স্বচ্ছ হয়ে যায় দুটি বিষয়। সার্ত্র-এর রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে গিয়েছে যেন এবং লোকনাথ ভট্টাচার্য খুব সাবলীল তর্জমা করেছেন বাঙলায়। সমস্ত গ্রন্থটিই কবি-অনুবাদক বিপুল শ্রম ও সশ্রদ্ধ যত্নে বারংবার পাঠ করে আত্মস্থ করেছিলেন বলেই এমন একটি অনুবাদ উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন। তবে ফরাসি বাক্যবন্ধকে প্রায় নিটুটভাবে বাঙলায় রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন বলে কখনো-কখনো অবশ্য খটখটেও শুনিয়েছে। আবার কোথাও-কোথাও তিনি কিছু স্বাধীনতা নিয়েছেন যা মূল মিলিয়ে পড়তে গিয়ে খটকার জন্ম দিয়েছে। একটি অংশের বাঙলা ও ইংরেজি অনুবাদ পরপর দেওয়া গেল—

'আমরা ফিরে এলাম পারীতে। আর্নুল্ড গালপ্যাঁ ও জঁা দ্য লা ঈরকে আমি ত্যাগ করলাম চিরকালের মতো। আমি তা মনে না করলেও সেই সুবিধাবাদীদের কথাগুলি যে ঠিকই ছিল, তার জন্য আমি তাদের ক্ষমা করতে পারলাম না।'

লোকনাথ ভট্টাচার্যের অনুবাদ।

'We returned to Paris. I gave up Arnould Galopin and Jean de la Hire for good. I could not forgive these opportunists for being right at my expense.

'Words'—Translated by Irene Clephane

পূর্বেই তন্ময় দত্ত যে এই গ্রন্থটির অংশবিশেষ অনুবাদ করেছিলেন তা বলা হয়েছে। এখন লোকনাথ ভট্টাচার্য, তন্ময় দত্ত ও Irene Clephane এর করা অনুবাদের দুটি অংশ পরপর উদ্ধার করা হল:

'যদি বিরোধের মাধ্যমেই নিজের সংজ্ঞা দিতে হয় তো বলব আমি ছিলাম সংজ্ঞাহীন ব্যক্তি। প্রেম ও ঘৃণা যদি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ হয় তো আমার ক্ষেত্রে প্রেম ছিল না কিছুরই জন্য, কারুরই জন্য।'

—লোকনাথ ভট্টাচার্য

'কেউ যদি নিজেকে শুধুমাত্র বিরুদ্ধাচরণের ব্যাখ্যা করতে পারে, তাহলে আমি রক্তমাংসের ব্যাখ্যা না করা একজন, প্রেম এবং ঘৃণা যদি একই মুদ্রার দুপিঠ হয় তাহলে আমি কোনো কিছু ভালোবাসি না এবং কাউকে না।'

—তন্ময় দত্ত

'If a person can define himself only through opposition, I was undefined made flesh and blood, if love and hate are the two sides of the same coin, I loved nothing and no one.'

—Irene Clephane

'আমার ধর্ম আমি আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম: বইয়ের চেয়ে বড় বলে কোনো জিনিসই ঠেকত না। গ্রন্থাগার আমার কাছে ছিল মন্দির। পুরুষের জাতি আমি, বাস করতাম পৃথিবীর ছাদের উপর, সাত তলায়…'

—লোকনাথ ভট্টাচার্য

'আমার ধর্ম আমি খুঁজে পেয়েছিলাম: বইয়ের থেকে বেশী প্রয়োজনীয় কোনো কিছুকে মনে হত না। গ্রন্থাগারকে আমি মন্দিরের মত দেখতাম। জনৈক "পুরোহিতের" নাতি, আমি থাকতাম পৃথিবীর ছাতে, সাত তলায়…'

—তন্ময় দত্ত

'I had found my religion: nothing seemed more important to me than a look. I saw the library as a temple. Grandson of a "priest", I lived on the roof of the world, on the sixth floor…'

—Irene Clephane

কিছু দ্বিধা, কিছু সংশয় বর্তমান আলোচকের মনে এসেছে বলেই আপেক্ষিক বিচারের জন্য কয়েকটি সমান্তরাল অনুবাদের অংশ উদ্ধার করা হয়েছে। তবু একথা স্বীকার না করা অত্যন্ত অনুচিত হবে যে, লোকনাথ ভট্টাচার্য এত বড়ো গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন যথেষ্ট সক্ষমতায়। সময়-সময় মনেই হয় নি একটি ভাষান্তর পাঠ করে চলেছি। অনুবাদকের মূল ও লক্ষ্য—দুটি ভাষাতেই অধিকার প্রশ্নাতীত বলেই তা সম্ভব হয়েছে। হয়তো যে কটি ক্ষেত্রে তিনি আমার মনে দ্বিধার জন্ম দিয়েছেন তা শেষ সময়ের সংস্কারে এড়িয়ে যাওয়া তাঁর মতো বিদগ্ধ অনুবাদকের কাছে কিছু পরিশ্রমের ছিল না। আরেকটি কথা। সামান্য ফরাসি জ্ঞান নিয়ে কিছু বলতে যাওয়া আহাম্মকি নিশ্চয়, কিন্তু এটুকু বলতে চাই যে 'বোদলেয়ার' বা 'ভলতেয়ার' না লিখে সম্ভবত বদলের বা ভলতের লেখা ফরাসি উচ্চারণের প্রেক্ষিতে ঠিক হত।

একটি প্রস্তাব পরিশেষে রাখা যেতে পারে। যেহেতু মূল রচনাটি সার্ত্র-এর মতো একজন প্রখ্যাত

সাহিত্যিকের ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ, সেহেতু অনেক রূপকথা, রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের উল্লেখ, অনেক সাহিত্য-চরিত্রের অনুষঙ্গ এবং অনেক সাহিত্যিকের নাম স্বাভাবিকভাবে এসেছে। বাঙালি পাঠকের এক বিরাট অংশের কাছে সেসব অচেনা ঠেকবে। তাই অপরিচয়ের এই গুণ্ঠনটুকু সরিয়ে দেওয়ার জন্যে গ্রন্থ-শেষে যদি টীকাটিপ্পনী থাকত তাহলে খুবই উপকৃত হওয়া যেত। আগামী মুদ্রণে যদি কবি-অনুবাদক এই সংযোজনটুকু উপহার দেন তাহলে এই অনুবাদ-গ্রন্থটির মর্যাদা ও উপভোগ্যতা যে বাড়বে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

এত স্বল্পমূল্যে অসাধারণ ছাপা আর বাঁধাইয়ে সাহিত্য অকাদেমি "শব্দ" প্রকাশ করে আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন নিশ্চয়ই। এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদটির দাম প্রায় এর সাড়ে চার গুণ। সাহিত্য অকাদেমির এমনি আরো উচিত প্রচেষ্টার দিকে আমরা আগ্রহী হয়ে থাকব।

বিতর্ক

মিখাইল গোরবাচেভ কি আদৌ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতা?

মিহির মিশ্র

যোসেফ স্তালিন তাঁর মৃত্যুর বছর দুয়েক আগে লিখেছিলেন যে, 'ঘটনা হল এই যে আমরা যারা নেতৃস্থানীয় মূলাংশ, তাদের সঙ্গে প্রতি বছর হাজার-হাজার নতুন ও তরুণ শক্তি এসে যুক্ত হচ্ছে। এরা গভীর আগ্রহ নিয়ে আমাদের সাহায্য করতে চায় এবং নিজেদের উপযুক্ততা গভীর আগ্রহসহকারে প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু এদের যোগ্য মার্কসবাদী শিক্ষা নেই। বহু সত্য যা আমাদের ভালোভাবে জানা, তা এদের কাছে অপরিচিত। আর তাই এরা অন্ধকারে হাতড়াতে বাধ্য। এরা সোভিয়েত সরকারের পর্বতাকার সাফল্যে হতচকিত, সাভিয়েত ব্যবস্থার অসাধারণ সাফল্যে এদের চোখ গেছে ধাঁধিয়ে এবং তারা কল্পনা করে যে সোভিয়েত সরকার "যা খুশি" করতে পারে, "কিছুই তার সাধ্যাতীত নয়", সে বৈজ্ঞানিক নিয়মের অবসান ঘটাতে পারে এবং নতুন নিয়ম গড়তে পারে। এই কমরেডদের নিয়ে আমরা কী করব? তাদেরকে কিভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে শিক্ষিত করে তুলব? আমি মনে করি যে, তথাকথিত "সকলের জানা" সত্যকে বার-বার উল্লেখ করা ও ধৈর্যসহকারে ব্যাখ্যা করা এই কমরেডদের মার্কসবাদে শিক্ষিত করে তোলার পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি উত্তম পন্থা।' ("ইকনমিক প্রবলেমস অব সোশ্যালিজম ইন দি ইউ.এস.এস.আর."; ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজেস প্রেস, পিকিং, ১৯৭২, পৃ ৮-৯)

তিনি ওই পুস্তিকায় আরো লিখেছিলেন যে, সেই কারণে একটি তত্ত্বগতভাবে সমৃদ্ধ রাজনৈতিক অর্থনীতি বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক একান্ত দরকার। '...রাজনৈতিক অর্থনীতি সংক্রান্ত একটি ভালো মার্কসবাদী পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশ কেবলমাত্র স্বদেশেই রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ নয়, সঙ্গে-সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর দারুণ গুরুত্ব আছে।' '...এতে অবশ্যই আমাদের দেশের অর্থনীতি এবং পুঁজিবাদ ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত সবকটি মৌল বিষয় থাকবে।' 'প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, বিদেশের বেশির ভাগ কমিউনিস্ট পার্টির মার্কসবাদী বিকাশের স্তরের অনুপযুক্ততার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের একটি পাঠ্যপুস্তক বিদেশের কমিউনিস্ট কর্মীদের পক্ষে দারুণ কাজে লাগতে পারে যদিও তাঁরা আর তরুণ নন।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৪৬-৪৭)

যোসেফ স্তালিন যখন এই কথাগুলি লিখেছিলেন তখন বর্তমান সোভিয়েতপ্রধান মিখাইল গোর্বাচেভও ওই তরুণ হতচকিত পার্টিকর্মীদের একজনমাত্র। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান সময়ের বহুলাংশ ওই একই প্রজন্মের। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষায় একটি প্রজন্মের পশ্চাৎ-পদতার ঐতিহাসিক কারণগুলির মধ্যে প্রধানতম ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল।

অবশ্য ধারাবাহিকতা খুঁজতে আরো পিছিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিবাদী শক্তিরূপে লেনিনের নেতৃত্বে যে বলশেভিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল তার যথার্থ শক্তি, প্রভাব এবং চরিত্র বিশ্লেষণ করা দরকার। দেখা উচিত, লেনিনকে সামনে রেখে যেসব বুদ্ধিজীবী বিদেশে বসে বিতর্ক ও তত্ত্ব

নির্ধারণে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁদের যথাযথ শ্রেণীচরিত্র কী ছিল। তাঁরা কি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে, নিজ-নিজ শ্রেণীচরিত্র বর্জন করে, প্রলেতারীয় চরিত্র অর্জন ও মার্কসীয় শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন? সর্বোপরি, ক্ষমতাদখলের পর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নয়াব্যবস্থা কায়েম করার প্রশ্নে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ, গ্রাম ও নগরের স্বার্থ, পশ্চাৎপদ এশীয় ও অগ্রবর্তী য়োরোপীয় জাতিগুলির স্বার্থ এবং বলশেভিক পার্টিকে সংহত করার কাজ, আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ; অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞান, শোষিত মানুষের বাহিনীকে বৈপ্লবিক শক্তিতে উন্নীত করে তোলা; পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণসঙ্কটজনিত কারণে সম্ভাব্য পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনার পটভূমিতে রাষ্ট্রকে সকল দিক থেকে শক্তিশালী করে তোলা, আবার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য ভোগ্যপণ্য সৃষ্টি ইত্যাদি-ইত্যাদি নানামুখীন বৈরী ও অবৈরী দ্বন্দ্বের সমাধান করার সঙ্গে-সঙ্গে পার্টিকর্মীদের মার্কসীয়-লেনিনীয় চেতনার বিকাশ ঘটানো এবং আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতিতে নেতৃত্ব দেওয়া—এই সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করা দরকার।

সমগ্র বিচারটিই করতে হবে বিষয়ী-গত দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে, বস্তুগত বা বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। করলে দেখা যাবে যে, ঐতিহাসিক কালের বিশেষ অবস্থার দরুন যে সীমাবদ্ধতা, তার থেকে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্ব মুক্ত হতে পারেন নি। সে সীমাবদ্ধতা লেনিনের নেতৃত্বকালেও ছিল। তার উল্লেখ তিনি নিজেই বিভিন্ন লেখায় করেছেন। কিন্তু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের অধ্যয়নকারী-মাত্রই জানেন যে, ঐতিহাসিক কোনো সুনির্দিষ্ট কাল ও পরিস্থিতিতে বহুবিধ দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু সমাধান করার ক্ষেত্রে সমগ্র কাল- বা স্তর-ব্যাপী প্রধান দ্বন্দ্ব সমাধান করার কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন করে বিভিন্ন পর্যায়ের মুখ্য দ্বন্দ্বের সমাধান করা। ক্ষমতাদখলের পরবর্তী কালে সোভিয়েতের বলশেভিকদের প্রধান কাজগুলি ছিল—পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক-রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করা; সমাজতন্ত্র তথা কমিউনিজম যে বিকশিত ধনতন্ত্র ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চেয়ে উন্নততর সামাজিক ব্যবস্থা, তা প্রতিপন্ন করা; শুধুমাত্র তত্ত্বগত ব্যবস্থার প্রয়োগগত রূপদান এবং মার্কস-কল্পিত মানবশক্তির চেতনা ও ক্ষমতার সামগ্রিক মুক্তির প্রয়োজনীয় বস্তুগত পটভূমির আদর্শ স্থাপন করা, এবং সম্পূর্ণ পরিবর্তিত তথা মার্কসীয় চেতনায় উন্নীত নতুন মানুষ তৈরি করা।

ক্রমপর্যায়ে কাজগুলিকে যেভাবে ওপরে দেখানো হয়েছে সেভাবে দেখলে দেখা যায় যে, ক্ষমতা-দখলের পর থেকে লেনিন আর স্তালিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি গৃহযুদ্ধ ও বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কটকালের বছরগুলি ও তার ফলজনিত ধাক্কা সামলাবার বছরগুলি বাদ দিলে সাংস্কৃতিক, আদর্শগত তথা মার্কসীয়-লেনিনীয় চেতনার বিকাশের কাজে বিশেষ মনোযোগ বা নজর দেওয়ার সময় প্রায় পান নি। তথাপি, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেসব পার্টিকর্মীর চেতনার বিকাশ কিছুটা ঘটেছিল, তাঁদের বহুলাংশ দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের কালে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব থেকে বাস্তব রূপকার, সোভিয়েত রাষ্ট্রের রূপকার ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিরোমণি তাত্ত্বিক যোসেফ স্তালিন স্বদেশে ও বিদেশে মার্কস-লেনিনের চিন্তার যথাযথ অধ্যয়নের সমস্যাটি সময়মতোই ধরেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু ও পরবর্তী সোভিয়েত নেতৃত্বের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব পরিত্যাগের ফলে সোভিয়েত রাষ্ট্র নতুন-নতুন সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম

লেনিন তত্ত্বগতভাবে অনেক আগেই দেখেছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার কালে শ্রেণীসংগ্রাম অবলুপ্ত হয়ে যায় না। একটা পর্যায়ের পরে তা তীব্রতর ও বৈরিতা-মূলক রূপ নিয়ে নেবে। তিনি তাঁর ১৯১৭-১৮ সালে লেখা দুখানি বিখ্যাত পুস্তকে এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। "প্রলেতারীয় বিপ্লব ও বিশ্বাসঘাতক কাউটস্কি" গ্রন্থে তিনি লিখেছেন: 'পুঁজিতন্ত্র থেকে সাম্যতন্ত্রে উত্তরণ একটি সমগ্র ঐতিহাসিক যুগব্যাপী ঘটে। যতদিন এই যুগের সমাপ্তি না ঘটে ততদিন পর্যন্ত শোষকরা পুনঃসংস্থাপনের ইচ্ছা অনিবার্যভাবে পোষণ করে এবং এই ইচ্ছাকে পুনঃ-সংস্থাপনের প্রচেষ্টায় রূপান্তরিত করে। তাদের প্রথম শোচনীয় পরাজয়ের পর ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত শোষকরা—যারা নিজেদের ক্ষমতা হারাবার কথা প্রত্যাশা করে নি' সম্ভব বলে কখনও বিশ্বাস করে নি, সেই চিন্তার কাছে নতিস্বীকার করে নি—নিজেদের "নন্দনকানন" উদ্ধার করার জন্য দশগুণ শক্তি বাড়িয়ে, তীব্র হিংসা ও ঘৃণা শতগুণ বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ হল সেই নন্দনকানন যেটা তাদের হাত থেকে চলে গেছে, যেখানে তাদের পরিবারের লোকেরা কত মধুর ও আরামের জীবন যাপন করছিল। তাদের কিনা এখন "ছোটলোকেরা" সর্বনাশ আর দুর্দশায় ঠেলে দিচ্ছে (অথবা "ছোট" মেহনতে···)। পুঁজিবাদী শোষকদের লেজ ধরে পেটি-বুর্জোয়াদের বিরাট অংশ এগোয়। এদের ব্যাপারে সকল দেশেরই দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় প্রকাশিত যে এরা দোদুল্যমান ও দ্বিধাগ্রস্ত, আজ প্রলেতারিয়েতের পেছনে হাঁটে তো কাল বিপ্লবের কষ্টকর জীবন দেখে দৌড় লাগায়; তারা শ্রমিকদের প্রথম পরাজয় বা আধা-পরাজয় দেখলেই ভয় পেয়ে যায়, আস্থাহীন হয়ে পড়ে, উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক ওদিক দৌড়তে থাকে, নাকিকান্না শুরু করে এবং এক পক্ষ থেকে আরেক পক্ষে হাঁকপাঁক করে দৌড়ায়—ঠিক আমাদের মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী-বিপ্লবীদের মতো।' (পৃ ৩৫)

এই প্রসঙ্গে তিনি আরো লিখেছেন তাঁর 'প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে অর্থনীতি ও রাজনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি বলছেন: "প্রলেতারীয় একনায়কত্বের অধীনে শোষকদের শ্রেণীগুলি, ভূস্বামিগণ ও পুঁজিপতিরা, হুম করে মিলিয়ে যায় নি এবং মিলিয়ে যেতে পারে না। শোষকদের বিধ্বস্ত করা হয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয় নি। এখনও আন্তর্জাতিক পুঁজির আকারে তাদের একটা আন্তর্জাতিক ঘাঁটি আছে, যার একটি শাখা তারা। উৎপাদনপদ্ধতির কিছু-কিছু অংশের অধিকার তাদের দখলে, তাদের হাতে এখনও টাকা আছে, তাদের এখনও বিপুল সামাজিক সম্পর্ক আছে। যেহেতু তারা পরাজিত হয়েছে, তাই তাদের প্রতিরোধের শক্তি (বা মনোভাব) শতগুণ সহস্রগুণ বেড়ে গেছে। রাষ্ট্র, সেনাবাহিনী ও অর্থনৈতিক প্রশাসনকলাজ্ঞান তাদেরকে কর্তৃত্ব দেয়, এ কর্তৃত্ব বিরাট; সেই কারণে জনসংখ্যার সংখ্যাগত অনুপাতের তুলনায় তাদের গুরুত্ব তুলনাহীনভাবে বেশি। ক্ষমতাচ্যুত শোষকরা শোষিতের বিজয়ী অগ্রণীবাহিনী অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে যে শ্রেণীসংগ্রাম চালাচ্ছে তা তুলনাহীনভাবে তিক্ততর হয়ে উঠেছে। আর বিপ্লবের ক্ষেত্রে অন্য কিছু ঘটতে পারে না যদি না তাকে সংস্কারবাদী মোহে পরিবর্তিত করা হয় (যা কিনা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সব বীরেরা করেছেন)।' [নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড ৩, পৃ ২৩৭]

সমাজতন্ত্র তথা সাম্যতন্ত্রের বিকাশে মৌল সমস্যা তত্ত্বগতভাবে লেনিন চিহ্নিত করেছেন:

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটলেই এই পরিস্থিতি দূরীভূত হয়ে যায় না। সমাজতান্ত্রিক বিকাশের যুগেও সুবিধাভোগী গোষ্ঠী ও শ্রেণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় না। প্রবল-শক্তিশালী শোষকদের বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল ও পরবর্তী বৈপ্লবিক পরিবর্তনের তাগিদে শোষিত শ্রেণীগুলির ব্যাপকতম অংশকে একটি মঞ্চে সঙ্ঘবদ্ধ করে, এবং প্রধান কর্ম ও মুখ্য কর্ম সম্পাদনের জন্য সকল শক্তি নিয়োগ করে, এবং প্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও গৌণ কর্মগুলিকে পরবর্তী পর্যায়ের কর্মসূচীতে রাখতে বাধ্য হয়। সোভিয়েত বিপ্লবের ক্ষেত্রেও লেনিন-স্তালিন সেই কাজ করেছেন। ঐতিহাসিক অবস্থার সীমাবদ্ধতার দরুন তাঁদের সংস্থাগত প্রশাসনের ওপর বেশি নির্ভর করতে হয়েছে, যে প্রক্রিয়া লেনিন নিজেই শুরু করেছিলেন এবং পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করার কাজ অনেকখানি এগিয়ে নিয়েছিলেন। সোভিয়েত সরকারের শাসনাধীন জনগণের পশ্চাৎপদতা, পার্টি-কর্মীদের মার্কসীয়-লেনিনীয় চেতনার ঘাটতি, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ষড়যন্ত্র ও অন্তর্ঘাত (যার ভূরি-ভূরি প্রমাণ তৎকালীন তথ্য খুঁজলেই পাওয়া যায়) ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সংস্থাগত প্রশাসনের ওপর নির্ভর করা ছাড়া গতি ছিল না; যার অনিবার্য পরিণতি বেশ খানিকটা রেজিমেনটেশন বা সামরিকীকরণ। বস্তুতপক্ষে, হিটলারের বাহিনীর বিপুল সামরিক দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও আধিপত্য লাল ফৌজের হাতে পর্যুদস্ত হয়েছিল সমগ্র সোভিয়েত জনগণের শৃঙ্খলাপরায়ণতা, নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য, দ্রুত কর্মক্ষমতা এবং স্তালিনের নিখুঁত রাজনৈতিক ও সামরিক রণনীতি ও রণকৌশলের কাছে। দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধকালীন তথ্যাদি ঘাঁটলেই এর অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে। সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও কালে উপর থেকে নির্দেশ ছাড়া সমস্যার সমাধান করা যায় না। ভাববাদী ও আবেগাশ্রিত মুক্ত আবহাওয়া ড্রয়িংরুমে কিংবা বিতর্কসভায় মানায়। সমাজপরিবর্তনের কঠিন ও দুর্গম পথে, শ্রেণীযুদ্ধের আবহাওয়ায় সেটা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

স্তালিন আমলের সফলতাগুলি

সুতরাং, এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, গৃহযুদ্ধ আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী পরিস্থিতির মধ্যেও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির স্তালিনকালীন নেতৃত্ব সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ের মুখ্য কর্ম ও সমগ্র কালের প্রধান কর্ম—পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে লেনিনীয় নীতির প্রতিষ্ঠা, গৃহযুদ্ধ ও হস্তক্ষেপের সময় সোভিয়েত রাষ্ট্রকে রক্ষা করা; শিল্পোয়ন; কৃষিবিপ্লব; সোভিয়েত রাষ্ট্রকে নাৎসিবাদী হামলা থেকে রক্ষা করা এবং সমগ্র অর্থনীতি ও জন-জীবনের পুনর্গঠন, এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শোষিত শ্রেণীগুলির সংগ্রামে, নিপীড়িত ও ঔপনিবেশিক জাতিগুলির মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সহায় ও নেতারূপে মার্কসীয় লেনিনীয় ভূমিকা পালন করা সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করেছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে চালিত কোনো পার্টি বা রাষ্ট্র এই আন্তর্জাতিক ভূমিকাকে অস্বীকার করলে সেই পার্টি বা রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী সঙ্কীর্ণতা ও রাষ্ট্রীয় আভিজাত্যের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। কাউটস্কির এ ধরনের স্খলনকেই লেনিন সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বলে চিহ্নিত করেছেন।

দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পর স্তালিন উপলব্ধি করেছিলেন যে

শারীরিকভাবে ধনতন্ত্রের হিংস্রতম রূপ নাৎসিবাদকে পরাজিত করতে গিয়ে সোভিয়েত সমাজে তথা পার্টিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের পৃষ্ঠভূমি তৈরি হওয়ার পরিপূরক মার্কসীয়-লেনিনীয় চেতনার বিকাশ ঘটে নি। তাঁর যে উক্তি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তা ছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে। যুদ্ধের পূর্ববর্তী কালে নিয়োজিত পার্টির কমিশন রচিত পার্টির ইতিহাস প্রকাশ করার মধ্যে রয়েছে সেই ইঙ্গিত। "সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির(ব) ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ" নামে বিদেশের বিভিন্ন ভাষায় বইটি মুদ্রিত হয়েছে। ওই বইটিতে যে বিষয়টির উপর আগাগোড়া গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা হল সমাজতন্ত্র গঠনের ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণের সমস্যাগুলি। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত ওই বইতে স্তালিন-নেতৃত্বকালীন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সঠিকভাবে সোভিয়েত সমাজের শ্রেণীসমস্যার ব্যাপারটিকে তুলে ধরেছিলেন এবং পৃথিবীব্যাপী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। একটু দীর্ঘ হলেও সমকালের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

'কিন্তু পার্টি জানত যে একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সমস্যা ওখানেই শেষ হয়ে যায় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গঠন মানবসমাজের ইতিহাসে একটি বিশাল দিক্-পরিবর্তন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র সংঘের শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের একটি বিজয়, বিশ্বে এক নবযুগের চিহ্ন। তবু এটা হল সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র সংঘের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং সমাজতন্ত্রের বিজয়যাত্রার সমস্তাবলীর একটি অংশ। সমস্তাবলীর অপর অংশ হল তার আন্তর্জাতিক দিক। একটি দেশে সমাজতন্ত্র বিজয় লাভ করতে পারে, এই তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করতে গিয়ে কমরেড স্তালিন বার-বার বলেছেন যে প্রশ্নটিকে দুদিক থেকে দেখতে হবে, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক। প্রশ্নের আভ্যন্তরীণ দিকটির ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, দেশের মধ্যেকার শ্রেণীসম্পর্ক, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র সঙ্ঘের শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকরা তাদের নিজ বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত করতে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজতন্ত্রী সমাজ গঠনে সক্ষম। কিন্তু প্রশ্নের আন্তর্জাতিক দিকটিও রয়েছে। সেটি হল, বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্র, সোভিয়েত জনগণ ও আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের মধ্যে সম্পর্ক। ওই বুর্জোয়ারা সোভিয়েত ব্যবস্থাকে ঘৃণা করে। তারা সোভিয়েত ইউনিয়নে আবার সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সুযোগ খুঁজছে। নতুন-নতুন চেষ্টা চালাচ্ছে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র সঙ্ঘে পুঁজিতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। যেহেতু এখনও অবধি সোভিয়েত ইউনিয়ন হল একমাত্র সমাজতন্ত্রী দেশ, এবং অন্য সব দেশ রয়ে গেছে পুঁজিতন্ত্রী, সেহেতু সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র সঙ্ঘ পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বের দ্বারা বেষ্টিত রয়েছে যার ফলে পুঁজিতন্ত্রী হস্তক্ষেপের বিপদ থেকে যাচ্ছে। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যতদিন এই পুঁজিতন্ত্রী বেষ্টন থাকবে ততদিন পুঁজিতন্ত্রী হস্তক্ষেপের বিপদ থেকে যাবে। সোভিয়েত জনগণ কি বাইরের এই বিপদ নিজেদের চেষ্টায় ধ্বংস করতে পারে? সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র সঙ্ঘে পুঁজিতন্ত্রী হস্তক্ষেপের বিপদ? না, তারা পারে না। তারা পারে না কারণ পুঁজিতন্ত্রী হস্তক্ষেপের বিপদ ধ্বংস করতে হলে তাদের পুঁজিতন্ত্রী বেষ্টনকেও ধ্বংস করতে হবে। আর, পুঁজিতন্ত্রী বেষ্টন ধ্বংস হতে পারে কেবলমাত্র অন্ততপক্ষে বেশ কয়েকটি দেশে প্রলেতারীয় বিপ্লব জয় লাভ করার ফলে। এ থেকে বেরিয়ে আসে যে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র সঙ্ঘে সমাজতন্ত্রের বিজয়, পুঁজিতন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসান ও সমাজতন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে যা অভিব্যক্ত, চূড়ান্ত বিজয় বলে গণ্য করা যায় না। ততখানি করা যায় না যতক্ষণ বিদেশী সশস্ত্র হস্তক্ষেপের বিপদ থাকবে এবং যতক্ষণ সমাজতন্ত্রী দেশের এর বিরুদ্ধে কোনো নিশ্চয়তা নেই…

'এর থেকে বেরিয়ে আসে যে, পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলিতে প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র সঙ্ঘের শ্রমিকশ্রেণীর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বিষয়।' (উক্ত গ্রন্থের পৃ ৪২০-৪২২)

স্তালিন-নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত পার্টি ও রাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন লাল ফৌজ ও পূর্ব-য়োরোপীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সাহায্যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের একাকিত্বের বিপদ দূর করতে পেরেছিল। সেটা তাঁদের প্রধান কাজের অঙ্গ। তাঁরা আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শ্রেণীচেতনা বিকাশের কাজটিতে যথাযথ

এগোতে পারেন নি, অথচ তার বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ফেবরুয়ারি ১৯৩৭ সালে কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির মধ্যে কী ভাবে গণতন্ত্র লঙ্ঘিত হচ্ছে তার বিবরণ জ্দানভের কাছ থেকে শোনে এবং তার প্রতিষেধক পদক্ষেপের কথা আলোচনা করে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসব প্রশ্নকে পেছনে ঠেলে দেয়।

সমাজতন্ত্র আর সাম্যতন্ত্র—দুটি পৃথক স্তর

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অধ্যয়নকারী-মাত্রেই জানেন—সমাজতন্ত্র কখনই মার্কস-কল্পিত সাম্যতন্ত্র নয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি শ্রমের পূর্ণাঙ্গ সমমর্যাদা স্থাপন করতে পারে না। মার্কস ও লেনিন সমাজতন্ত্র গঠনের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরের কথা বলেছেন। সেইসব পর্যায় আর স্তর উত্তীর্ণ হয়ে সাম্যতন্ত্রে উন্নীত হলেই মানুষের ঘটতে পারে সর্বরকম দাসত্ব থেকে মুক্তি। বৈষয়িক জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতৃত্ব ও সংগঠনের দায়িত্ব মানুষের চেতনার জগতের পরিবর্তন ঘটানো। শ্রেণী- ও শোষণনির্ভর সমাজের ভেতর থেকে আসা মানুষের চিন্তাচেতনা, আচার-আচরণ, অভ্যাস, স্বার্থবোধ ও সঙ্কীর্ণতা কয়েক বছরে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে না। মার্কসবাদ কাউকেই গঙ্গা বা জর্দন নদীর জলে ধুয়ে তুলসীপাতা করতে পারে না। বরং মার্কসবাদের অন্তর্নিহিত প্রত্যয় হল—নতুন মানুষ গড়ার বৈষয়িক পটভূমি দ্রুত গড়া গেলেও চৈতন্যে বিপ্লব ঘটতে বহু সময় লাগবে। লেনিন স্পষ্ট করেই ইঙ্গিত করেছেন যে, সে পরিবর্তনের রূপরেখা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে রূপ লাভ করবে। তা সত্ত্বেও মার্কস যে মানবমুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন সে মুক্তি হল ব্যষ্টিচেতনার সঙ্কীর্ণতা থেকে মানুষের মুক্তিলাভ ও সমগ্র মানবসমাজে সমষ্টিচেতনার বিকাশ। মার্কসের আগে বহু দার্শনিক এই স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু তাঁরা আবেদন করেছেন মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে, নাড়া দিতে চেয়েছেন আবেগকে, স্বেচ্ছায় হৃদয় পালটাবার কথা বলেছেন। সেই কারণেই মার্কস বলেছেন যে, তাঁরা পথ দেখাতে পারেন নি। ইতিহাসে মার্কসের অনন্য ভূমিকা হল এইখানে যে, তিনি সমাজবিকাশের ইতিহাস ও সামাজিক শক্তিসমূহের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, শ্রমজীবী শ্রেণী বৈজ্ঞানিক সমাজবিদ্যাসের চেতনায় শক্তিশালী হয়ে যে সমাজকে নেতৃত্ব দেবে, সেই সমাজেই ঘটতে পারে মানুষের চিরপ্রার্থিত সমষ্টিচেতনার বিকাশ, সার্থক হয়ে উঠতে পারে যিশুর শিক্ষা: 'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালোবাসো।' কিন্তু সেটা করতে হবে শক্তি প্রয়োগ করে। আবেদন-নিবেদনে হয় নি, হবে না। মার্কসের চিন্তাকে আরো বিকশিত করে লেনিন আর স্তালিন দেখালেন যে, বাস্তব অভিজ্ঞতা আর প্রয়োগের অভিজ্ঞতা থেকে তত্ত্বের বিকাশ ঘটে।

সাম্রাজ্যবাদের যুগ ও একটি দেশে সমাজতন্ত্র গঠন এবং প্রলেতারীয় আন্দোলন বিকাশের কালে এঁরা মার্কসবাদী চিন্তার বহুদূর অবধি অগ্রগতি ঘটিয়েছেন। এঁদের ধারা অনুসরণ করে মাও দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিকাশ ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রে সমষ্টিচেতনা বিকাশের সঠিক পদ্ধতি হাজির করেছেন। কিন্তু এঁদের প্রত্যেকেরই ভূমিকা পথিকৃতের ও প্রাথমিক ভিত্তিস্থাপনকারীর। এঁদের অভিজ্ঞতা ও চিন্তায় মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণাঙ্গ হয়ে যেতে পারে না, যায় নি। মার্কসবাদ সমাজ- ও মানব-বিকাশের তত্ত্ব। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রাসঙ্গিকতা কোনো দিন লুপ্ত হতে পারে না যদি না তাকে সচেতনভাবে কোণঠাসা করা হয়, যে চেষ্টা মার্কসের জীবদ্দশাতেই তাঁর অনুগামীরাই করেছিলেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে, স্তালিনোত্তর সোভিয়েত কমিউনিস্ট

পার্টির প্রধান কাজ কী হওয়া উচিত ছিল? (ক) সমাজতন্ত্র গঠনের প্রাথমিক কালে পশ্চাৎপদ জার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতিগুলির ততোধিক পশ্চাৎপদ মানুষকে শৃঙ্খলাপরায়ণতা, উৎপাদনমুখিনতা ও সমাজতান্ত্রিক আনুগত্যের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রয়োজনে সংস্থাগত নির্ভরশীলতার ত্রুটিসমূহের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করা; (খ) মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার ব্যাপক অভিযান শুরু করা এবং শ্রেণী-সংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব তথা প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা; (গ) পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ, আইনজ্ঞ, অনুবাদক, খেলোয়াড়, শিল্পী, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক প্রমুখ সমাজের সুবিধাভোগী ও অধিক-উপার্জনকারীদের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের বৈষয়িক বৈষম্য কমিয়ে আনা; (ঘ) সমগ্র উৎপাদনব্যবস্থার আরো বেশি অংশের সামাজিক মালিকানা সৃষ্টি ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরিবর্তে সমষ্টি-মালিকানা স্থাপনের গতি ত্বরান্বিত করা; (ঙ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতিসমূহের সংগ্রামকে রাজনৈতিকভাবে উৎসাহিত করা ও তাদের স্বনির্ভর সামরিক শক্তির সাহায্যে লড়াইতে উৎসাহিত করা, সামরিক সাহায্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কায়দায় অভ্যুত্থান ঘটানো নয়; (চ) যুদ্ধের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় কূটনীতির পরিবর্তে য়োরোপীয় তথা অন্যান্য অগ্রসর দেশের শ্রমিকদের শান্তির সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করা ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অস্ত্র উৎপাদন বন্ধে শ্রমিকদের সক্রিয় ভূমিকা সৃষ্টি করা; (ছ) সমাজতান্ত্রিক শিবিরের রাষ্ট্রগুলির জনগণের মধ্যে সমাজ-তান্ত্রিক পৃথিবী গড়ে তোলার চেতনা-বিকাশে সাহায্য করা; (জ) সোভিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমগ্র সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিকাশে নেতৃত্ব দেওয়া এবং (ঝ) সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পূর্বে প্রয়োজনীয় কিন্তু বর্তমানে অপ্রয়োজনীয় সীমাবদ্ধতা বর্জন করা।

স্তালিনোত্তর পার্টি-নেতৃত্বের শ্রেণী-পরিচয়

কিন্তু স্তালিনোত্তর সোভিয়েত পার্টির নেতৃত্ব তা করেন নি। নিকিতা ক্রুশ্চভ অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে স্তালিনকে আক্রমণ করে চমক লাগালেও তাঁর নেতৃত্বে সোভিয়েত পার্টি ও রাষ্ট্রের নীতিসমূহ ছিল দৃঢ়তাহীন, অব্যবস্থিত এবং অনেক ক্ষেত্রে বিবেচনাহীন। লেনিনীয় দৃষ্টিতে এগুলি হল পেটি-বুর্জোয়া বৈশিষ্ট্য। চাষী-সমাজ থেকে প্রথম প্রজন্মের শ্রমিক ক্রুশ্চভ পার্টির যত বড়োই নেতা হয়ে থাকুন না কেন, তিনি তাঁর শ্রেণীর দুর্বলতাগুলি থেকে মুক্ত হন নি। তিনি স্তালিন সংক্রান্ত যে নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছিলেন সেটা পেটিবুর্জোয়া চমক ভিন্ন আর কিছু ছিল না। লেনিনের টেস্টামেনট নামক দলিলটি স্তালিন-নেতৃত্বকালীন পার্টির কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় কমিটির সামনে উপস্থিত হয়েছে। যোসেফ স্তালিন নিজে সেক্রেটারি-পদ থেকে সরে দাঁড়াবার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু লেনিনের বিরুদ্ধে ক্ষমতার তুঙ্গে থেকেও একটি কথা বলেন নি, যদিচ সেটা বলার সুযোগ তাঁর যথেষ্ট ছিল। তিনি অনায়াসে বলতে পারতেন যে লেনিন উদারনীতিবাদীদের মতো দুর্বলতা দেখিয়ে ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিন প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের প্রমাণিত গোষ্ঠী-রাজনীতি, কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরোধিতা ও মার্কসবাদ-বিরোধী চিন্তাভাবনা জেনে, সমালোচনা করেও এদের পার্টিতে রেখে পার্টিকে সংহত হতে দেন নি। ভুলে গেলে চলবে না—লেনিন মানুষ, দেবতা নন। তাঁর তাত্ত্বিক নেতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন স্তালিনই, এবং লেনিনবাদ শব্দের সৃষ্টি ও লেনিনীয় তত্ত্বের সংহতিভবন স্তালিনেরই কাজ। "ক্ষমতালোভী একনায়ক"

হিসেবে এ সুযোগ স্তালিনের নেওয়ার কথা। কিন্তু তিনি বাস্তবে এবং সংগঠনে সে ত্রুটি সংশোধন করে সোভিয়েত বিপ্লবকে সহত ও রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে তুললেও লেনিনের কোনো নিন্দা করেন নি। ঠিক যেমন লেনিন মার্কস বা এঙ্গেলসের তত্ত্বের অসম্পূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো নিন্দা-বাক্য উচ্চারণ না করে। এটাই শ্রেণীচেতনা এবং শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির লক্ষণ। অর্থাৎ মৌলিক লক্ষ্যের ক্ষেত্রে, প্রধান কর্মসম্পাদনে, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ, একনায়কত্ব তথা আন্তর্জাতিকতার প্রতি অবিচল কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চেতনায় উদ্গীত কোনো ব্যক্তি কখনই বৈরিতামূলক মনোভাব নিতে পারে না। সেটা অন্তর্ঘাতমূলক কাজ। ক্রুশ্চভ স্তালিননিন্দার নামে শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়, আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলনে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করেছেন।

ব্রেঝনেভ-নেতৃত্বের আমলে সোভিয়েত দেশ

ক্রুশ্চভ-পরবর্তী সোভিয়েত নেতৃত্বও একই নীতিগত সঙ্কটে ভুগেছে। মূলত প্রশাসনিক ও সামরিক সংস্থার আমলাদের প্রতিনিধি ওই নেতৃত্ব মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চেতনার অভাবজনিত কারণে প্রধানত স্থিতাবস্থা কায়েম রেখেছে, এবং পশ্চিমী পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির পাল্লা দিয়ে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের চেষ্টা করেছে। তার সঙ্গে বৃহৎজাতিসুলভ দম্ভ নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করেছে। এই কালে মার্কসীয়-লেনিনীয় চেতনার শৈথিল্যের দরুন সোভিয়েত সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের আরো অধঃপতন ঘটেছে। এই অধঃপতন ঘটেছে প্রধানত প্রশাসনের উচ্চ-পদাধিকারীদের পরিবার, কূটনীতিবিদদের পরিবার, সামরিক কর্তাদের পরিবার, আকাদেমিশয়ানদের পরিবার, ক্রীড়াবিদদের পরিবার, নৃত্য-অভিনয়-গীত প্রভৃতি শিল্পীদের পরিবার, সাংবাদিক, ডাক্তার, আইনজ্ঞ ও কিছু-কিছু শিল্পের দক্ষ শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। এরা সমাজতান্ত্রিক অর্থ-নীতিতেও অধিক উপার্জনের সুযোগ পেয়ে প্রাচুর্য ভোগ করে। ভুলে গেলে চলবে না যে, লেনিন সঠিক-ভাবেই বলেছেন যে পুঁজিপতিদের পর্যুদস্ত করা হলেও সমাজতন্ত্রের প্রথম স্তরে বুর্জোয়াদের ধ্বংস করা হয় না। ওইসব পরিবার বুর্জোয়া ঐতিহ্য ও ধ্যান-ধারণা বহন করে কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দরুন অবদমিত থাকে। সমাজতন্ত্রের দ্বিতীয় স্তরের বিকাশে বুর্জোয়াদের অবসান ঘটানোর কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু সোভিয়েত পার্টি নেতৃত্ব ক্রুশ্চভের আমল থেকেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ববিরোধী নীতি গ্রহণ করে; সোভিয়েত সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব বা বুর্জোয়া ধ্যানধারণার অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং সুবিধাভোগী সম্প্রদায়গুলির সুবিধাদি কমানোর কোনো ব্যবস্থাই নেয় না।

সোভিয়েত দেশের বর্তমান প্রজন্ম

ইতিমধ্যে স্তালিনোত্তর রাশিয়ায় একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রজন্ম সমাজজীবনে এসেছে যারা জন্মের পর থেকে শুনেছে শুধু স্তালিন-নিন্দা, যারা প্রলেতারীয় একনায়কত্ব কী জানে না, যারা শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকার কথা শেখে নি এবং যারা প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার তাৎপর্য জানে না। আসলে এগুলি তাদের শেখানো হয় নি। বিপ্লবের সুফলভোগী এই প্রজন্ম ভোগ্যপণ্যমুখী ও সমস্তরের পশ্চিমী

পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলির জীবনযাত্রার মান আকাঙ্ক্ষা করে। তারা জানে না পশ্চিমের যুবকদের জীবনের প্রাচুর্য আসে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার রক্ত আর ঘাম থেকে। "মস্কো নিউজ"-এর ১৯৮৮ সালের ২৭ নম্বর সংখ্যায় একটি সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখানো আছে যে, ৬৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে যারা, তারা পূর্ববর্তী (স্তালিনকাল) সমাজের প্রশংসা করছে আর ৩০ বছরের নীচে যাদের বয়স তারা নিন্দা করছে। সমীক্ষকদের বক্তব্য, বুড়োরা অশিক্ষিত। স্তালিন মারা গেছেন পঁয়ত্রিশ বছর। তথাপি তিনি সোভিয়েত জনমানসে এতই প্রবল।

এই নতুন প্রজন্ম এবং সুবিধাভোগী বুর্জোয়ারাই সোভিয়েত পার্টির নেতৃত্বে পৌঁছেছে। মিখাইল গোরবাচেভ তাদের তাত্ত্বিক নেতা। তিনি আদৌ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নন। তাঁর শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁর কথায় আর কাজে সুপরিস্ফুট। তিনি চতুর রাষ্ট্রাভিমানী (স্বভাবতই জাত্যভিমানী) রাজনীতিবিদ। পশ্চিমী পুঁজিতন্ত্রের যেসব তাত্ত্বিক ও কর্তারা তাঁকে প্রথমে উচ্ছ্বাসভরে সমর্থন জানিয়ে-ছিলেন তাঁরা এখন থমকে চিন্তা করছেন এবং ইতোমধ্যেই দ্বিমুখী মনোভাব নিয়েছেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মার্কসীয়-লেনিনীয় দৃষ্টিকোণ ও ব্যবস্থাদি বর্জনের ক্ষেত্রে তিনি যে নীতি এবং উদ্যোগ গ্রহণ করছেন সেগুলি তারা এখনও সোৎসাহে সমর্থন করছেন (পশ্চিমী পুঁজিতন্ত্রী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্লেষণগুলি দেখলেই বোঝা যায়)। কারণ এগুলি বিশ্ব-পুঁজিতন্ত্রের সামগ্রিক স্বার্থ ও বুর্জোয়া ব্যবস্থার জীবনবৃদ্ধির পক্ষে সাহায্য করছে। কিন্তু গোরবাচভের আপাত-শান্তির বুলির আড়ালে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্কীর্ণ-স্বার্থ তাঁরা প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। য়োরোপীয় শ্বেতকায় আভিজাত্যবোধে আচ্ছন্ন প্রধানত রুশ এবং উক্রেনীয় জাতি থেকে আগত বর্তমান সোভিয়েত নেতৃত্বের নীতি নির্ধারিত হচ্ছে সোভিয়েত সমাজের বুর্জোয়াদের চাহিদা অনুযায়ী। ব্রেঝনেভের শাসন-কালীন আমলাতন্ত্র সীমান্ত নিরাপদ করার তাগিদে আফগানিস্তানে মার্কিন কায়দায় যে সরকার সংস্থাপন করেছিল, তার পরিণতিতে সোভিয়েত এশীয় তথা অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতির মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হওয়ায় তড়িঘড়ি জেনিভা চুক্তি করলেও সমস্যা থেকেই যাবে। কারণ, সেখানকার উত্তরাঞ্চলে (মাজার-এ-শরীফ) সোভিয়েতের মিত্রতাপূর্ণ শাসন প্রয়োজন নিরাপত্তার খাতিরে। কিন্তু কামানের খাদ্য হবে আফগানরা। প্রথাগত অস্ত্র কমানোর ক্ষেত্রেও একই চাতুরীভরা প্রস্তাব রেখেছেন গোরবাচেভ যা পশ্চিমীদের কাছে গ্রহণযোগ্য কখনোই হতে পারে না। স্তালিনোত্তর সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ শান্তির জন্য, নিরস্ত্রীকরণের জন্য এমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারে নি যাতে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিতন্ত্র বেকায়দায় পড়েছে বা শান্তির সপক্ষে উত্তাল আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে। সে সাফল্য অর্জনের কোনো সম্ভাবনা নেই। গোরবাচেভ কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভাসা-ভাসা দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক স্থাপন করার পথ ধরতে পেরেছেন পৃথিবীর পশ্চাৎপদ জাতিগুলির স্বার্থের মূল্যে এবং আধিপত্যাধীন মণ্ডল স্বীকার করে নেওয়ার ভিত্তিতে। বার্মার ঘটনা অন্যতম নিদর্শন।

মিখাইল গোরবাচেভের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পরিত্যাগের সাক্ষ্য তাঁর দুটি মূল বক্তৃতা। প্রথমটি অকটোবর বিপ্লবের সত্তরতম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রদত্ত, আর দ্বিতীয়টি সোভিয়েত পার্টির উনবিংশতিতম সমগ্র সঙ্ঘ সম্মেলনে দেওয়া। যে-কোনো মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর কাছে এ দুটি বক্তৃতা থেকে কয়েকটি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত আসে: (১) বুখারিনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক তত্ত্বের জয়গান; (২) ইতিহাস বিশ্লেষণে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ (একই নিঃশ্বাসে স্তালিন আমলে পার্টির

সমাজতন্ত্র গঠনের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে সমর্থন ও নিন্দা, আদর্শগত লড়াইয়ে স্তালিনের প্রধান ভূমিকাকে স্বীকার ও নিন্দা, পার্টি-বিরোধী গোষ্ঠীগুলির নিন্দা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা) এবং স্তালিনকে সমালোচনার নামে তৎকালীন পার্টির বিরুদ্ধে বৈরিতামূলক আক্রমণ (স্তালিন পার্টি-বিচ্ছিন্ন কোনো "ঐশ্বরিক" ক্ষমতাবান নন, তিনি যদি "বিপথে" গিয়েও থাকেন, তাহলে তার দায় লেনিনের ও সমগ্র পার্টির); (৩) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অস্বীকার; ৪। শ্রেণীচেতনা বর্জন; (৫) প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা বর্জন; (৬) শান্তির স্বার্থে শ্রেণীসমন্বয়ের তত্ত্ব প্রচার; (৭) জনগণের সংগ্রাম ও তার ওপর নির্ভর না করে কূটনৈতিক ও কেবলমাত্র নেতৃস্তরে বোঝাপড়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ; (৮) নিপীড়িত ও পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলিতে শ্রেণীসংগ্রাম বর্জনের আহ্বান, এবং (৯) সোভিয়েত রাষ্ট্রে ও সমাজে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণ। [প্রাসঙ্গিক উদ্‌ধৃতি স্থানাভাবে দেওয়া হল না। তাঁর তত্ত্ব প্রচারে সোভিয়েত সমাজের বুর্জোয়াদের ওপর গোরবাচেভের নির্ভরশীলতার তথ্যও উল্লেখ করা গেল না।]

ক্রুশ্চভ বা পরবর্তী নেতৃত্বের তুলনায় গোরবাচেভ অনেক বেশি স্পষ্ট আর বুদ্ধিমান। তার কারণ স্তালিন তিরিশ বছর সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পথ ধরে সোভিয়েত সমাজে যতটুকু পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা মানবচেতনার বর্তমান স্তরে যুগান্তকারী। তাকে রাতারাতি উলটে দেওয়ার বা চ্যালেনজ জানাবার সাহস গোরবাচেভ-পূর্ববর্তী নেতারা দেখতে পারে নি, যদিও সোভিয়েত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের দাবি ছিল প্রবল। মার্কসীয়-লেনিনীয় চেতনাহীন নতুন প্রজন্ম, মার্কসীয়-লেনিনীয় চেতনায় দুর্বল পার্টি-সদস্য এবং পশ্চিমী পুঁজিতন্ত্রের আকর্ষণে মুগ্ধ সুবিধা-ভোগী বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে, তাকে অবলম্বন করে বুখারিনপন্থী গোরবাচভ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ত্যাগ করে বুর্জোয়া উদারনীতিবাদ ও গণতন্ত্রবাদী সমাজতন্ত্রী নীতি অবলম্বন করেছেন। মার্কসবাদের বিকাশের ইতিহাসে প্রধানশক্তির বা আন্দোলনের প্রধান ধারায় এ ধরনের বিচ্যুতি বার-বার ঘটেছে। গোরবাচেভের গ্লাসনস্ত পেরেস্ত্রোইকা তাই নতুন কিছু নয়। রাষ্ট্রক্ষমতায় না থেকেও তৎকালীন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কাউটস্কি তত্ত্বগতভাবে মূলত একই কথা বলেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউডার পুঁজিতন্ত্রের চরিত্রপরিবর্তন ও ক্রমান্বয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের তত্ত্ব দিয়েছেন। কাউটস্কি, বুখারিন, ক্রুশ্চভ, ব্রাউডার বা গোরবাচভ—এরা মার্কসবাদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হয় বোঝেন না, অথবা ইচ্ছে করে বিকৃত করেন। এ কথাও মনে রাখতে হবে, স্তালিনোত্তর পঁয়ত্রিশ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নে এমন কোনো সাফল্য আসে নি যার ভিত ওই আমলে স্থাপিত হয় নি। বিপরীতক্রমে এ পর্যন্ত স্তালিনোত্তর নেতৃত্বের স্তালিন-বিরোধী চমক দেওয়া ছাড়া নীতিগত কোনো সাফল্য নেই। বরং গোরবাচেভের নীতির ফলে সোভিয়েত সঙ্ঘের জাতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হবে; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিপীড়িত জাতি ও জনগণের সংগ্রাম সাময়িকভাবে ধাক্কা খাবে, এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রে পুরনো কায়দায় না হলেও পুঁজিতন্ত্র গড়ে উঠবে তথা আন্তর্জাতিক পুঁজিতন্ত্র দম ফেলার সুযোগ পাবে।

রচনাকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

প্রতিবেশী সাহিত্য

গুজরাতি কবি উমাশঙ্কর জোশী

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

'বাঙলা সাহিত্য এবং বিশেষ করে রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ই যদি নিয়োগের মাপকাঠি হয়, তবে যাকে বড়োজোর বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীতে ভর্তি করা যেত তাকে বসিয়ে দেওয়া হল কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যপদে'—৬-৭ বছর আগে একদিন ব্যক্তিগত আলোচনায় কথাটা উচ্চারিত হয়েছিল বিব্রত ও কুণ্ঠিত গুজরাতি কবি উমাশঙ্কর জোশীর মুখে। তখন তিনি দিল্লীতে সাহিত্য অকাদেমির সভাপতি। তার আগে জনতা সরকারের আমলে তিনি ছিলেন বিশ্ব-ভারতীর আচার্য। আজ আর সেই স্বল্পভাষী মৃদুকণ্ঠ গৌরবর্ণ ক্ষীণকায় মানুষটি আমাদের মধ্যে নেই (মৃত্যু ১৯ ডিসেমবর ১৯৮৮)।

বেশ কয়েকটি সংকলনগ্রন্থে এবং সমালোচকদের লেখায় গুজরাতি রীতি অনুযায়ী 'উমাশঙ্কর জেঠালাল জোশী' লেখা হলেও তিনি নিজে কোনোদিন পিতৃনাম 'জেঠালাল' ব্যবহার করেছিলেন বলে আমাদের মনে পড়ছে না। সাময়িকপত্রে ছোটোগল্প রচনায় তাঁকে অবশ্য "বাসুকি" ছদ্মনামটি ব্যবহার করতে দেখা গেছে।

"জোশী" সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছিলাম। শব্দটা যখন এসেছে "জ্যোতিষী" থেকে, তখন জোশীর বদলে 'জোষী' বানানই তো মূলানুগামী। অনেকে লেখেনও তাই। তিনি একটু হেসে বললেন—'ষ'-এর ব্যবহার তাঁর কাছে একটু বেশি পাণ্ডিত্যগন্ধী—পেডানটিক। বাঙলায় 'যোশি' বানানের কথাও তিনি উল্লেখ করেন, এবং সেই প্রসঙ্গে বাঙলায় 'জ' এবং 'য'-এর ব্যবহার সম্পর্কে কিছু কৌতুকাবহ আলোচনাও হয়।

১৯২৮ সালেই উমাশঙ্করের ভবিষ্যৎ জীবনের রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়ে যায় দুটি ঘটনায়। ঘটনা দুটি বর্তমান নিবন্ধকারের পূর্বপঠিত বলে কবির সঙ্গে তাই নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনার সুযোগও হয়েছিল। উত্তর-গুজরাতের "বামণ" নামক একটি অজ পল্লীগ্রামে উমাশঙ্করের জন্ম (২১ জুলাই, ১৯১১)। নিকটবর্তী ঈডার ইস্কুলে তাঁর লেখাপড়া। এখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন পন্নালাল পটেল (জন্ম ৭ মে, ১৯১২) যাঁর পড়াশুনো ১৬-১৪ বছর বয়সে শেষ হয়ে গেলেও পরবর্তী কালে (১৯৮৫) যিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিত হন তাঁর সুবৃহৎ উপন্যাস "মানবীনী ভাবৈ"-র জন্য। উমাশঙ্কর ওই একই পুরস্কার পান ১৯৬৬ সালে তাঁর "নিশীথ" (১৯৩৯) কাব্যগ্রন্থের জন্য। একই গ্রাম্য বিদ্যালয়ের দুই সহপাঠী যে বিশেষ গৌরব লাভ করেন কথাটা খুব মনে রাখার মতো। অগ্রজ উমাশঙ্করের কয়েক মাস পরেই অতি সম্প্রতি (৬ এপ্রিল, ১৯৮৯) চলে গেলেন বন্ধুবর পন্নালাল পটেল।

ইস্কুলের গণ্ডি পার হয়ে উমাশঙ্কর আমেদাবাদ এলেন কলেজে পড়তে। তার বছর পাঁচেক আগেই ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয় মহাদেব দেসাই অনূদিত রবীন্দ্রনাথের "প্রাচীন সাহিত্য"। উৎকৃষ্ট অনুবাদ। এই অনুবাদের প্রশংসায় উমাশঙ্কর বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। তিনি লিখেছেন (এবং পরে মুখেও বলেছেন) কলেজ ছুটির পরেই বাসস্থানে ফেরার আগে তাঁর নিত্যকর্তব্য ছিল "প্রাচীন সাহিত্য" হাতে নিয়ে সাবরমতীর তীরে গিয়ে বসা। কবি স্মরণ করিয়ে দিলেন, এখনকার কলকারখানাবেষ্টিত সাবরমতী পঞ্চাশ বছর আগে ছিল প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই মনোরম পরিবেশে কখনো বসে কখনো দাঁড়িয়ে

কখনো পায়চারি করতে-করতে তিনি উচ্চকণ্ঠে 'আবৃত্তি' করতেন "প্রাচীন সাহিত্যে"র এক-একটি প্রবন্ধ এবং নিত্য আবৃত্তির ফলে অনেকাংশই তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। উমাশঙ্করের মতে "প্রাচীন সাহিত্য"-র প্রতি তাঁর এই বিশেষ অনুরাগের মূলে যেমন ছিল প্রাচীন কবিদের সম্পর্কে আধুনিক কবির নতুন কবিত্ব-পূর্ণ বিশ্লেষণ, সেই সঙ্গে ছিল গুজরাতি অনুবাদের মনোহারিতা। আমাদের মনে হয় বিশ্বভারতীর আচার্যপদলাভের বীজ এইখানেই।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে রাজস্থানের অর্বুদগিরি বা মাউন্ট্ আবুতে। এ সম্পর্কে উমাশঙ্করের বক্তব্য: কলেজে আমার প্রথম বছর। দেওয়ালির ছুটিতে তিন বন্ধু মিলে আমেদাবাদ থেকে গাড়িতে উঠেছি আবু যাওয়ার জন্য। গাড়িতে আবু রোড পৌছলাম। তারপরে পাহাড়। আমি মূলত পাহাড়ের লোক। উত্তর-গুজরাতে আমাদের গ্রামে আমার বাড়ির পিছনেই "ডুগর" (পাহাড়)। কিন্তু আমার মধ্যে প্রকৃতিপ্রেম সঞ্চারিত করে আবু পাহাড়ের অভিজ্ঞতা। সেদিন ছিল শরৎপূর্ণিমা। কাব্যদীক্ষার জন্য ব্যাকুল তরুণচিত্তকে অর্বুদগিরির পাহাড়ি শ্রী শরৎপূর্ণিমার প্রফুল্ল আলোকে 'ধন্যমন্ত্র' দিল:

'সৌন্দর্যো পী: উর-ঝরণ গাশে পছী আপ মেলে।'
(সৌন্দর্য পান করো: হৃদয়নির্ঝর আপনা থেকেই গান গেয়ে উঠবে।) পাহাড়ের ভিতরে জলের পর্যাপ্ত সঞ্চয় হলে শিলা বা পাথর যেমনই হোক না, তার দুয়ার ভেঙে নির্ঝর আপনা-আপনি বেরিয়ে আসে।... বিশ্বে সৌন্দর্যের ধারাবর্ষণ হয়ে চলেছে নিরন্তর। তুমি যদি সেই সৌন্দর্যকে নিজের ভিতরে সঞ্চয় করতে পার, তাহলে তোমার হৃদয়নির্ঝর আপনা-আপনি গান গেয়ে উঠবে। ওই বয়সে কাব্যজীবন শুরু করার পক্ষে এই মন্ত্রই ছিল পর্যাপ্ত।

দেখা যাচ্ছে, উমাশঙ্কর বেশ সবিস্তারেই তাঁর প্রথম কবিতা রচনার বিবরণ দিয়েছেন। কবিতাটির নাম "নথী সরোবর উপর শরৎপূর্ণিমা"। এই চতুর্দশ-পদী কবিতাটি ছাপা হয় কলেজ ম্যাগাজিনে। শেষ কয়েকটি পংক্তি এইরকম: পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে সরোবরের 'বীচীমালা' হেসে উঠল। যেইমাত্র হল সলিল ও জ্যোৎস্নার সুচারু সংযোগ, কোনো কুসুম-কোমল অঙ্গুলি যেন হৃদয়তন্ত্রীকে স্পর্শ করল। আমার অর্ধনিমীলিত নয়ন ঝুঁকে পড়লে কোথা থেকে এসে পৌছল এই গান? প্রকৃতি একান্তে বসে বলছিল মঞ্জু শব্দাবলী। অন্তঃশ্রুতিপটলে জেগে উঠল এই ধন্যমন্ত্র—সৌন্দর্য পান করো, হৃদয়নির্ঝর আপনা থেকেই গান গেয়ে উঠবে।

এখন থেকেই উমাশঙ্করের কাব্যযাত্রা শুরু। পাহাড়ের অভিজ্ঞতাই তাঁকে দিয়েছিল কবিজীবনের দীক্ষা।

কাব্যদীক্ষার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে কলেজ জীবনেই শুরু হল তাঁর অন্য দীক্ষা—বলা যেতে পারে কঠিন জীবনদীক্ষা। ১৯৩০ সালে শুরু হল গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ। কবি এই সময়ে লিখলেন—'হুঁ গুলাম ?/ সৃষ্টি বাগনুঁ অমূল ফুল মানবী গুলাম ?' (আমি গোলাম? সৃষ্টির উপবনের অমূল্য ফুল মানুষ আমি গোলাম?) ১৯৩০ সালেই কবির কারাবরণ। ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরুইন চুক্তির ফলে অন্য অনেক রাজবন্দীর সঙ্গে উমাশঙ্করও জেল থেকে মুক্তি পান। মুক্তি পেয়েও কিন্তু সরকারি গোলামখানায় অর্থাৎ পুরোনো কলেজে আর ফিরে গেলেন না। আবার কবে সংগ্রামের ডাক আসবে (এসেছিল ১৯৩২ সালে) তারই অপেক্ষায় তিনি গান্ধীজী-প্রতিষ্ঠিত গুজরাত বিদ্যাপীঠে গিয়ে যোগ দিলেন কাকাসাহেব কালেল-করের সঙ্গী হয়ে। এই সময়ে লিখলেন খণ্ডকাব্য "বিশ্বশান্তি"। উমাশঙ্করের এই প্রথম মুদ্রিত কাব্য-গ্রন্থের (১৯৩১) প্রকাশক গান্ধীজী-স্থাপিত নবজীবন প্রেস। কিন্তু বিশ বছরের তরুণ কবির সাহস হল না এই কাব্যপুস্তকখানির একটি কপি গান্ধীজীর হাতে তুলে দেবার।

উমাশঙ্করের কবিতায়, বিশেষ করে প্রথম

দিককার কবিতায়, গান্ধীজীর প্রভাব এবং প্রেরণা থাকা খুবই স্বাভাবিক। প্রথম কাব্যগ্রন্থ "বিশ্ব-শান্তি"র 'মঙ্গলশব্দ' কবিতায় আছে: তুমি পাপের সঙ্গে পাপীকে মেরো না—এই মন্ত্র গ্রহণ করে-ছিলেন অনেক যোগিপুরুষ, অরণ্যবাসী ও ঋষি-মণ্ডলী। এই মন্ত্র শুনেছিলেন বুদ্ধ, মহাবীর, যীশু। তবু তো জাগল না নিদ্রাচ্ছন্ন মানুষ। কালক্রমে সেই মন্ত্র ডুবে গিয়েছিল অনন্তের তলে। পুনরায় তা স্পষ্ট ধ্বনিত হচ্ছে আজ যুদ্ধক্লান্ত [এখানে প্রথম মহাযুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে] এই পৃথিবীতে। গান্ধীজীর কানে পড়ে সেই মন্ত্র পৌছল তাঁর হৃদয়ে। আর সেখান থেকেই সেই মন্ত্র ছড়িয়ে পড়ল বিশাল বিশ্বে।

সাবরমতী জেলের অভিজ্ঞতা উমাশঙ্করের কবিত্ব এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয়। আর পাহাড়ের অভিজ্ঞতা যেমন দিয়েছিল কাব্য-জীবনের দীক্ষা, জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা তেমনি প্রেরিত করেছিল সামগ্রিক জীবনদীক্ষায়। তখনকার কবিচিত্তে কি কেবল জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা ছিল, অথবা রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের নেপথ্যে অবস্থিত কোনো ব্যাপকতর ভাবনারও আকর্ষণ ছিল?

ছিল বইকি। পূর্বোদ্ধৃত 'মঙ্গলশব্দ' কবিতাটিই তার প্রমাণ। আরও প্রমাণ আছে। জেলে অবস্থান-কালে ভারতের অন্যান্য প্রান্তে যেমন বেশ কিছু তরুণ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের হয়েছিল, তেমন উমাশঙ্করের দৃষ্টিও সমাজবাদী চিন্তায় রঞ্জিত হয়। তার পরিচয় পাই "গঙ্গোত্রী" (১৯৩৪) গ্রন্থের 'জঠরাগ্নি' কবিতায় (রচনাকাল ১৯৩২ এপ্রিল)। এ কি গান্ধীবাদ না মার্কসবাদ? কবির ভাষায়: হৃদয়-অবরোধকারী শিলাকে ভাবীকাল কেমন করে সহ্য করবে? দারিদ্র্যের সেই উপহাসলীলা ঘোচাবার জন্য ক্ষুধার্ত মানুষের জঠরাগ্নি কোটি-কোটি জিহ্বায় ছড়াতে-ছড়াতে জ্বলে উঠবে।

সেই সুরই ধ্বনিত হল "নিশীথ" (১৯৩৯) গ্রন্থের 'পাঞ্চালী' কবিতায় (রচনাকাল ১৯৩২ অগস্ট)। মেহনতি দ্রৌপদীরা বস্ত্রহীন—এই হল মূল সুর: যন্ত্র দিয়ে তো বস্ত্র তৈরি হয় না, বস্ত্র বোনে তোমাদের মজুরি। এক নয়, হাজার-হাজার দামি বস্ত্র তো তোমাদের শরীরে, তবু তোমরা সব বস্ত্রহীন। তোমাদের দেহ থেকে এই হাজার-হাজার বস্ত্র টেনে নিয়ে দুঃশাসন তোমাদের উপর শাসন চালাচ্ছে। হে পাঞ্চালীর দল! তোমরা আর কতদিন এই অত্যাচার সহ্য করবে? বিশ বছরের এই আবেগ-বিহ্বল কবিচিত্তই বলতে পারে—'ফুলের সঙ্গে কথা বলার সময় যে নেই, সময় যে নেই' (পুষ্পো সাথে বাত করওয়ানো সময় রহ্যো নহি)।

বেশ বোঝা যায়, তৃতীয় দশকে আর তার পরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যে প্রগতিবাদের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল, উমাশঙ্কর-সহ গুজরাতের প্রায় সকল নবীন লেখক এই হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে উৎসাহিত বোধ করেন। কিন্তু চতুর্থ দশকের শেষ নাগাদ প্রগতিবাদে ভাঁটার টান দেখা দেয়—অন্তত গুজরাতে। এর মুখ্য কারণ অবশ্যই ওই সময়কার রাজনৈতিক ডামাডোল। তা সত্ত্বেও, উমাশঙ্করের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, 'সমাজবাদের মূল প্রেরণা—সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠার দাবি—আমাদের মধ্যে থেকেই গেল।'

তবুও কবিচিত্ত কোনো এক বিশেষ বিন্দুতে স্থির হয়ে রইল না। চল্লিশের দশকে দেখি কবির সৌন্দর্য-প্রীতি, পঞ্চাশের দশকে আবার সমাজবাদের দিকে ঝোঁক—এই আপাত-বিপরীতের টানাপোড়েনে ক্ষত-বিক্ষত কবিচিত্তের চমৎকার ছবি ফুটেছে কয়েকটি কবিতায়। তার মধ্যে প্রথম না হলেও কাব্যিক উৎকর্ষে অবশ্যই শীর্ষস্থানীয় 'ছিন্নভিন্ন ছুঁ' ('আমি কবি ছিন্ন-ভিন্ন প্রাণী')।

প্রকৃতির কোলে জন্ম বলে কিনা জানি না, উমাশঙ্করের কবিতায় বার-বার এসেছে প্রকৃতির কথা। প্রথম কবিতার জন্মই তো আবুপাহাড়ে সরোবরের তীরে এক শরৎপূর্ণিমারাতে। তারপরে তাঁকে আমরা

দেখতে পাই পলাশ-বটের মণ্ডপে, সমুদ্রতটে, অরণ্য-মরুভূমিতে, তাঁকে আমরা শুনতে দেখি 'ঝরণ-ঝাঁঝরী' (ঝরনার নূপুরধ্বনি), কখনো বা তিনি নির্নিমেষে চেয়ে থাকেন নবপল্লব-বনস্থলীসমন্বিতা 'শাদ্বলবতী ধরা'-র দিকে, কখনো বা তাঁর চোখে ভেসে ওঠে 'হিমকিরীটিনী ধবলভাল দিব্যাঙ্গনা।'

প্রকৃতিজগতের কথা বলতে-বলতে কখনো কবি চলে যান মানুষের হৃদয়কুঞ্জে (বাঙালি কবির ভাষায় 'এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে' এবং তৎসহ 'জীবন্ত-হৃদয়মাঝে')। 'নিঝর জলে প্রবহমান তরতাজা আদিমকবিতা। গাছের ডালে-ডালে পাখির বাসায় জেগে ওঠে কিচিরিমিচির গানের দোলা, লতাপুষ্পে ও পত্রে চৈতন্যের মুখশোভা—এসব আমাকে আমন্ত্রণ করে বিশ্বকুলের ভালোবাসা গ্রহণ করার জন্য। প্রকৃতি আমার কাছে খুবই প্রিয়, কিন্তু প্রিয়তর মানুষের হৃদয়কুঞ্জ—যাকে মানুষ অমৃত দিয়ে ভরে রেখেছে।' (কবিতার নাম 'কুঞ্জ উরনী', 'হৃদয়কুঞ্জ', রচনাকাল ১৯৩৫, সেপটেমবর)।

লেখক উমাশঙ্করের বহু বিচিত্র রূপ। গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা, গবেষণা, সাংবাদিকতা, একাঙ্কী নাটক তো আছেই, তিনি একখানি উপন্যাস রচনাতেও হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু বর্তমান নিবন্ধে আমরা কবি উমাশঙ্করকেই তুলে ধরতে চাই। আমরা তাঁর দশখানি কাব্যগ্রন্থের সন্ধান রাখি—"বিশ্বশান্তি" (১৯৩১), "গঙ্গোত্রী" (১৯৩৪), "নিশীথ" (১৯৩৯), "প্রাচীনা" (১৯৪৪), "আতিথ্য" (১৯৪৬), "বসন্তবর্ষা" (১৯৫৪), "মহাপ্রস্থান" (১৯৬৫), "অভিজ্ঞা" (১৯৬৭), "ধারাবস্ত্র" (১৯৭৭) এবং "সপ্তপদী" (১৯৮১)। এই পঞ্চাশ বছরের কবিতার সংগৃহীত রূপ "সমগ্র কবিতা" প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালের ২১ জুলাই। বইটির প্রকাশ দুটি কারণে অনন্য। প্রথমত, আজ পর্যন্ত অন্য কোনো গুজরাতি কবির জীবৎকালে তাঁর সমগ্র কবিতা একসঙ্গে প্রকাশিত হয় নি। দ্বিতীয়ত, "সমগ্র কবিতা" মাস পাঁচেকের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণের মুখ দ্যাখে। উমাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বোধ করি এইটেই—ব্যবসাগতপ্রাণ গুজরাতি সমাজকে কবিতামনস্ক করে তোলা। এই পরিবর্তন স্থায়ী হতে না পারে, কিন্তু তাতে উমাশঙ্করের কৃতিত্ব তুচ্ছ হবার নয়।

গুজরাতি লেখক সুরেশ দলাল বছর তিনেক আগে প্রকাশিত তাঁর "কবিপরিচয়" গ্রন্থের উমাশঙ্কর বিষয়ক প্রবন্ধে বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে উমাশঙ্করের কবিতার একটা সূক্ষ্ম সম্পর্ক আছে।' লেখক যদি তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট করে বলতেন, আমাদের খুব সুবিধা হত। সূক্ষ্ম না হোক, আমরা কিছু স্থূল সম্পর্কের কথা বলতে পারি।

দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক উপাখ্যান অবলম্বনে "কাহিনী" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, যার অধিকাংশ কবিতাই নাট্যকাব্য নামে পরিচিত। স্বতন্ত্র রচনা "বিদায় অভিশাপ"ও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উমাশঙ্করও অনুরূপ ভঙ্গিতে পুরোনো কাহিনীকে আধুনিক মন নিয়ে বোঝাবার উদ্দেশ্যে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন—"প্রাচীনা" (১৯৪৪) এবং "মহাপ্রস্থান" (১৯৬৫)। প্রতিটি গ্রন্থে সাতটি করে মোট চোদ্দটি রচনা। গুজরাতি 'সংবাদকাব্য' (অর্থাৎ সংলাপকাব্য) নামে অভিহিত হলেও আসলে এগুলি নাট্যকাব্য। "প্রাচীনা"য় আছে 'কর্ণ-কৃষ্ণ', 'গান্ধারী', '১৯ম দিবসম্ প্রভাত' (আঠারো-দিন-ব্যাপী সর্বধ্বংসী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরবর্তী প্রভাত) ইত্যাদি সাতটি। 'মহাপ্রস্থান', 'যুধিষ্ঠির', 'অর্জুন-উর্বশী', 'কচ', 'মন্থরা' প্রমুখ সাতটি নাট্য-কাব্য নিয়ে "মহাপ্রস্থান"।

এই কবিতা বা নাট্যকাব্যগুলির জন্য উমাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ স্বীকার করলে আমি উৎসাহিত হয়ে গুজরাতি কবির দুই- পংক্তি বা চার পংক্তি-বিশিষ্ট কতকগুলি কবিতার উল্লেখ করি। যেমন, (এক) আমি যখনই দুয়ার বন্ধ করি আমার ভিতরে অবস্থিত কে একজন বলে ওঠে: 'বাইরে কে রয়ে গেল না?' (দুই) বৃহতের ক্ষুদ্রতা দেখে বিরক্ত হলেও আমি ক্ষুদ্রের মহত্ব দেখে বেঁচে আছি। এই ক্ষুদ্র কবিতাগুলির আলোচনাপ্রসঙ্গে 'কণিকা'র উল্লেখ করা হলে শ্রীজোশী মৃদু হেসে মনে হল আমার অভিপ্রায়ে সম্মতি জানালেন।

কিন্তু সেই সূত্রেই আমার বাঙালিসুলভ মাত্রাতিরিক্ত প্রাদেশিক মন যখন বলল—'আপনার গানের সুর জানি না বটে, কিন্তু পড়তে গেলে মনে জাগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা', তখন কিন্তু তিনি দ্ব্যর্থ-হীন ভাষায় বললেন যে তাঁর গানের মূল প্রেরণা উত্তর গুজরাতে প্রচলিত লোকসঙ্গীত এবং সেই কারণেই তাঁর কবিতার ভাষা কিছু পরিমাণে সংস্কৃত-নিষ্ঠ হলেও গানগুলি রচিত হয়েছে পুরোপুরি "বোলাতী" (বা কথ্য) ভাষায়।

উমাশঙ্করের যেসব প্রয়োগ, চিত্রকল্পের ব্যবহার এবং ভাবের অভিব্যক্তি সরাসরি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করায় (এবং যার জন্য গুজরাতি কবির মৌখিক বা লিখিত অনুমোদন অনপেক্ষিত) এবারে তেমন কিছু দৃষ্টান্তের কথা বলা যাক।

(ক) সন্ধ্যানী রংগীন চিতাএ (সন্ধ্যার রঙিন চিতা)।

(খ) এমনি অকারণে আমার পা-দুটোকে, বিষণ্ণ মনকে অনেক দূরে নিয়ে যায় পায়েচলা পাহাড়ি পথ।

(গ) কালিদাসের 'রম্যাণি বীক্ষ্যে' শ্লোকটি তার অন্তর্নিহিত ভাবের জন্য রবীন্দ্রনাথের অতিশয় প্রিয়। উমাশঙ্কর বলেন: 'হে অনন্তের পথিক কালিদাস, তুমি কি কখনো দেখেছিলে গোয়ার এই দুধসাগর? সুন্দর কিছু দেখলে তোমারই কথা মনে আসে, কবি। এই দুধসাগর দেখেও তোমার কথা ভাবছি। এই প্রপাত যদি তুমি কখনও না দেখেও থাক, তাহলেও এ প্রপাত তোমার কাছে কিছুমাত্র অজানা নয়।

(ঘ) গীতিকবিতাসুলভ আত্মপরতা রবীন্দ্রনাথের মতো উমাশঙ্করেও লক্ষণীয়। 'অনেক ঘুরেছি এবং আরও ঘুরব এই পৃথিবীতে প্রবাসীর মতো।' 'স্থান ও কালের সৌন্দর্যমণ্ডিত এই মহাবিস্তার বিরাজ করে, কিন্তু আমি-বিনা সমস্তই শূন্য-সদৃশ।'

(ঙ) রবীন্দ্রপ্রচারিত 'উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণখণ্ড' তত্ত্বের প্রতিধ্বনিই যেন শুনতে পাই যখন উমাশঙ্কর বলেন: 'জীবনের অনেক ক্ষণপুঞ্জ, তার মধ্যে দিব্য নিজানুভবের ক্ষণ তো অল্প কয়েকটি।' 'প্রতিটি ক্ষণ অনন্ত। নতুন-নতুন রূপে বিস্তার লাভ করে প্রতিক্ষণে স্ফুরিত হয় ত্রিকালভরা অনুভব।'

(চ) প্রিয়াকল্পনায় রবীন্দ্রকথিত 'আপন মনের মাধুরী' ঠাঁই পেয়েছে উমাশঙ্করে। 'একদা আমি প্রিয়ার কল্পনায় ভেবেছিলাম যে সে হবে প্রথম কবিতা উদয়ের মতো।.....যখন মিলন হল তখন জানলাম আমার মতোই রক্তমাংসের তৈরি মানুষ সে, পূর্ণ নয়। কিন্তু কল্পনার চেয়েও মধুরতর হল আমার হৃদয়ের রচনা।'

(ছ) 'নিরুপমা'র কাছে রবীন্দ্রনাথের ক্ষমাপ্রার্থনা তো সুপরিচিত। উমাশঙ্করের একটি গানের শিরোনাম 'ক্ষমাযাচনা' (রচনাকাল ১৯৩৭ নভেম্বর): 'প্রিয়, তোমাকে কখনো ভালোবেসে ডাকার সুযোগ পাই নি বলে ক্ষমা করো তুমি। আজ আমি খুব ব্যস্ত আমাদের দুজনের অনেক মিলনের কথা লিপিবদ্ধ করার কাজে।'

(জ) যাবার দিনে কবি কী-কী সঙ্গে নিয়ে যাবেন বলা হয়েছে 'শুঁ-শুঁ সাথে লঈ জইশ হুঁ? কহ্য' (রচনাকাল ১৯৫৪) নামক কবিতায়: 'কী-কী সঙ্গে নিয়ে যাব বলব? হৃদয়ভরে নিয়ে যাব পৃথিবীর ঐশ্বর্য। নিয়ে যাব নবীন উজ্জ্বল মুখসৌন্দর্য। নিয়ে যাব গাছের ডালে ছড়িয়ে পড়া মেঘলা বিকেলের রোদ।'

উমাশঙ্কর যাঁকে বলেছেন 'সহস্রদল পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম', সেই রবীন্দ্রনাথের কিছু রচনার সঙ্গে গুজরাতি কবির কয়েকটি কবিতার বা কাব্যপংক্তির মিল দেখানোর উদ্দেশ্য উমাশঙ্করের মৌলিক সৃষ্টিশক্তিকে খর্ব করা নয়। এই তুচ্ছ নিবন্ধ থেকে যদি কোনো পাঠকের মনে তেমন ধারণা জন্মে থাকে, তবে এই অল্পবুদ্ধি নিবন্ধকার দিব্যাত্মা উমাশঙ্করের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

সি. এম. টি. সি— একটি অভিনব আইন-অমান্য আন্দোলন

মহাশ্বেতা চৌধুরী

আমেরিকার গণতান্ত্রিক সংবিধানে যেমন আইনের নানা শক্ত পাশে ব্যক্তির স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা রয়েছে, তেমনি আছে প্রতিবাদের অধিকার রক্ষার প্রয়াস। অর্থাৎ, অন্যায় আইনও যেমন আছে, তেমনি আছে সে আইনের (বা কোনো অন্যায় সামাজিক নীতির) বিরুদ্ধাচারণ করার নাগরিক অধিকার। ইস্যু যাই হোক না কেন, কথায়-কথায় তরুণ, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় নেমে পড়ে প্রতিবাদের সভায় বা মিছিলে। নারীপুরুষের সমানাধিকার, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-আমেরিকা নীতি, বা কোনো স্থানীয় শিক্ষালয়ের সমস্যা—যে-কোনো কারণে নানা স্তরের প্রতিবাদ লেগেই আছে। ঠেলাগাড়িতে বসা শিশুও বাদ যায় না, তার পিঠে কখনো লাগানো থাকে 'I want my father, not bomb' কিংবা 'Give me bread not bullet'। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও কম্পিত কিন্তু নিষ্কম্পচিত্তে ধরে থাকেন 'We want a President, not an actor। অথবা পুলিশি কায়দায় 'Wanted Ronald Reagan।' জোন বায়াজ, পীট সীগার প্রমুখ শিল্পীরা তো রীতিমতো প্রতিবাদ-সংগীতের সাহিত্য তৈরি করে ফেলেছেন। বলা বাহুল্য, এসব প্রতিবাদই অহিংস, এবং কোনো সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে—ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্য নয়। পৃথিবীর একটি সম্পদশালী দেশ হিসেবে অর্থনৈতিক সমস্যা এদেশে হয়তো এশিয়া-আফ্রিকার অনেক দেশের মতো প্রকট নয় (যদিও বেকারসমস্যা আর দারিদ্র্য আজ এখানেও ক্রমে-ক্রমে উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে উঠছে), কিন্তু আদর্শগত, রাজনৈতিক নানা জটিল কারণে আমেরিকার সাধারণ মানুষ প্রায়ই সরকারি নীতিতে বিক্ষুব্ধ। পৃথিবী জুড়ে মার্কিন সরকারের জঙ্গি মনোভাব তার মধ্যে একটি কারণ। ষাটের দশকের দীর্ঘ ইনভলভমেনট সাধারণ নারীপুরুষকে ক্ষুব্ধ, বিদ্রোহী, সরকারবিরোধী করে তুলেছিল। ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা তাদের মূল্যবোধ বদলে দিয়েছে দ্রুত। সেদিনের তরুণ নিজেকে মনেপ্রাণে অ্যানটি-এসটাবলিশ-মেনট বলে প্রমাণ করবার জন্য লম্বা চুলদাড়ি রেখেছে, খালি পায়ে, অদ্ভুত পোশাকে পশ্চিমি সভ্যতার শূন্যগর্ভতার বিরুদ্ধে লড়েছে। "ড্রাফট" কার্ড পুড়িয়েছে, বিসর্জন দিয়েছে নারীর লালিত্যের দাবি, প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে মানুষ হিসেবে তার সামাজিক সমানাধিকার। আশির দশকে আবার নতুন সচেতনতা জাগছে ক্রমবর্ধমান রণমত্ততা আর পরমাণু-অস্ত্রপ্রস্তুতির বিরুদ্ধে।

সি. এম. টি. সি. এমনি একটি আন্দোলন। এর উদ্দেশ্য ফেডারেল গভর্নমেনটের জঙ্গিনীতির প্রতিবাদ ও অসহযোগ। পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ অহিংস, কিন্তু যথেষ্ট কার্যকর বলে মনে হয়। সি. এম. টি. সি. অর্থাৎ The Conscience and Military Tax Campaign সামরিক কর প্রত্যাখ্যানকে রাজনৈতিকভাবে কার্যকর স্তরে নিয়ে যাওয়ার এক আন্দোলন। সি. এম. টি. সি'র কার্যক্রম মোটামুটি দুই পর্যায়ের। প্রথম : সামরিক খাতে করদান অস্বীকার (refusal), দ্বিতীয় : বিশ্বশান্তি খাতে সেই

টাকার পুনঃ-চালনা (redirection)। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সক্রিয় (অথচ অহিংস) উৎসাহী ব্যক্তি (এড পিয়ারসন তাঁদের মুখপাত্র) ১৯৭৯-র নভেম্বরে এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। বিশ্বশান্তি এবং বিশ্বমৈত্রী তাঁদের আদর্শগত লক্ষ্য, এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য বর্তমান কার্যক্রমের দুটি লক্ষ্যমাত্রা। প্রথমটি হল বিশ্বশান্তি কর তহবিল (The World Peace Tax Fund Bill)। বিলটি কংগ্রেস যাতে পাশ করে তার জন্যে জোরদার ব্যবস্থা অবলম্বন, এবং দ্বিতীয়টি হল সি. এম. টি. সি'র প্রস্তাবটির জন্য এক পক্ষ ধরে স্বাক্ষর-সংগ্রহ।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ধর্ম ও নৈতিক বিশ্বাসের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু ১৯৫৪ সালের Internal Revenue Service (IRS) Code যুদ্ধবিরোধী করদাতাদের সেই স্বাধীনতা খর্ব করেছে। সি. এম. টি. সি'র জেহাদ এই অসঙ্গতির এবং অন্যায় করনীতির বিরুদ্ধে। তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবির উদ্দেশ্য হল, সংবিধানপ্রতিশ্রুত নৈতিক কারণে কর-অস্বীকৃতির অধিকারের পুনরুদ্ধার।

ডেমোক্রাট সেনেটর রোন্যাল্ড ডেলাম্‌স্ ১৯৭২ সালে কংগ্রেসে প্রথম বিশ্বশান্তি-কর-তহবিল সম্বন্ধীয় বিলটির প্রস্তাব উত্থাপন করেন, এবং পরে সেনেটে সেটি তোলেন রিপাব্লিকান মার্ক হ্যাট্‌ফিল্ড। প্রস্তাবটি যে রাজনৈতিকমতনিরপেক্ষ, সে ব্যাপারটি এতে লক্ষণীয়। আগেই বলেছি বিলটির উদ্দেশ্য হল, ১৯৫৪ সালের কোডটির সংশোধন করে যুদ্ধবিরোধী করদাতারা যাতে সামরিক খাতে কর না দিয়ে অন্য উপায় অবলম্বন করতে পারে, তার বিকল্প ব্যবস্থার সংস্থান করা। তহবিলের পরিকল্পনা সেই বিকল্প ব্যবস্থা। এর লক্ষ্য এক বিশ্বশান্তি তহবিল স্থাপন করা যাতে বিবেকবান যুদ্ধবিরোধী করদাতারা আয়করের সামরিক খাতের অংশটুকু বাৎসরিক আয়করের সঙ্গে সরকারি তহবিলে জমা না দিয়ে এই তহবিলে জমা দিতে পারেন। একটি বোর্ড অব ট্রাস্টি গঠন করা হবে তহবিলের যথাযথ ব্যবহার এবং প্রয়োগ করার জন্য। হিসেব করে দেখা গেছে, এই বিল পাশ হবার প্রথম বছরেই তহবিলে ৪ বিলিয়ন ডলার জমা পড়বে। তহবিলের যথার্থ প্রয়োগের কার্যক্রমে প্রথমেই রয়েছে একটি জাতীয় শান্তিসংস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা। নিরস্ত্রীকরণ, অসামরিক ও অহিংস পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে গবেষণা, সামরিক নানাবিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদের পুনঃশিক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি আরো অনেক পরিকল্পনা আছে। তা ছাড়া রয়েছে বিশ্বমৈত্রী রক্ষার জন্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়, এবং বিশ্বমঙ্গলের জন্য বহুবিধ শান্তিবাদী পরিকল্পনা। জনসাধারণকে যুদ্ধের অযৌক্তিকতা এবং শান্তির মূল্য সম্বন্ধে সজাগ করে তোলাও এই কার্যক্রমের একটি লক্ষ্য।

এই প্রস্তাব অনুযায়ী করদাতারা তাঁদের ট্যাক্সফর্মে নিজেদের বিবেকবাদী করবিরোধী বলে ঘোষণা করতে পারবেন। ট্যাক্স-কমিশনার বা অন্যান্য সরকারি কর্মচারী ইচ্ছে করলে সেই ব্যক্তির উক্তির যাথার্থ্য যাচাই করতে পারেন যে-কোনো উপায়ে। সংবিধানে যেভাবে ধর্মের ভিত্তিতে অনেককে যুদ্ধের জন্য ড্রাফট করা বা নাম লেখানো থেকে রেহাই দেওয়ার সংস্থান আছে, অথচ যাচাই করারও উপায় আছে, ঠিক সেইভাবে, কর দিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তির নৈতিক আপত্তিকে যাচাই করা যেতে পারে।

বোর্ড অব ট্রাস্টির এগারো জন সদস্য থাকবে। রাষ্ট্রপতি তাঁদের ন জনকে নিয়োগ করতে পারবেন—কিন্তু একই রাজনৈতিক দল থেকে পাঁচ জনের বেশি আসতে পারবেন না। বাকি দু জন আসবেন কংগ্রেস আর সেনেট থেকে মনোনীত হয়ে। বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্বন্ধে সক্রিয়, অভিজ্ঞ ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিই শুধু নিয়োজিত হতে পারবেন। এককালীন নিয়োগ দু বছরের জন্য।

WPTF-এর জাতীয় সংসদ ১৯৭২ সাল থেকে এই বিলটি পাশ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু কংগ্রেস বা আদালতের নানা IRS মামলায় তেমন সফল হতে পারে নি। WPTF-এর আন্দোলনের হাত আরও শক্ত করার জন্য তাই সি. এম. টি সি'র সূচনা।

আগেই বলা হয়েছে, বর্তমান কার্যক্রমে সি. এম. টি. সি'র লক্ষ্যমাত্রা হল তাদের প্রস্তাবের সমর্থনে এক লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ। WPTF-এর জাতীয় সংসদ আইনসঙ্গত নানা উপায়ে নানা চাপ সৃষ্টি করেও বিলটিকে সেনেটে পাশ করতে পারে নি। সেই কারণেই সি. এম. টি. সি'র আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রবর্তন। প্রথমে আইনসঙ্গত উপায় অবলম্বন, তা ব্যর্থ হলে পরে আইন-অমান্যে যাওয়ার ধাপে-ধাপে অগ্রগতিতে এ আন্দোলনের সঙ্গে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আকারগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে নৈতিক কারণে (on the ground of conscience) সামরিক বাহিনীতে নাম লেখানো থেকে রেহাই পাওয়া যায়, 'ড্রাফটিং-এর যুগেও যেত। এখন তার বদলে 'রেজিস্ট্রেশনে'ও ধর্মীয় কারণে ব্যতিক্রম হয়। অর্থাৎ ১৮ থেকে ২২ বছরের সুস্থদেহী ছেলেদের ওপর বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে নাম লেখানোর যে আইন আছে, ধর্মের কারণে (যদি সে ধর্ম রক্তপাতবিরোধী হয়) তার থেকে রেহাই পাওয়া যায়। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, ধর্মের ভিত্তিতে হতে পারে কিন্তু নিছক নৈতিক কারণে নয়। সুতরাং নিছক নৈতিক কারণে কেউ আইন ভাঙলে (যেমন রেজিস্ট্রেশন না করলে) সে কাজ দণ্ডনীয়। সি. এম. টি. সি'র প্রস্তাবটির মূল উদ্দেশ্য সামরিক কর দিতে অস্বীকার করা। স্বাক্ষরকারীরা শপথ নেবেন যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস সামরিক খাতে কর দেওয়ার বিকল্প (World Peace Tax Fund-এর মতো) ব্যবস্থা গ্রহণ না করছে, ততদিন পর্যন্ত তাঁরা নৈতিক কারণে ফেডারেল ট্যাকসের সামরিক শতাংশটুকু দেবেন না। ইতিমধ্যেই বহু করদাতা কর দেওয়া বন্ধ করেছেন, অন্যান্যভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সামরিক বাজেটের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সক্রিয় ভাবে যোগ দিয়েছেন। অনেকে এখনো কর দিতে অস্বীকার না করলেও তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, এবং সি. এম. টি. সি'র পক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করছেন।

অভিনব এই আইন-অমান্য আন্দোলনের শান্তিবাদী উদ্যোক্তারা নিজেদের আন্তরিক আগ্রহে অল্প মূলধনে আমেরিকার পূর্ব থেকে পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ পরিধিতে জনসাধারণকে সচেতন করার কাজে সচেষ্ট। বিভিন্ন রাজ্যে তারা সফলভাবে তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেকেরই দৃঢ় প্রত্যয় অর্জন করতে পেরেছে। নামমাত্র বেতনে কিছু পূর্ণ সময়ের কর্মচারীও রাখতে হয়েছে অফিসের সংগঠন আর প্রচারের কাজে সাহায্য করার জন্য। তবে তাঁরাও আদর্শের জন্যই কাজ করছেন। সি. এম. টি. সি. সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সংস্থা—শান্তিবাদী সদস্যদের স্বেচ্ছাদানেই এর তহবিল। আন্দোলনের দুটি পর্যায়: কর অস্বীকার এবং শান্তির খাতে সেই টাকার পুনঃ-চালনা। এক কথায়, যুক্তরাষ্ট্রের জঙ্গিনীতির বিরুদ্ধে তাদের শান্তিপূর্ণ জেহাদ। 'মানুষ মারতে টাকা নয়, বাঁচবার জন্য টাকা' —এই তাদের স্লোগান।

পাঁচটি স্তরে ট্যাক্স সম্পর্কিত আইন অমান্য করার প্রস্তাব জানিয়েছে সি. এম. টি. সি। ১৫ই এপ্রিলের আগে ট্যাক্স-অমান্যকারী ধাপে-ধাপে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন। বিকল্পও রয়েছে অনেকগুলি। প্রথম স্তর: নৈতিক ভিত্তিতে উপলব্ধি যে ফেডারেল ট্যাক্সের বেশির ভাগটারই ব্যবহার হয় আমাদের ন্যায়বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কারণে। দ্বিতীয় স্তর: ফেডারেল ট্যাক্স দিয়ে যে আমরা ব্যক্তিগত-

ভাবে যুদ্ধপ্রস্তুতির সাহায্য আর সমর্থন করছি—এই উপলব্ধিতে পৌঁছনো। তৃতীয় স্তর: নতুন কোনো পন্থার কথা চিন্তা করা। চতুর্থ স্তর: নিজের নৈতিক প্রত্যয়কে প্রকাশের জন্য সমর্থনযোগ্য এবং কার্যকর কোনো উপায় বের করা। সি. এম. টি. সি. রীতিমত পেশাদার আইনজ্ঞদের বিশ্লেষণে বহু বিকল্প পন্থার লিখিত পরামর্শ দিয়েছে তাদের ইস্তাহারে। এর একটি বা একাধিক অবলম্বন করে যে-কেউ নৈতিক কারণে ফেডারেল ট্যাক্স অমান্য করতে পারে। এই পন্থাগুলি প্রতিবাদ বা ট্যাক্স এড়িয়ে যাওয়ার বিভিন্ন বিকল্প। যাতে অমান্যকারীরা কোনো অন্যায় সুযোগ না নেয়, তার জন্য সযত্নে এই উপায়গুলি উদ্ভাবন করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, খুব দেরি করে ট্যাক্স জমা দিতে, ট্যাক্সের সঙ্গে প্রতিবাদপত্র পাঠাতে বা আংশিক ট্যাক্স না দিয়ে অন্য কোনো বিকল্প তহবিলে জমা দিতে, আইনের যে-কোনো প্রতিভূর কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠাতে। তা ছাড়া, ট্যাক্স কমিশনার, পুলিশ, টি. ভি, রেডিও সবাইকে জানানো—কেন ট্যাক্স অস্বীকার করা হয়েছে। কারো যদি ট্যাক্স দেয় না হয়, তবুও সে ফর্মে শুধু নাম-ঠিকানা লিখে অসহযোগের কারণ জানাতে পারে।

ট্যাক্স এড়ানোর পরামর্শটি আরো মজার। বলা হয়েছে 'চেষ্টা করো যাতে আয় করধার্য সীমার চেয়ে নীচে থাকে', ট্যাক্স দিতে হয় না এমন সব বস্তু কেনো অথবা 'আয়ের অর্ধেক শান্তিবাদী, ধর্মীয় বা জনহিতৈষী সংস্থায় দান করো' যাতে ট্যাক্স দিতে না হয়।

অস্বীকার (refusal) ও পুনঃচালনার (redirection) কথা আগেই উল্লেখ করেছি। অস্বীকার সম্পূর্ণ বা আংশিক হতে পারে। টেলিফোনের ফেডারেল ট্যাক্সের যে অংশ (বোধ হয় দুই শতাংশ) সামরিক বাজেটে যায়, সে অংশ না দিয়ে তার কারণ ব্যাখ্যা করা খুব প্রচলিত পন্থা। এই অংশের পরিমাণ এত কম হয় যে টেলিফোন কোম্পানিও সহজে তার জন্য মামলার ঝামেলা করতে চায় না। অথচ শান্তির খাতে সে টাকা জমা পড়ে, আবার প্রতিবাদও প্রকাশ হয়। সম্পূর্ণ ট্যাক্স অস্বীকার করে শুধু নামঠিকানা লিখে ফর্ম পাঠিয়েও প্রতিবাদ করা যায়। আবার দুই-এক ডলারের মতো সামান্য পরিমাণ টাকা মোট দেয় করের থেকে কেটে রেখে তার ব্যাখ্যা করা যায়। পুনঃচালনা অংশটুকুই কর অস্বীকারকে নিঃস্বার্থ করে তুলেছে। এটা যে সাধারণ ট্যাক্স ফাঁকি নয়, তা প্রতিষ্ঠিত হবে যদি অমান্যকারীরা না-দেওয়া ট্যাক্স অন্য সংগঠনমূলক তহবিলে জমা দেন। বিকল্প ব্যবস্থা নানারকম হতে পারে, এমনকী সরকারের অসামরিক কোনো বিভাগের নামে চেক দিয়ে ট্যাক্স দেওয়াও যেতে পারে। IRS সেই চেক ভাঙাতে পারবে না, যদি ভাঙাতে যায় সেটা বে-আইনি এবং সেক্ষেত্রে আইনত ট্যাক্স-দাতা সে টাকা ফেরত পাবে।

ট্যাক্স-অমান্যকারীদের দু-চারটি উদাহরণ দিলে তাদের বিভিন্ন রীতির ও মনোভাবের পরিচয় মিলবে। কেউ ট্যাক্স না দিয়ে পেনালটি দিয়েছে সগর্বে। কেউ-বা সংবাদপত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নীতির তীব্র নিন্দা করেছে চিঠি দিয়ে—যদিও তার অনেকগুলোই প্রকাশিত হয় নি। কেউ তার শান্তিবাদী ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণ বিবেকের কারণ দেখিয়ে ট্যাক্স দেয় নি। কোয়েকারদের অহিংস ঐতিহ্যও অনেককে ট্যাক্স না দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। অনেক ট্যাক্স-অমান্যকারীদের যুক্তি আবার ন্যুরেমবার্গ সিদ্ধান্তের অনুসারী। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রথমত, যে-কোনো অন্যায়ের জন্য সবারি ব্যক্তিগত দায়িত্ব আছে, সে কাজ শুধু আজ্ঞাপালনমাত্র হয়, তবুও। দ্বিতীয়ত, কোনো অন্যায় নির্দেশ যদি উর্ধ্বতন ব্যক্তির কাছ থেকে আসে, তা অমান্য বা অগ্রাহ্য করার আইনগত অধিকার যে-কোনো নিম্নতর

কর্মচারীর আছে। অনেকেই এই নৈতিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে তাঁদের বিবৃতিতে ট্যাক্স অমান্যের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, তাঁদের দেওয়া টাকা যদি পেনটাগন (যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগের প্রধান সংস্থা) অন্যায় কাজে ব্যবহার করে, তাহলে সে ধ্বংসমূলক কাজের নৈতিক দায় তাঁদেরও। সুতরাং সামরিক খাতে কোনো সাহায্য তাঁরা ট্যাক্স দিয়ে করবেন না।

White Plains-এর চার্লস সহাইনার তাঁর ন হাজার ডলার দেয় ট্যাক্স IRS-কে না পাঠিয়ে Greater Westchester বিকল্প তহবিলে জমা দিয়েছেন এই বলে যে ধ্বংসের কাজে সাহায্য না করে তিনি বিভিন্ন গঠনমূলক কাজের জন্য (যেমন শিশুদের দিনরাতের নার্সারি, বাস-প্রকল্প, স্বাস্থ্য-প্রকল্প ইত্যাদি) তাঁর দেয় টাকা পাঠিয়েছেন। যুক্তি? শান্তিবাদী মনোভাব ও যুদ্ধের অযৌক্তিকতা ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাস।

আরেকটি অভিনব উপায়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের জোয়ানা ও অ্যালফ এঙ্গেলক্যাম্প। অ্যাবারস্ট্‌ইথ-এ তাঁদের দোকান আছে। ১৯৮২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত দেয় করের শতকরা পঁয়তাল্লিশভাগ তাঁরা এবং কর্মচারী জেন মুর দেন নি। সম্প্রতি যদিও তাঁদের বাকিটা জমা দিতে হয়েছে, তাঁরা দিয়েছেন এক অভিনব উপায়ে। ট্রাইডেনট ক্ষেপণাস্ত্রের একটি ৬ ফুট লম্বা প্রতিকৃতি তৈরি করে তার গায়ে তাঁরা অন্তঃশুল্ক বিভাগকে চেকটি লিখে দেন। বিভাগের কর্মচারীদের ওই বিশাল ট্রাইডেনটরূপী চেকটিকে কাউনটারের ওপর থেকে গ্রহণ করে রসিদও দিতে হয়েছে। পরের কিস্তির জন্যও তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, এবং সম্পত্তি ক্রোক হওয়ার জন্যও তৈরি হচ্ছেন।

যেভাবেই হোক, ট্যাক্স না দেওয়া গুরুতর ব্যাপার, সুতরাং সি. এম. টি. সি. বারবার সতর্ক করে দিয়েছে যাতে কেউ আইনের পরামর্শ বা তাদের সাহায্য ছাড়া হঠাৎ কিছু না করতে যায়। সবক্ষেত্রেই অমান্যের কারণ ব্যাখ্যা-সমেত চিঠি বা নোট যেন অবশ্যই থাকে, এদিকেও সবাইকে যত্নবান হতে উপদেশ দেয়।

সি. এম. টি. সি'র আইন অমান্যের পরিকল্পনা মূলত C. O (Conscentious Objector) অর্থাৎ যারা নৈতিক কারণে যুদ্ধে যেতে আপত্তি জানিয়েছে এবং ড্রাফট বা রেজিসট্রেশনের বিরোধিতা করেছে তাদের নৈতিক সমর্থন জানাবার জন্য। আমেরিকান সংবিধানের ড্রাফট ল'-টি বহুবিতর্কিত। বহু-নিন্দিত হয়েছে দেশে ও বিদেশে। এই আইন অনুযায়ী আঠারো থেকে বাইশ বছরের সুস্থদেহী প্রত্যেকটি ছেলেকে অন্তত দু বছরের জন্য মিলিটারিতে যোগ দিতে হবে। যারা কলেজে পড়ছে তারা এবং যে বাবা-মার অন্য ছেলে বা ছেলেরা যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে, তাদের ছেলে ছাড়া রেহাই পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার শুধু ধর্মের খাতিরে হতে পারে। অর্থাৎ যাদের ধর্মের অনুশাসন রক্তপাতবিরোধী, তারা এই বাধ্যতামূলক যুদ্ধে যাওয়া থেকে রেহাই পেতে পারে। তবে তাদেরও নন্‌-কম্‌ব্যাটান্‌ট সার্ভিস (সৈন্যদের জন্য অন্যান্য কাজে, যেমন চিকিৎসা বা রান্না ইত্যাদি) করতেই হবে ন্যূনতম সময়ের জন্য। ষাটের দশকে দলে-দলে তরুণ ড্রাফট কার্ড পুড়িয়েছে, জেল খেটেছে, পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে। ড্রাফটবিরোধী কার্যকলাপে প্ররোচিত করার জন্য কারাবরণ করেছেন অনেক বুদ্ধি-জীবী আর সমাজসেবী। আইনটি বৈষম্যমূলক, অযৌক্তিক, সংবিধানের অন্যান্য অনেক আইনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন, নৈতিক কারণে অন্যায় বলে বহুবার বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মহলে। অবশেষে এটি পরিত্যক্ত হল ঠিকই, কিন্তু তার বদলে এল 'রেজিস্ট্রেশনে'র আইন। তফাত খুব একটা নেই—যুদ্ধে

যোগ দেওয়ার বদলে নাম লেখানো হল বাধ্যতামূলক, ধর্মের কারণে ছাড়া ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। তরুণরা স্বাভাবিক কারণেই ক্ষুব্ধ, তাদের বাবা-মায়েরা স্বাধীনচেতা সন্তানের প্রতি রাজরোষের ভয়ে শঙ্কিত —উচ্চশিক্ষা এবং নানা পেশাগত বিভিন্ন সুযোগ এই আইন অমান্য করলে তো হারাবেই, তা ছাড়া শাস্তির সম্ভাবনাও আছে। যুদ্ধফেরত ব্যক্তির জন্য যেমন বিশেষ সুবিধা, স্কলারশিপ ইত্যাদি আছে, রেজিস্ট্রেশনের নম্বর তেমনি বহু স্কলারশিপ বা চাকরির দরখাস্তে দিতেই হবে। ছাত্ররা এ নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও খুব একটা লাভ হয় নি, যেহেতু আইনটি এক বিশেষ বয়সের এবং শুধুমাত্র ছেলেদের পক্ষেই প্রযোজ্য—সমাজের অন্যেরা প্রতিবাদ জানাতে ওই বিশেষ আইনটি ভঙ্গ করতে পারছে না। সুতরাং এই অন্যায় আইনটির বিরুদ্ধে C. O.-এর নৈতিক সমর্থন জানাতে অন্যদের (অর্থাৎ যারা ওই দুর্ভাগা 'আঠারো থেকে বাইশ গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ছে না') পরোক্ষ আইন অমান্য করতে হবে—অন্য কোনো আইন ভঙ্গ করে। সি. এম. টি. সি'র অভিযান, তাই ট্যাক্স অস্বীকারের মাধ্যমে C. O.-দের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানাবার জন্য। এই উদ্দেশ্যই তাদের প্রারম্ভিক লক্ষ্য ছিল, তবে তাদের কার্যকলাপ শুধুমাত্র প্রতীকী নয়। যথেষ্ট সুচিন্তিত ও সুদূর-প্রসারী কর্মধারার পরিকল্পনা হয়েছে সম্পূর্ণ কার্যক্রমে। এই তিন-চার বছরের মধ্যেই এত বড়ো দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংগঠনী কেন্দ্র, অফিস খোলা হয়েছে; পরামর্শ, উপদেশ, বক্তৃতা, আলোচনা-সভার আয়োজন হয়েছে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক স্তরে। WPTF-এর বিল এখনও পাশ হয় নি বলে ইতিমধ্যেই তারা WPTF-এর জন্য একটি Escrow account চালু করে ফেলেছে। শত-শত ট্যাক্স-অমান্যকারীদের যে অংশ এতে জমা পড়েছে, এই ক বছরেই তার পরিমাণ ২৫০,০০০ ডলার।

সি. এম. টি. সি-র অসহযোগ আন্দোলন যে অহিংস এবং বেআইনি হলেও কার্যকর হবে তার অভিনব উপায় অবলম্বনের জন্য, তা এখনই আশা করা যাচ্ছে।

মতামত

"সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজবাদের পুনর্নবীকরণ"

পৃথিবী জুড়ে তাঁতির টানে
অধ্যাপক জয়ন্ত রায়ের জোয়ারের গান

ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে কোনো দেশে যখন নানান ধরনের ছোটো, বড়ো বা নতুন সমস্যা দেখা দেয়, তখন সেদেশের মানুষ সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য হয়। আর কার্য-কারণের প্রভাবে কখনো-কখনো তা বৃহত্তর মানবসমাজকেও ভাবায়। মানুষ তখন প্রয়োজনীয় সমাধানের সন্ধানে এগিয়ে চলে। যেমন, ১৯১৭-র পর "একদা নিষিদ্ধ দেশ ও পাপের সাম্রাজ্য" সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্মপ্রবাহ অগ্রগামী বৃহত্তর মানবসমাজের চিন্তাচেতনায় স্থান পেয়েছিল। ৭০ বছর পর আজ আবার ভিন্ন প্রেক্ষিতে 'সমাজতন্ত্রের সংকট নিরসনে' সোভিয়েতের নতুন পদক্ষেপ—পেরেস্ত্রোইকা গ্লাসনস্ত—বৃহত্তর মানবজীবনের চিন্তাচেতনার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই পটভূমিতে "চতুরঙ্গ" পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় অধ্যাপক জয়ন্তকুমার রায়ের লেখাটি পড়লাম—কিছু জিজ্ঞাসা আর জানবার আগ্রহ থেকে। "চতুরঙ্গ" পত্রিকা রায়ের লেখাটি উপস্থাপনা করেছেন এইভাবে: 'পেরেস্ত্রোইকা নিয়ে তোলপাড় সোভিয়েত দেশে সপ্তাহি সফর শেষ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অধ্যাপক জয়ন্ত রায়ের দীর্ঘ প্রতিবেদন "সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজবাদের পুনর্নবীকরণ"।

এর আগে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা আরো কিছু রচনা পড়বার সুযোগ হয়েছে। তার মধ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সোভিয়েতের প্রথম 'বসন্তকালের' বিবরণ দিয়েছেন অনেকে। যেমন, একজন সমাজসচেতন গায়কের অভিজ্ঞতায় 'সত্যি রাশিয়ায় এখন মুক্ত হাওয়া। দীর্ঘ সত্তর বছর যে স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের সুযোগ না পেয়ে গুমরে গুমরে মরছিল রুশদের অন্তরে, গ্লাসনস্তের দৌলতে আজ তা উদ্দাম, উত্তাল'। এই গায়ক এর আগে আরও দুবার রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। এজাতীয় উদাহরণ আরো পাওয়া গেছে। উদ্ধৃতির বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। তো, তাঁদের সাথে অধ্যাপক রায়কে এক গোত্রে ফেলা যায় না। কারণ, তিনি ঐতিহাসিক। কারণ, ঐতিহাসিকের তথ্য আর তত্ত্বের নিরিখে সত্য-যাচাইয়ের নিষ্ঠার দায়বদ্ধতা অন্য সবার কাছে আশা করা যায় না। এবার দেখা যাক অধ্যাপক রায় কী বলতে চেয়েছেন।

পেরেস্ত্রোইকা আর গ্লাসনস্তের সাথে 'সেতুস্বরূপ' আরো একটি শব্দ খোজরাশচট সহ রায় ১১,০০০-এর বেশি শব্দ ব্যবহার করে ২৫ পৃষ্ঠা জুড়ে একটি 'ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজবাদের পুনর্নবীকরণ' (পৃ ১০১৭) সম্পর্কে লিখেছেন। তাতে তিনি 'অর্থনৈতিক', 'রাজনৈতিক প্রশাসনিক' এবং 'সামাজিক-সাংস্কৃতিক' পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ার নতুন মুক্ত জাগরণের কথা তথ্য আর পরের পর উদ্ধৃতি দিয়ে তুলে ধরেছেন। লেখাটি রায়ের সদ্য-রাশিয়া-ফেরত অভিজ্ঞতায়ও পুষ্ট।

ওই তিনটি বিষয়ে অধ্যাপক রায় রোয়ালড সাগদেথেভ থেকে শুরু করে লিওনিদ আবালকিন, ভিকতর নোভোজিলোভ, বোরিস বোলাতিন বা গোরবাচেভ সহ এক ডজনেরও বেশি বিশেষজ্ঞদের যে-সমস্ত মতামত আর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন, তাঁরা দাবি করেন, 'ভ্রষ্ট সমাজবাদ বা স্তালিনবাদ থেকে তাঁরা সার্থক সমাজবাদ বা লেনিনবাদে ফিরে যেতে চান' (পৃ ১০১৮)। এবং এই এক ডজনেরও বেশি বিশেষজ্ঞদের বিস্তৃত উদ্ধৃতিগুলি এতই সমগোত্রীয় যে একজন বা দুজনের বক্তব্য উদ্ধৃত করলেই রায় যা বলতে চেয়েছেন তা স্পষ্টভাবে বোঝা যেত। কারণ, অধ্যাপক রায়কে তাঁরা যেভাবে 'স্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন' তিনিও সেইভাবে নিজের ঐতিহাসিক নিষ্ঠাকে বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে পেরেস্ত্রোইকার জয়গানে মুখর করে তুলেছেন। এবং রায় স্তালিন আমলকে নস্যাৎ করেছেন পেরেস্ত্রোইকার অনুগামীদের মতোই—ঐতিহাসিক তথ্য আর তত্ত্বের বাস্তব বিচার ছাড়াই। ঐতিহাসিকের এ-জাতীয় নিষ্ঠা (!) পাঠকদের সত্যিই বিচলিত করে তোলে।

স্তালিন আমলকে নস্যাৎ করবার জন্য প্রচলিত তথ্য আর শব্দগুচ্ছের বাইরেও এখন আরো কিছু-কিছু তথ্য নিয়মিত আমরা পাচ্ছি—গ্লাসনস্তের কল্যাণে। যেমন, ভীতসন্ত্রস্ত স্তালিন পুরো বালটিক প্রজাতন্ত্রসমূহ ও ইউক্রেনের কিছু অংশ হিটলারকে উপঢৌকন দিয়ে জার্মানির সাথে চুক্তি করতে চেয়েছিলেন। এ অভিযোগ এনেছেন লেফটেনানট-জেনারেল নিকোলাই পাভলেঙ্গে—এখন যিনি একজন ঐতিহাসিকও বটে। বা, রাশিয়ার কোনো প্রান্তরে কিছু কঙ্কাল পাওয়া গেলে তাও সহজেই ঐতিহাসিক স্বীকৃতি পেয়ে যাচ্ছে—স্তালিনের আরো একটি নির্মমতার নিদর্শন হিসাবে। না, রায় তাঁর লেখায় এ দুটির উদ্ধৃতি তুলে দেন নি। তাই, এ দুটি তথ্যের সত্যাসত্য যাচাইয়ের দায় অবশ্যই অধ্যাপক রায়ের নয়।

॥ ১ ॥ এবার ঐতিহাসিক অধ্যাপক জয়ন্তকুমার রায়কে কয়েকটি প্রশ্ন করা যাক। প্রথমত, অর্থনৈতিক দিক।

রায় লিখছেন, 'একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে তখনই সফল বলা চলে যখন তা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রকৃত উন্নতি ঘটাতে পারে' (পৃ ১০১৭)। রায় লিখছেন, 'সেই ১৯২৯-৩০ সাল থেকেই অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রচলন হয়, তার সঙ্গে আসে ব্যক্তিপূজা এবং খামখেয়ালি, অবাস্তব আদেশ-নির্দেশ-নির্ভর প্রশাসন। ফলে উৎপাদনের উপায়ের সামাজিক মালিকানার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থের যে সংমিশ্রণ ঘটলে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পথ সুগম হয়, তা সোভিয়েত ইউনিয়নে অলভ্য হয়ে যায়। ওই সংমিশ্রণের প্রয়াস পেরেসত্রোইকার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ' (পৃ ১০১৮)। আমি এখানে 'ব্যক্তিগত স্বার্থের যে সংমিশ্রণ ঘটলে' শব্দ কয়েকটির নীচে দাগ দিয়ে রাখলাম। কারণ আপনার পুরো আলোচনায় বিভিন্নভাবে শব্দ-কটি ব্যবহৃত হয়েছে।

রায়কে জিজ্ঞাস্য হল, 'স্তালিন এবং তাঁর অনুচরবৃন্দ' (পৃ ১০১৯)-এর আমলে সোভিয়েতে 'সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রকৃত উন্নতি' কি হয় নি? ইতিহাস কী বলে? একটি কৃষিভিত্তিক, সব দিক থেকে অনগ্রসর, অনুন্নত দেশ ও জাতি কি স্তালিনের আমলেই কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-সংস্কৃতির দিক থেকে বিশ্বমানচিত্রে প্রথম সারিতে উঠে আসে নি? ঐতিহাসিক রায় কী বলেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। বিনা তর্কে প্রথমে মেনে নেওয়া যাক—দীর্ঘ ৭০ বছর সোভিয়েত অর্থনীতির সুষম বিকাশ ঘটে নি। তাহলে কি প্রশ্ন করা যায় না—স্তালিনের মৃত্যুর (১৯৫৩) পর দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সোভিয়েতের কর্ণধার যাঁরা ছিলেন, তাঁদের দায়দায়িত্ব পালন সম্পর্কে? পেরেসত্রোইকা, গ্লাসনস্ত বা খোজরাশচট-এর প্রবক্তারা স্তালিন-পরবর্তী রাষ্ট্রনেতা-পার্টিনেতাদের সম্পর্কে নীরব কেন? এবং অধ্যাপক জয়ন্ত রায়ও নীরব। কিন্তু, কেন?

তৃতীয় প্রশ্ন, অধ্যাপক রায় নিশ্চয় বুখারিনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা পড়েছেন। একটি *The Road to Socialism and the Worker-Peasant Alliance* (১৯২৫) এবং অপরটি *Notes of an Economist* (১৯২৮)। সমাজতন্ত্রের সংকটনিরসনে গোরবাচেভরা আজকে শুধু বুখারিনকে পুনর্বাসনই দেন নি, তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনাতেই আশ্রয় নিয়েছেন। এবং আপনি রায় সচেতন-ভাবে যেখানে লিখছেন, 'ব্যক্তিগত স্বার্থের যে সংমিশ্রণ ঘটলে...', সেখানেই আজকের সোভিয়েত শাসকশ্রেণীর বুখারিনকে পুনর্বাসন দেওয়ার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, বুখারিন-নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রটি সম্পর্কে লেনিন আর গ্রামসি স্পষ্ট ভাষাতেই বলে গেছেন—বুখারিন 'ডায়লেকটিকস' বোঝেন না।

এবং ১৯৩৭ এ লেখা এবং সুদীর্ঘ ২৫ বছর 'স্মৃতিতে গেঁথে রাখা' বুখারিনের চিঠি লারিনা যখন ১৯৬১ সালে প্রকাশ করেন, তখন তা যত না আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, আজকেও তার থেকেও বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ওই চিঠির। কারণ, বুখারিনকে গোরবাচেভের প্রয়োজন। জেনে হোক, না জেনে হোক, অধ্যাপক রায়, আপনারও প্রয়োজন। কারণ, তা না হলে আপনি কী করে লেখেন 'যৌথ খামার ছিল অনেক সময়েই সরকারি খামারের নামান্তর এগুলির রাশীকৃত অব্যবস্থার কুফল সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৮০-র দশকেও অনুভূত হচ্ছে' (পৃ ১০১৯)। বা 'এর বিষময় ফল ছিল নানাবিধ। মানবজাতির ইতিহাসে একটি জঘন্যতম গণহত্যা বা কৃষকবধ অনুষ্ঠিত হল' (পৃ ১০১৯)। এসব কথা অনেক বার শোনা হয়ে গেছে। ইতিহাসের কোন্ সন্ধিক্ষণে, কী প্রয়োজনে শুধু বুখারিন নয়, কুলাকদের তীব্র বিরোধিতার মধ্যে "যৌথ খামার" প্রবর্তন করতে হয়েছিল, তার একটু গভীরে প্রবেশ করুন না। আপনি তো ঐতিহাসিক। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিশ্লেষণে ওই সময়ের প্রধান দ্বন্দ্ব আর প্রয়োজনটি অনুধাবন করতে আপনার অসুবিধা কোথায়?

চতুর্থ। অর্থনীতির সার্বিক বিকাশের প্রশ্নে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মূলধনসঞ্চয়ের পদ্ধতি কী হবে? ১৯২৪ সালে অর্থনীতি-বিদ প্রিওব্রেঝনস্কি এ বিষয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব পেশ করেন। মানুষের ইতিহাসে ধনতন্ত্রের বিকাশপর্বে মূলধন সঞ্চারিত হয়েছিল উপনিবেশ লুণ্ঠন করে। সমাজতন্ত্রে তা সম্ভব নয়। শিল্প-উন্নত দেশের মতো শিল্প থেকেও উদ্বৃত্ত-সঞ্চয় হবে না।

তাহলে উপায় ? হ্যাঁ, এক এবং একমাত্র উপায় কৃষি তথা গ্রাম থেকে উদ্বৃত্ত সঞ্চয়। অর্থাৎ শিল্প-উন্নয়নের স্বার্থে কৃষকদের উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করতেই হবে। এবং কোথাও-কোথাও প্রান্তিক উৎপাদকের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে "বলপ্রয়োগের" কিছু ঘটনা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সেই সময়ের প্রেক্ষায় দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে "কমানড ইকনমি"র বিকল্প দ্বিতীয় কোনো পদ্ধতি আপনার জানা আছে কি ? 'নেপ'-এর কথা স্মরণে রেখেই বলছি—আপনার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পদ্ধতি যদি কিছু জানা থাকে, জানালে উপকৃত হব। নিজের চিন্তাভাবনা সংশোধনের সুযোগ পাব।

পাঁচ। অধ্যাপক রায় লিখছেন, 'যেগুলি সমাজবাদী ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হিসাবে দীর্ঘকাল পরিগণিত, পর্যালোচনায় প্রতিষ্ঠিত হবে যে ওই নীতিগুলি সুচিন্তিত ছিল না, এবং এগুলি কর্মে অনীহার প্রধান কারণ'। তাই 'ভণ্ডামিমুক্ত পেরেস্ত্রোইকার প্রবক্তারা নির্দ্বিধায় এসব নীতিকে বিপজ্জনক গোঁড়ামি বা কল্পনাবিলাস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন' (পৃ ১০২১)। সুতরাং 'পেরেস্ত্রোইকা, গ্লেজনোস্ত আর গ্লাসনস্ত থেকে যে নোতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার যুগ শুরু হয়েছে, তা পুরনো যুগে যা ছিল অকল্পনীয়, তাই এখন হয়ে উঠেছে প্রেরণাদায়ী বাস্তবতা' (পৃ ১০২২)। কী সেই প্রেরণাদায়ী বাস্তবতা ? 'কর্মীরা জীবনে প্রথম তাঁদের আয়ের ওপর কর্তৃত্ব অর্জন করেছিলেন' (পৃ ১০২২)। অর্থাৎ 'বাজারের শক্তিগুলিকে (যা বাজারের উৎস বা বাজার থেকে উদ্ভূত) নিষিদ্ধ করার ফল হল ব্যক্তির উদ্যম ও স্বাধীনতাকে খর্ব করা' (পৃ ১০২৪)। অর্থাৎ 'ব্যক্তিগত স্বার্থের যে সংমিশ্রণ ঘটলে' সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে বাজার, পণ্যমূল্য, লাভ, চাহিদা, যোগান, পণ্যের-মান ইত্যাদি বিষয়ক মৌলিক পার্থক্যগুলি গুলিয়ে যায়। অধ্যাপক রায়, আপনার কি তাই হয়েছে ?

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, এই প্রশ্নগুলি সমাজতন্ত্রের দক্ষতার প্রশ্ন, ধনতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন। একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রশ্ন। সেখানে 'ব্যক্তিগত স্বার্থকে পুষ্ট' (পৃ ১০২০) করার প্রশ্ন আসে না। বা 'ব্যক্তিগত উদ্যমের জন্য আর্থিক পুরস্কারের' (পৃ ১০২৫) প্রশ্ন ওঠে না।

২ রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সংস্কার প্রসঙ্গে।

জয়ন্ত রায় লিখছেন, 'পেরেস্ত্রোইকা আর গ্লাসনস্তের একটি প্রধান লক্ষ্য হল পার্টির ব্যাপারে লেনিনবাদকে ফিরিয়ে আনা' (পৃ ১০৩৫)। এবং প্রসঙ্গত, তাতিয়ানা আসলাভাস্কায়ার উদ্ধৃতি আপনি এভাবে তুলে ধরেছেন, 'মানুষের আচরণের মূল শক্তি বা প্রেরণা আসে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ থেকে, যার ভিত্তিতে একজন মানুষ তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য রচনা করে' (পৃ ১০৩৬)। আপনি আরও লিখছেন, 'সোভিয়েত জনসাধারণের মধ্যে নানা গোষ্ঠী আছে, এবং তাদের স্বার্থ ও আশা আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র। এই বৈচিত্র্য কোনো শ্রেণীদ্বন্দ্ব সূচিত করে না' (পৃ ১০৩৬)। আর উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই—সে আপনারই হোক, বা আপনার উল্লিখিত বিশেষজ্ঞদেরই হোক।

আপনি এবং উল্লিখিত বিশেষজ্ঞরা বারংবার 'লেনিনবাদ' ফিরিয়ে আনার কথা বলেছেন বা লিখেছেন। কিন্তু কোথায়ও 'মার্কসবাদ'-নামক বিষয়টির সঙ্গে একে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করেন নি। তো, আপনাদের মতো আমিও ধরে নিচ্ছি উক্ত দুটি বিষয়ের সম্পর্কের নিবিড়তা চর্চা স্মরণে রেখেই আপনারা 'লেনিনবাদকে' ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী। মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের মৌলিক নীতির সাথে 'ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ' অথবা 'শ্রেণীদ্বন্দ্ব সূচিত করে না' বিষয়গুলি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না। অধ্যাপক রায় বিষয়টি যদি একটু বুঝিয়ে লেখেন !

৩ প্রসঙ্গত সাংস্কৃতিক দিকটি

'সোভিয়েতে ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পুনর্নবীকরণের তৃতীয় অর্থাৎ সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিকটি বুঝতে গেলে প্রাক্-পুনর্নবীকরণ যুগসমূহের নৈতিক দেউলেপনার ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে' (পৃ ১০৩৭)। এই নৈতিক দেউলেপনা আলেকজানদার ভোলোভিনের মন্তব্যে আপনি তুলে ধরেছেন এইভাবে : 'এ ছিল এমন এক সময় যা সমগ্র মানবজাতির নৈতিক-আত্মিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংস্পর্শহীন—যে আদিম যুগে মানুষ ছিল গুহানিবাসী তখনও বোধহয় এর চাইতে খারাপ অবস্থা ছিল না।' (পৃ ১০৩৮)। অর্থাৎ সেই অন্ধকার সময়ের কথা—যেখানে আপনি লিখছেন 'সরকারের আতঙ্কে যেখানে সমগ্র মানবসমাজ রক্তশূন্য' (পৃ ১০৩৭)। সত্যি কি তাই? আমাদের কি মানবজাতির বিবর্তনের ইতিহাস তথা সোভিয়েতের বিস্ময়কর অগ্রগতির ইতিহাস নতুনভাবে পড়তে হবে ? এবার সাম্প্রতিক সময়ের কিছু অন্য তথ্য তুলে ধরছি আপনার ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য।

(১) Mr. Vadim Bakatin, Interior Minister told 'Tass' serious crimes had been risen sharply in the past five years". And 3,000 criminal groups had been exposed in recent years including 20,000 so-called bosses of the criminal as well as 500 dangerous recidivists.'

অধ্যাপক রায়, আপনাকে 'past five years' শব্দগুলি একটু গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করতে বলছি।

(২) 'খ্রীষ্টধর্ম' আগমনের এক হাজার বৎসর পূর্তি উৎসবে' যোগদান করে জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসী লিখছেন, 'আমি ওখানে যাবার আগেই উৎসব শুরু হয়ে গেছে। উৎসব মানেই নাচগান, খানাপিনা, এলাহি কাণ্ড। মত্ততাও বলা চলে। হবে না! এতদিন কোনো ধর্মোৎসব ছিল না, কিন্তু এখন তুলে নেওয়া হয়েছে সমস্ত বাধা-নিষেধ।' এখানে 'মত্ততাও বলা চলে' শব্দ তিনটির উপর গুরুত্ব দিতে আপনাকে অনুরোধ করছি।

(৩) ৭ মে ১৯৮৯ সোভিয়েত টেলিভিশনে আচার্য রজনীশের সম্পর্কে এবং তাঁর আশ্রমের কর্মকাণ্ড নিয়ে একটি অনুষ্ঠান দেখানো হয়। যে দলটি ওই আশ্রমের ছবি তোলেন, তাঁদের মতে 'রজনীশের আশ্রম মোটেই যথেচ্ছ যৌনাচারের আখড়া নয়।'

(৪) সোভিয়েত নরনারীর, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের বিদেশী ভোগ্যপণ্যের জন্য উচ্ছ্বাস আর প্রকাশ্য লোলুপতা। তাদের উৎকট অর্থলোভ, বিশেষ করে 'ডলারের' নামোল্লিখিত প্রলোভন।

(৬) কিয়েভের রাস্তায় রাশিয়ানদের উন্মুক্ত উদ্দাম নৃত্য। বা রাশিয়ায় সুন্দরী ললনাদের প্রথম 'বিউটি কনটেস্ট'।

(৬) 'সোসালিস্ট রিপাব্লিক' পত্রিকার পরিসংখ্যান অনুসারে, সোভিয়েতে নথিভুক্ত মাদকাসক্তের সংখ্যা ১৪ লক্ষ। কিন্তু সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানীদের মতেই, তার সংখ্যা কম করে ১০-১২ গুণ বেশি। এর থেকেও বড়ো সমস্যা হল—স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মাদকাসক্তির প্রবণতা বেড়ে যাওয়া। এ সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে।

আর উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির মানবতা, উচ্চ আদর্শ আর যে শ্রী আছে, নিশ্চয় ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে তা নেই। তাহলে উপরের উদাহরণগুলি সোভিয়েতের বর্তমান সংস্কৃতির কোন্ শ্রীকে প্রতিফলিত করবে ? অধ্যাপক রায়, একটু যদি ব্যাখ্যা করেন তাহলে আমাদের মতো সাধারণ পাঠকদের বুঝতে সুবিধে হয়।

উপসংহারের বদলে :

'সমাজতন্ত্রের সংকট নিরসনে' পেরেস্ত্রোইকা, গ্লাসনস্ত বা সেতুস্বরূপ খোজরাশচট-এর কল্যাণধারায় 'ব্যক্তিগত স্বার্থের সংমিশ্রণে' সোভিয়েতে 'সমাজবাদের পুনর্নবীকরণ'-এর নামে বর্তমান সোভিয়েত কর্ণধাররা আত্মছলনা বা মানব-সমাজকে প্রবঞ্চনা করছেন না তো ? না, এটা কোনো সিদ্ধান্ত নয়। আমার প্রশ্নমাত্র। পৃথিবীর সব দেশের বর্তমান সমস্যা এত জটিল আর কঠিন যে, বিপুল পরিশ্রম আর সচেতন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ করতে হবে সব ঘটনার। তবু ভুল ঘটতে পারে। তবে কারো কাছে কোনো ঘটনার ইতিবাচক দিকটা প্রধান হয়ে ওঠে, আবার কারো কাছে নেতিবাচক দিক। যেমন আপনার প্রবন্ধে বর্তমান সোভিয়েতের ইতিবাচক দিকটাই যে শুধু প্রধান হয়ে উঠেছে তাই নয়, এর কোনো নেতিবাচক দিক আপনার কাছে ধরা পড়ে নি। ঐতিহাসিকদের অন্তত মনে রাখা উচিত, নেতিবাচক সমালোচনা অনেক সময়েই ইতিবাচক হয়ে দাঁড়ায়। কথাটা আমার নয় কথাটা "অ্যানটি ডুরিঙ"-এর গোড়ার কথা। এঙ্গেলস লিখেছেন, 'ফলে আমার নেতিবাচক সমালোচনা হয়ে দাঁড়ায় ইতিবাচক, যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ও কমিউনিস্ট বিশ্বদর্শনের জন্য মার্কস ও আমি লড়ে এসেছি।'

তাই, কোনো দেশের, বিশেষ করে আজকের সোভিয়েতের জটিল সমস্যা অনুধাবন করা কি এতই সহজ ? আমাদের মনে রাখতে হবে, 'সমাজবাদের পুনর্নবীকরণের' জন্য আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য খর্ব করার উদ্যোগ কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে আসতে পারে। তার জন্য গত ৭০ বছরের বহু দুনিয়াকাঁপানো সদর্থক ঘটনার অবমূল্যায়নের প্রয়োজন কোথায় ? পশ্চিমী দুনিয়ার সাথে গোরবাচেভের 'shared concern', পশ্চিমী ঢঙে সমালোচনা, নির্বাচন কি লেনিনবাদকে ফিরিয়ে আনবে ? না, এসব লেনিনের গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রিকতা নীতির বিকল্প ?

পরিশেষে একটি বিনীত নিবেদন : আপনি ঐতিহাসিক। আপনি ইতিহাস নিয়ে চর্চাও করেন। আপনার আরব্ধ ঐতিহাসিক জ্ঞানকে জিজ্ঞাসায় অনুসন্ধিৎসায় প্রসারিত করে ইতি আর নেতির দ্বন্দ্বমূলক বিশ্লেষণে নতুন কিছু জিজ্ঞাসা অন্তত উঠে আসুক না। আপনার অন্য কোনো দায়বদ্ধতা তো নেই। পৃথিবী জুড়ে ভাটির টানে একরকম জোয়ারের গান আপনি নাইবা গাইলেন।

কমলেন্দু ধর

সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা